প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের রূপরেখা

মনোরঞ্জন বর্মণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের রূপরেখা

COMPLIMENTARY

ডঃ মনোরঞ্জন বর্মণ, এম. এস্.-সি., পি.-এইচ. ডি.
অধ্যক্ষ, প্রভাতকুমার কলেজ, কণ্টাই এবং লেডি কিন্
কলেজের (শিলং) প্রাণিবিদ্যা বিভাগের
প্রাক্তন প্রধান।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

297

বিষয় সূচী

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় 1—7

শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব ও ভূমিকা 1

দ্বিতীয় অধ্যায় 8—36

শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাস ও মতবাদ 8, স্থানীয় প্রাণিকূলের পরিচয়ের যুগ 8, লিনিয়াস ও সমকালীনদের যুগ 9, প্রয়োগসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির যুগ 10, ডারুইন ও জাতিজনি চিন্তাধারার যুগ 13, প্রাণিপ্রজন ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস প্রণালী 15, আধুনিক ধারা 16, নির্যাসবাদ 20, নামিকবাদ বা ব্যক্তিসত্ত্বাবাদ 22, প্রয়োগবাদ 24, জাতিজনি শাখাবিস্তারবাদ 24, অভিব্যক্তিবাদী শ্রেণীবিন্যাস 30, শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজানি 31, শ্রেণীবিভাগের প্রকার 32।

তৃতীয় অধ্যায় 37—48

শ্রেণীবিন্যাসের আরোহী-অবরোহী ধাপ 37, লিনিয়াস প্রবর্তিত আরোহী-অবরোহী ধাপ ও পরবর্তী সংযোজন 37, শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিকা 40, গণ—গণভুক্তির তাৎপর্য—বর্গ, শ্রেণী ও পর্ব 45।

চতুর্থ অধ্যায় 49—56

ট্যাক্সন বা শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠী নিরূপণের সিদ্ধান্ত 49, আকারগত চরিত্র ভিত্তিক 49, জিনগত অনুক্রম ভিত্তিক 50, বহুচারিত্রিক ট্যাক্সা নিরূপণ 51, সাদৃশ্যের পরিমাণগত মূল্যায়ন 54, সাদৃশ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত 55।

পঞ্চম অধ্যায় 57—75

প্রজাতি সংক্রান্ত প্রত্যয়াবলী, বিবিধ প্রজাতি ও প্রাণিপ্রজন 57, প্রকার বা জাতিভিত্তিক প্রজাতি

PRANEE SRENEEBINYAS BIJNANER RUPREKHA
By Dr. Monoranjan Burman

প্রকাশকাল :
অক্টোবর, ১৯৮৮

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যান্সন্, নবম তল
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : সতের টাকা

Published by Sri Sibnath Chattopadhyay Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পঠন পাঠন ও আলোচনা বহুলভাবে প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য ও সহায়ক পুঁথিপত্রের অভাব অনুভূত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় সমান্য কিছু পুস্তিকা বা অনুচ্ছেদ এ বিষয়ে প্রকাশিত হলেও অভাব পূরণের প্রত্যাশা অনেকটাই অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। এই অসম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রাণিবিজ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখে এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছি। এই ধরনের বইয়ের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সীমিত হওয়া সত্বেও প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে উৎসাহী বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষাব্রতী ও গবেষণায় উৎসুকদের ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত পুঁথিপত্র ও অন্যান্য সংকলন পাঠ বা আলোচনার সুযোগ ঘটার আগেই বাংলা ভাষায় প্রারম্ভিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করার বিষয়টি মনে রাখা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনায় বেশ কিছুটা পরিভাষার অভাব জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু ইংরাজীতে গৃহীত বা প্রকাশিত শব্দ বা শব্দসমষ্টি এত বেশী পরিচিত এবং প্রচলিত যে বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় সেই শব্দ বা শব্দসমষ্টির রূপান্তর যেন ভাবাই যায় না! কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও ব্যাপ্তি মাতৃভাষায় যতটা সহজ অন্য কোন ভাষায় ততটা সম্ভব নয়। অনেকের মত আমারও বিশ্বাস, প্রচলন ও ব্যবহারের মধ্য দিয়েই পদ বা শব্দগুলো গ্রহণ-বর্জনের পথে সর্বগ্রাহ্য হয়ে উঠবে এবং পারিভাষিক শব্দগুলোও কিছুটা বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়েই ক্রমে সঠিক স্থান ও মান লাভ করবে।

অনেকের ধারণা প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে তত্ব আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। শ্রেণীবিভাগ যথাযথভাবে হওয়াই যথেষ্ট। এ ধারণা মেনে নেওয়া খুব সহজ নয় কারণ, শ্রেণীবিভাগ যতই উন্নত মানের বা যথাযথ হোক শ্রেণীবিভাগ তাতে একটি উন্নত কৃৎকৌশল বলে গণ্য হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের পদমর্যাদায় উন্নীত হবার দাবী রাখে না। বস্তুত প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস

পৃষ্ঠা

প্রত্যয় 58, নামিক বা নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয় 59, জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় 59, জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের ব্যবহারিক অসুবিধা 63, তথ্যের অপ্রতুলতা—এক-জনিক জনন—অভিব্যক্তির মধ্যবর্তীতা 63-64, বিবিধ প্রজাতি 64-68, প্রজাতি নিম্নতর পর্যায় 69, প্রজাতি ও প্রাণিপ্রজন—প্রজনের আকার—প্রজনের ধারাবাহিকতা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা—অন্তরিত প্রজনের মাধ্যমিক মিলনাঞ্চল 74-75।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক চরিত্র 76, চরিত্রের প্রকার—চারিত্রিক ভেদের গুণগত পরিমাণগত মূল্যায়ন—অভি-যোজনগত—বয়স নির্ভর—ঋতু নির্ভর—বাসস্থান নির্ভর—পোষক ও পরজীবিতা ভিত্তিক—প্রজন ঘনত্ব জনিত 77-87, বিনিশ্চয় গ্রিড 89, চারিত্রিক ভেদের রাশি-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 90। 76—98

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক সংগ্রহ ও সনাক্তকরণ 99, সংগ্রহের ক্ষেত্র—সংগ্রহের বিবিধ ধরন—সংগ্রহ বিষয়ক তথ্য—সংগ্রহ সংরক্ষণ 100-107, আদানপ্রদানের পদ্ধতি 120, সনাক্তকরণ 121। 99—132

অষ্টম অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক প্রকাশন—প্রধান প্রধান প্রকাশন প্রকাশনের প্রকারভেদ 133-140। 133—140

নবম অধ্যায়

প্রাণী নামকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী 141, প্রাণী নামকরণ সংহিতার আবির্ভাব—উপস্থাপনা—প্রধান-প্রধান নিয়মাবলী—কিছু কিছু নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা 141—185

গ্রন্থপঞ্জী 186।

প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস

বিজ্ঞানের রূপরেখা

বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই একটি বিজ্ঞান এবং এরও দুটি দিক দেখা যায়—একটি অবেক্ষণ ভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি এবং অপরটি অবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিক দিক।

বিগত শতাধিক বছরের প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির বিবর্তন ও নবজাগরণ বিশেষ উৎসাহজনক। আদিম অধিবাসীদের কাল থেকে লিনিয়াসের যুগ পেরিয়ে প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে পৌছানোর ধারা নিঃসন্দেহে অনুধাবনযোগ্য। সেই সঙ্গে জীববিজ্ঞানে শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির বহুধা প্রসারিত প্রভাবও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবের বিবর্তনবাদ, তুলনামূলক শারীরবৃত্ত, জীবপ্রজন বিজ্ঞান, বংশধারা বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখায় শ্রেণীবিন্যাসের ভূমিকা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক প্রাণিবিজ্ঞানের যে কোন শাখায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের অবদানও অনস্বীকার্য।

জীবজগতের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য মানুষকে সম্মোহিত করেছে ও আকর্ষণ করেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। ইতিমধ্যেই এগার লক্ষেরও বেশী প্রাণী প্রজাতি এবং পাঁচ লক্ষের মত উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে অনাবিষ্কৃত জীব প্রজাতির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটির মধ্যে যে কোন সংখ্যায় দাঁড়াতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে লিঙ্গ, বয়স, ঋতু প্রভৃতি জনিত প্রকারভেদ। বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় এবং মানুষের সহজাত অনুসন্ধিৎসার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এসব প্রচেষ্টার ক্রমোন্নতির ফলে ক্রমাগত সুসংহত ও বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে এবং জীবজগৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।

এই গ্রন্থে শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক ইতিহাস ও মতবাদ, সংগ্রহ ও সনাক্তকরণের পদ্ধতি, শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র, প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত প্রকাশন, নামকরণের প্রধান প্রধান নিয়মাবলী ইত্যাদি দিকের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিভাষার অভাবজনিত সাধারণ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনমত কিছু কিছু অর্থবহ নতুন পারিভাষিক শব্দ ইংরাজী শব্দের উল্লেখ সহ ব্যবহার করা হয়েছে। সারণী ও চিত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজীর ব্যবহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এ ধরনের পুস্তক প্রণয়নে অসংখ্য লেখক ও গবেষকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা

অবধারিত। Mayr, Simpson, Crowson. Cain ও V.C. Kapoor-এর নাম উল্লিখিত হলেও অনুল্লিখিত আরও অনেকের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকৃত রইল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিকের প্রতি। ভারতীয় প্রাণিসংরক্ষণ পর্ষদের (Z.S.I.) বিজ্ঞানী ডঃ আশিস ঘোষ ও শ্যামরূপ বিশ্বাস আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। শ্রীরামপুর কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান শৈলেশ গুহ, শ্রীঅরুণাভ দত্ত, পুষ্পিতা সরকার ও শ্রীমতী বেলা বর্মণ যেভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ না জানালে কৃতঘ্নতা হবে।

মনোরঞ্জন বর্মণ

প্রথম অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব ও ভূমিকা

কালের প্রবাহে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় জীবজগতের বৈচিত্র্যের অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার পরিধি এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। বিস্ময়কর এই জাগতিক বৈচিত্র্যের রূপরেখা পরিস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই এবং জীব ও জড় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ করে তাদের 'প্রকৃত প্রকৃতি' (True nature) জানবারও চেষ্টা হয়েছে। পূর্বে শ্রেণীবিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সনাক্তকরণের নির্দেশিকা (Identification key) জানা। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসই তৎকালীন ব্যবহারিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য মেটাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু 1858 খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ডারউইনের......"প্রজাতির উদ্ভব" ("Origin of species through natural selection") প্রকাশিত হবার পরে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য ও পরিধির আমূল পরিবর্তন ঘটে। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা জীবের কেবলমাত্র সনাক্তকরণের নির্দেশিকা জেনে আর খুশী থাকতে পারলেন না, জীবজগতের বৈচিত্র্যকে বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে লাগলেন এবং এক গুচ্ছ প্রাণী অথবা উদ্ভিদকে দেখা হতে লাগল সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধর হিসেবে। ফলে খুঁজে দেখা সুরু হল অভিব্যক্তি জনিত বিভেদের কারণগুলো এবং আবশ্যিকভাবেই জীবদের প্রাকৃতিক পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল। ক্রমে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটল এবং শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে জীববিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখার তথ্য ও জ্ঞানের ব্যবহার হতে লাগল। ফলশ্রুতি হিসেবে শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানীর জগৎ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী প্রসারিত হল।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান (Taxonomy) ও শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (Systematics) নাম দুটি অনেক সময় প্রায় সমার্থ-শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরা অনেকটা কাছাকাছির হলেও কিন্তু এক নয়। আলোচনায় পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান (Taxonomy, GK. Taxis-arrangement,

nomos = Law) : 'ট্যাক্সোনমি' শব্দটি Candolle (1813) উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের মতবাদ হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। Simpson (1961) শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানকে শ্রেণীবিভাগের বুনিয়াদ, নিয়ম ও পদ্ধতির তাত্ত্বিক আলোচনা বলেছেন। (Taxonomy is the theoretical study of classification including its basis, principles and rules)।

Candolle-এর বক্তব্যের খুব বেশী পরিবর্তন না করেই বর্তমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেও Mayr (1969)-এর মত অনুসারে সহজভাবে বলা যায়, শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান হচ্ছে জীব শ্রেণীবিন্যাসের মতবাদ ও চর্চা। (Taxonomy is the theory and practice of classification)।

শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (Systematics ; GK. Systema) : প্রথম-দিকের প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বিশেষত Linnaeus (1735) 'সিস্টেমেটিকস্' শব্দটি শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি অর্থে ব্যবহার করেন। Simpson (1961) অনুসৃত আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে 'সিস্টেমেটিকস্' বা শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিকে বলা যায় জীবজগতের প্রকারভেদ, বৈচিত্র্য ও সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা। আরও সহজ করে বলা যায় জীব বৈচিত্র্য বিজ্ঞান। (Systematics is the scientific study of the kinds and diversity of organisms of any and all relationships among them) অথবা (Science of diversity of organisms)। সম্পর্ক বা আত্মীয়তা শব্দটি শুধুমাত্র জাতিজনি অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে যে কোন জৈবিক সম্পর্ককেই বোঝায়। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান ও শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি এই শব্দ-সমষ্টি দুটির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় একই ভাবে ও অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান ও শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য ও অবস্থান পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ্য।

প্রাণী শ্রেণীবিভাগকে (Zoological classification) বলা যায় প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের ফসল। প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বস্তুতঃ প্রাণীদের সম্পর্ক অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলভুক্ত করা বোঝায়। এই অর্থে শ্রেণীবিভাগকে অনেক সময় বিটা ট্যাক্সোনমি (β. Taxonomy) বলা হয়। শ্রেণীবিভাগকে আবার শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বা সিস্টেমেটিক্সের একটি প্রক্রিয়াও বলা হয়। Simpson-এর ভাষায় প্রাণী শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে

প্রাণীদের আত্মীয়তা অর্থাৎ ধারাবাহিকতা, মিল অথবা উভয়ের ভিত্তিতে দল বা প্রস্তে বিন্যস্ত করা। (Zoological classification is the ordering of animals into groups or set on the basis of their relationships, that is of association by contiguty, similarity or both)। শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি এই শব্দ-সমষ্টি দুটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাদের সমার্থ-শব্দ হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির প্রধান বিচার্য বিষয় জীবজগতের বৈচিত্র্য হলেও এর অসামান্যতা জীববিজ্ঞানের যে কোন শাখার তুলনায় সহজেই অনুমেয়। কারণ আধুনিক কোষ বিজ্ঞানী বা অণুজীববিজ্ঞানী (Molecular biologist) অথবা অন্য কোন শাখার বিশেষজ্ঞ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জীব গঠনের ক্ষুদ্রতম অণু বা একক নিরূপণে ব্যাপৃত থাকেন। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানকে এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করে ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করেন। শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিই প্রজাতি কুলের সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে সক্ষম। কোন জীব-গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য কোন জীবগোষ্ঠীর পার্থক্য অর্থাৎ সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরত্ব কতটা এবং সেই সঙ্গে জীবের বসতি, পরিবেশ ও আচরণ অর্থাৎ জীব-জগতের বৈচিত্র্যের সার্বিক মূল্যায়নই শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির বিষয়বস্তু।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত ট্যাক্সন (=Taxon) বা শ্রেণী-বিন্যাস গোষ্ঠী শব্দটির উল্লেখ এখানে প্রসঙ্গিক।

ট্যাক্সন (=Taxon, বহুবচনে—Taxa)ঃ ট্যাক্সন বা শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠী হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের বাস্তব উপাদান এবং সুনির্দিষ্ট স্তর। মশা, মাছি, পোকা, পাখি ইত্যাদি শব্দগুলি বিভিন্ন বাস্তব প্রাণি-উপাদান ও প্রাণিদলকে বোঝায়। কোন প্রাণিদল শ্রেণীবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট স্তর বা পর্যায় হিসেবে গণ্য হলে ঐ দলকে ট্যাক্সন (=Taxon) বা শ্রেণী-বিন্যাস গোষ্ঠী বলা যায়। Simpson (1961)-এর ভাষায় ট্যাক্সন হচ্ছে একটি বাস্তব জীবদল, যাকে আরোহী-অবরোহী শ্রেণীবিন্যাসের যে কোন একটি স্তরের একটি স্বীকৃত একক হিসেবে গণ্য করা যায়।

ট্যাক্সন বা শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠী যেহেতু বাস্তব প্রাণি-উপাদানকেই বোঝায় সেই কারণে প্রজাতি, গণ ইত্যাদি নামগুলি কিন্তু ট্যাক্সা নয়, যদিও প্রজাতি বা গণ অন্তর্ভুক্ত প্রাণি-উপাদানগুলি যেমন কুনো ব্যাঙ (Bufo)

একটি ট্যাক্সন বা শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠী। ট্যাক্সন বা শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠীকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের একটি স্বীকৃত দল হওয়া প্রয়োজন, যে দল ভৌগোলিক, অভিযোজনগত বা অন্য দিক থেকে একটি স্বীকৃত স্তর বা বিভাগ।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও ভূমিকা ঃ আগের মতই ইদানীং কালেও কারো কারো মনে প্রশ্ন জেগেছে যে জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আধুনিক উন্নত মানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান কি অবান্তর হয়ে পড়েনি? অথবা অভিব্যক্তি ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রচেষ্টা কি নিরর্থক নয়? কিংবা বর্তমান জ্ঞান ও তথ্যের পক্ষে দ্বিপদ নামকরণ সহায়ক কি না?

এ ধরনের প্রশ্নের সঠিক মোকাবিলার মধ্যেই শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও ভূমিকা এসে পড়ে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় এতটুকুও কমেনি। কারণ, জীবের সাধারণ ধর্ম বা গঠন কিংবা তার গঠনের একক জানা যেমন প্রয়োজন ঠিক একইভাবে প্রয়োজন জীবজগতের বৈচিত্র্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক জানা। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা এই কাজই করে থাকেন। সংক্ষিপ্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর ভূমিকা নিম্নরূপ—

1. এই পৃথিবীর জীবজগতের বৈচিত্র্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিস্ফুট করা।
2. জীবের জাতিজনি (Phylogeny) সম্পর্কে ধারণা পাবার মতো প্রয়োজনীয় তথ্যের সরবরাহ করা।
3. অভিব্যক্তি সম্পর্কিত অনেক ঘটনা ও তথ্যের উন্মোচন করে অন্যান্য শাখার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করা।
4. জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় প্রয়োজনীয় তথ্যের সরবরাহ করা, বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জীবদের সম্পর্কে তথ্য যোগান।
5. সুবিন্যস্ত ও পারস্পরিক সম্পর্ক ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ পরিবেশ বিজ্ঞান, বংশধারা ও অন্যান্য শাখায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান দেয় এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে।

কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞানীর ধারণা শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর কাজ কেবল-মাত্র প্রাণীদের সনাক্তকরণ, সনাক্তকরণের দ্বিশাখা কুঞ্জি বা নির্দেশিকা

(Dichotomous key) প্রস্তুত করা, নতুন প্রজাতির বিবরণ দেওয়া, সঠিক নামকরণ করা এবং সংগ্রহকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা। বাস্তবে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর কাজের পরিধি এসবের সীমা ছাড়িয়ে আরও পরিব্যাপ্ত। সামগ্রিকভাবে শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি জীবের তুলনামূলক আলোচনা, বিস্তারণের সম্পর্ক ও গুরুত্বের ব্যাখ্যা, অভিব্যক্তির মূল্যায়ন, প্রাণীর অর্থনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি করে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নির্যাস।

আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী সংগ্রহশালার সংগ্রহের রক্ষক ও বিভাজক হয়েই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাকে জানতে হচ্ছে প্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, বংশধারা, জৈব রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি। শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানীকে প্রথমেই জানতে হয় প্রাণীর স্থায়ী ভেদাভেদ, যেমন লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক ইত্যাদি জনিত ব্যবধান বা সমাকৃতি প্রজাতি (Sibling Species) কিনা ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ রূপগোষ্ঠী (=Phenon) শ্রেণীবিন্যাসের গ্রাহ্য কোন্ এককভুক্ত তা নিরূপণ করা। এরই সঙ্গে প্রজাতি পরিচিতি সুনির্দিষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ দ্বিপদ নামকরণ করতে হয়।

প্রজাতি নিরূপণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন রকমের অস্পষ্টতা দেখা দেয়। কোথাও কোথাও দেখা যাবে একই প্রজাতির বয়স, লিঙ্গ বা অন্য কোন পার্থক্যযুক্ত দলকে ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত করা হয়েছে। আবার কখন কখন তথ্যের অভাবে একই প্রাণিগোষ্ঠীকে বিভিন্ন নামে নতুন প্রজাতি হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। ফলে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে পুঞ্জীভূত হয়েছে প্রতিনামিতা (Synonymy)। প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর প্রাথমিক কাজ সময় ও স্থানের পরিধির নিরিখে প্রাণিজগতের বৈচিত্র্যকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে অজানা বিভিন্ন রকমের প্রাণীদের বিবরণ দেওয়া ও প্রজাতি নিরূপণ করা অর্থাৎ অজ্ঞাত অপরিচিত প্রাণীদের পরিচিতির সারিতে আনা। ফলশ্রুতিতে বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংবাদ ও সংগ্রহের আয়তন বিস্তৃত করা। 1758 খ্রীষ্টাব্দে লিনিয়াস 4,162টি প্রাণিপ্রজাতি নথিভুক্ত করেন। 1898 খ্রীষ্টাব্দে Mobius 4,15,600টি প্রাণিপ্রজাতির তালিকা প্রণয়ন করেন। ক্রমাগত এই প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমান সময়ে আমাদের পরিচিত প্রাণি-প্রজাতির সংখ্যা এগার লক্ষেরও অনেক উপরে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্গে

এ কথাও স্মরণীয় যে আমাদের জানার তুলনায় অজানা প্রাণিপ্রজাতির সংখ্যা সম্ভবত অনেক বেশী, যারা অপেক্ষা করে আছে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী-দের সুদক্ষ পর্যবেক্ষণের। খুব সংযতভাবে হিসেব করেও অনুমান করা হচ্ছে যে জীবিত প্রাণিপ্রজাতিদের পুরোপুরিভাবে জানা হয়ে গেলে তা' 50 লক্ষ থেকে এক কোটির মধ্যে যে কোন সংখ্যায় দাঁড়াতে পারে। আরও উল্লেখ্য, যেসব প্রাণী বর্তমানে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, অথচ অনেকেই রেখে গেছে জীবাশ্ম, তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের পরিচিতির পরিধি খুবই নগণ্য। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে প্রতি 5000 জীবাশ্ম প্রজাতির মাত্র একটিই আমাদের পরিচিতির সীমায় এসেছে।

সত্তরের দশকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রধান প্রধান প্রাণিগোষ্ঠীর মোট প্রজাতি সংখ্যা 11,23,000-এর বেশী। এই সংখ্যার মধ্যে আদ্যপ্রাণী (Protozoa) পর্বে রয়েছে :0,000-এর মত প্রজাতি, ছিদ্রাল প্রাণী (Porifera) পর্বে রয়েছে প্রায় 5,000 প্রজাতি, একনালী দেহী (Coelenterata) পর্বে টেনোফোরার (Ctenophora) 80টি বাদে 9,000 প্রজাতি, ফিতে কৃমি (Platyhelminthes) পর্বে 12,700, গোল কৃমি (Nemathelminthes) পর্বে 12,500 প্রজাতি, অঙ্গুরীমাল (Annelida) পর্বে 8,700টি প্রজাতি, সন্ধিপদ (Arthropoda) পর্বে 9,00,000 প্রজাতি যার প্রায় 8 লক্ষ প্রজাতিই পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত। কম্বোজ (Mollusca) পর্বে 1,15,000টি প্রজাতি এবং কণ্টকত্বক (Echinodermata) পর্বে রয়েছে 6,000টি প্রজাতি। অন্যদিকে কর্ডাটা পর্বের 54,000-এর অধিক সংখ্যক প্রজাতি। এদের মধ্যে স্তন্যপায়ী (Mammalia) শ্রেণীভুক্ত প্রজাতির সংখ্যা মাত্র 3,700, পক্ষী (Aves) শ্রেণীভুক্ত 8,600টি প্রজাতি, সরীসৃপ (Reptilia) শ্রেণীতে 6,300 প্রজাতি, উভচর (Amphibia) শ্রেণীতে রয়েছে 2,500টির মত প্রজাতি, অস্থিযুক্ত মাছ (Osteichthyes) শ্রেণীতে 20,000-এর মত প্রজাতি ও তরুণাস্থি যুক্ত মাছ (Chondrichthyes) শ্রেণীতে 550টির অধিক প্রজাতি। এছাড়াও রয়েছে প্রোটোকর্ডেট ও চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডীরা। একটি লক্ষণীয় বিষয় হল প্রাণিপ্রজাতিদের মধ্যে সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য। একথাও উল্লেখ্য যে জীবিত সকল প্রাণিগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের ধারণা সমান নয়। প্রাণীর আকার, স্বভাব, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের নিরিখেই প্রাণিগোষ্ঠী

সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ ও জ্ঞান বা পরিচিতির মাত্রা নিরূপিত হয়ে থাকে। পক্ষী এবং সন্ধিপদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বা পরিচিতির পার্থক্যের মাত্রা যে অনেক বেশী একথা সবারই জানা। আবার কোন কোন অঞ্চলের প্রাণিপ্রজন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অন্য অনেক অঞ্চলের প্রাণিপ্রজনের তুলনায় অনেক পৃথক। ইংলণ্ডের কোন অঞ্চলের এবং ভারতীয় বেশ কিছু প্রাণিপ্রজন সম্পর্কিত জ্ঞানই একথা সুস্পষ্ট করে।

আবার দেখা যায় যে সকল অঞ্চল বা গোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের পরিচিতি যথেষ্ট ছিল বলে মনে করা হত নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণ আবিষ্কারের ফলে সেই সব অঞ্চল বা গোষ্ঠীতে নতুন প্রাণিদলের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এইসঙ্গে একথাও উল্লেখ্য, বেশ কিছু প্রজাতি হয়ত জীবাশ্ম রেখে বা না রেখে অপরিচিতভাবেই পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। আবার নতুন প্রজাতির আবির্ভাবের সম্ভবনাও বাতিল করা যায় না। এ সব দিকের বিচারে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর প্রয়োজন থাকবে বলে মনে করা হয়।

শ্রেণীবিন্যাসের কাজ প্রধানত তিনটি পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের শ্রেণী-বিন্যাসে (Alpha taxonomy) নতুন প্রজাতির বিবরণ দেওয়া হয় এবং প্রজাতিটিকে শ্রেণীবিভাগের যথাস্থানে স্থাপন করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেণীবিন্যাসে (Beta taxonomy) প্রজাতি এবং উচ্চতর স্তরের সম্পর্ক নিরূপণের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের শ্রেণীবিন্যাসে (Gamma taxonomy) প্রধানত গুরুত্ব পায় কোন প্রজাতির ভৌগোলিক ব্যাপ্তি থেকে অভিব্যক্তির সম্পর্ক অর্থাৎ প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত প্রাণিদলের ভেদের কার্যকারণ থেকে শুরু করে ব্যাপ্তি ও অভিব্যক্তির বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা। তবে এই পর্যায় তিনটি একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয় বরং একটি অপরটিকে অধিক্রমণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাস ও মতবাদ

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের একটি দীর্ঘ ইতিবৃত্ত আছে। আমাদের এই গ্রহে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেই মনুষ্যেতর প্রাণীরা 'খাদ্য' 'অখাদ্য' 'শত্রু' 'মিত্র' ইত্যাদি ধরনের বিভাগ নিশ্চিত করত। আমাদের আলোচ্য বিষয় মনুষ্য সমাজের ইতিহাসে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান কোন্ কোন্ পথ পরিক্রমা করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এখন অবধি পাওয়া তথ্য ও জ্ঞানের নিরিখে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের ইতিহাসকে সাধারণত ছ'টি পর্যায় বা যুগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে Simpson (1959, '61), Cain (1958f), Hopwood (1950) প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই ইতিহাস আজও অসম্পূর্ণ এবং যতদিন না শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত দার্শনিক মতবাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি হচ্ছে ততদিন সম্ভবত সম্পূর্ণ ইতিহাস আশা করাও অবাস্তব।

1. স্থানীয় প্রাণিকূলের পরিচয়ের যুগ (Study of local fauna) ঃ

প্রাক্ সভ্যতা যুগের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক সময় প্রকৃষ্ট মানের প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ন্যায় তাদের চারপাশের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের গুণাগুণের উল্লেখ এবং নামকরণ করেছেন। কোন কোন উপজাতির মধ্যে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি প্রচলনের নজীরও পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে Hipocrates (460-377 B.C.) সহ কয়েকজন গ্রীক পণ্ডিত বেশ কিছু প্রাণীর নামকরণ ও সনাক্তকরণ করেন। কিন্তু এই সময়ে সনাক্তকরণ ও নামকরণ করা হলেও প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরই অব্যবহিত পরে জীব শ্রেণী-বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা Aristotle (384-322 B.C.) প্রাণীদের উন্নত মানের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা নেন। তিনি সামুদ্রিক জীবদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, প্রাণীদের সনাক্তকরণ করেন, গঠন ও আকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেন এমনকি ভ্রূণ বিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা এবং স্বভাব তথা

আচরণের দিকেও নজর দেন। Aristotle-এর মতে প্রাণীদের আচরণ, জীবনযাত্রা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তাঁর নির্ধারিত পক্ষী, পতঙ্গ, তিমি ইত্যাদি প্রাণিগোষ্ঠী এবং Coleoptera, Diptera প্রভৃতি নাম আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তিনি চরিত্রভিত্তিক বেশ কিছু শ্রেণী, গোত্র, গণ ইত্যাদি স্থাপন করেন এবং বেশ কিছু নিম্নতর স্তরের গোষ্ঠী নিরূপণ করেন, যেমন 'পালকযুক্ত'-'পালকহীন', 'রক্তযুক্ত'-'রক্তহীন', 'লোমশ'-'লোমহীন', 'দ্বিপদ'-'চতুষ্পদ' ইত্যাদি।

Aristotle-এর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল অসাধারণ এক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের। যদিও তিনি আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেণীবিভাগ উপহার দিয়ে যাননি তা সত্ত্বেও শ্রেণীবিন্যাসের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর অবদানই পরবর্তী বিজ্ঞানীদের শ্রেণীবিন্যাসের বুনিয়াদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। তিনিই সর্বপ্রথম ইঙ্গিত দেন যে প্রাণীরা উৎকর্ষের (Perfection) মাপকাঠির ক্রমানুসারে প্রকৃতিতে সাজান রয়েছে এবং একেই বলা হয়েছে প্রাকৃতিক মাপকাঠি (Scala naturae)। এরই ফলে প্রাণীদের উচ্চতর ও নিম্নতর স্তর হিসেবে সাজানোর প্রবণতা দেখা দেয়। এরিস্ট্টলীয় যুগের পরেই মানব সভ্যতার ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ। সেই অন্ধকার যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাখার ন্যায় প্রকৃতি বিজ্ঞানেরও অবিশ্বাস্য রকমের প্রসার ঘটে। বিভিন্ন দিকে অভিযান ও আবিষ্কারের ফলে পরিচিত বা সনাক্ত জীবের সংখ্যারও প্রভূত বৃদ্ধি ঘটে। Gesner (1551-58) ও Androvandi (1599) রচিত বিশ্বকোষে প্রাণীদের বিষয়ে এরিস্ট্টলীয় পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়। প্রাক্-লিনিয়াস যুগে John Ray (1627-1705)-ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যিনি একটি উন্নত মানের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিস্তারিত বর্ণনা না পাওয়া গেলেও বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যে প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসকগণের রচিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রাণিবিভাগের উল্লেখ থেকেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

2. **লিনিয়াস ও সমকালীনদের যুগ** (Linnaeus and his contemporaries) :

এই যুগের প্রধান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী লিনিয়াসের (1707-1778) প্রভাব শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে অপরিসীম। তবে এ যুগও পুরোপুরিভাবে

এরিস্‌টটলের প্রভাবমুক্ত নয়। প্রথম দিকে শ্রেণীবিভাগ ছিল প্রধানত জীবের সনাক্তকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে সনাক্তকরণের দ্বিশাখা নির্দেশিকা (Dichotomous Key) ব্যবহারে, যেখানে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়েছে সনাক্তকরণের উপাদান হিসাবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগে অভিযোজিত চরিত্রকেও ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে কিছু কিছু অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র গোষ্ঠীর। এই পদ্ধতির বিন্যাস কাঠামো বা বিভাজন পরিকল্পনাকে বলা হয়ে থাকে **কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ** (Artificial classification)।

প্রথম যুগে প্রাণীদের প্রধানত সনাক্তকরণই হয়েছে, শ্রেণীবিভাগের যতটুকু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সেটুকু কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের পর্যায়েরই। দ্বিতীয় অর্থাৎ লিনিয়াসীয় যুগের প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই যুগের পরের দিকে আবার প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত হতে দেখা যায়। সে দিক থেকে এ যুগকে কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগের সংমিশ্রণের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত। এ যুগের প্রথম দিকে উদ্ভিদকে ছত্রাক, ফার্ন, ঘাস, গুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি ভাগে বিভাজিত করা হয়েছে। এই বিভাজনের মধ্যে একই সঙ্গে পাওয়া যায় কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক বিভাগ। ছত্রাক, ফার্ন, পতঙ্গ বা মেরুদণ্ডী একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিভাগ পর্যায়ের, অন্যদিকে ঘাস, গুল্ম অথবা কীট (Vermis) প্রভৃতি কৃত্রিম পর্যায়ভুক্ত। পরবর্তী শব্দগুলো জীববিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিভাগ বোঝায় না।

3. **প্রয়োগসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির যুগ** (Emperical Approach) ঃ

এ যুগকে লিনিয়াস ও ডারউইনের মধ্যবর্তী যুগ হিসেবে ধরা হয়। লিনিয়াসের 'সিষ্টেমা নেচুরীর' দশম সংস্করণের সময় থেকে ডারুইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of speceis through natural selection) প্রকাশিত হবার সময়ের মধ্যে ধীরে ও সূক্ষ্মভাবে মতাদর্শের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। অবরোহী যুক্তিবাদ (Deductive Logic) বা একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বা 'নির্যাস' চরিত্রভিত্তিক সনাক্তকরণ ও শ্রেণীবিভাগের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল অবেক্ষণ ভিত্তিক বা প্রয়োগ সিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি (Emperical approach)। অর্থাৎ এই সময়ের শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা পূর্বসিদ্ধ (Apriori) জ্ঞান বা

একান্ত (নির্যাস) চরিত্রকে ভিত্তি না করে সনাক্তকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণীর বাস্তব চরিত্রের অবেক্ষণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকেই বেশী ঝুঁকতে থাকেন। এরই ফলে দেখা গেল এরিস্‌টটলীয় মতাদর্শীরা যাকে প্রাকৃতিক শ্রেণী বলে ভাবতেন তা বাস্তবে কৃত্রিম শ্রেণী হিসেবে গণ্য হতে লাগল। এই যুগের উল্লেখ্য ব্যক্তিদের মধ্যে Lamark (1744-1829) শ্রেণীবিন্যাসে কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উল্লেখ করেছেন। Cuvier (1769-1832)-এর প্রভাবও এ যুগে লক্ষণীয়। তাঁর মতবাদ মূলত শারীরবৃত্তির গুণাগুণের ও পূর্বসিদ্ধ জ্ঞানের অর্থাৎ বাস্তব অবেক্ষণ ভিত্তিক বিন্যাস ও পূর্বসিদ্ধ জ্ঞানের এক অসাধারণ সংমিশ্রণ। ল্যামার্কের শ্রেণীবিভাগেও প্রাকৃতিক মাপকাঠি বা 'স্কেলা নেচুরীর' প্রভাব সুস্পষ্ট কিন্তু ক্যুভার প্রাণীদের মেরুদণ্ডী, কম্বোজ, সন্ধিপদ ও অরীয় প্রতিসমী (Radiates) এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করার ফলে 'প্রাকৃতিক মাপকাঠির' প্রায় নির্বাসন ঘটে এবং 'রক্তযুক্ত' 'রক্তশূন্য' ইত্যাদি অবাস্তব বিভাজন পরিত্যক্ত হতে থাকে।

এই যুগেই পৃথিবীর দূর দূরান্ত অঞ্চলের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ঘটে। আবিষ্কৃত হয় বহু অজানা জীব। এ যুগেই কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগের সংমিশ্রণের পর্যায় থেকে শ্রেণীবিন্যাসের ক্রমান্বয়ে উন্নতিবিধান ঘটতে থাকে। একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রভিত্তিক বিভাজনের পরিবর্তে একাধিক সাধারণ চরিত্রভিত্তিক বিভাজন বা প্রয়োগবাদ স্থান করে নিতে শুরু করে। এ যুগের জীববিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায়, বিশেষত লিনিয়াসের অবদানে, শ্রেণী বিভাজন একটি বিজ্ঞানের রূপ প্রাপ্ত হয়। প্রচলিত হয় জীববিন্যাস ও নামকরণে সুসংহত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ। লিনিয়াসের অসাধারণ অবদানের জন্য যথার্থই তাঁকে "শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের জনক" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁর প্রখ্যাত "সিষ্টেমা নেচুরী" (Systema naturae, 1758) শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ এবং অগ্রগতির সূচক ও পথপ্রদর্শক। লিনিয়াস এরিস্‌টটলের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না বরং শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে এরিস্‌টটলীয় যুক্তি ব্যবহার করতে পারায় গর্ববোধ করেছেন। তিনি তাঁর "সিষ্টেমা নেচুরী" গ্রন্থ প্রণয়নে এরিস্‌টটলীয় বা মধ্যযুগীয় দর্শন ও যুক্তি ব্যবহার করলেও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতাবলে চরিত্র বাছাই ও দ্বিপদ নামকরণের মাধ্যমে ব্যবহারিক দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণের যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ফলে পরবর্তী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী-

দের সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। লিনিয়াসের কিছু কিছু বিভাজন, সনাক্তকরণ বিশেষত নামকরণ আজও অপরিবর্তিতভাবে প্রচলিত আছে।

লিনিয়াসের যুগে এরিস্‌টটলীয় যুগের প্রভাব বিশেষত এরিস্‌টটলীয় যুক্তি প্রয়োগের প্রভাব থাকা সত্ত্বের 'নির্যাস' (Essence) চরিত্র বা একটিমাত্র চরিত্রভিত্তিক সনাক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক চারিত্রিক সাদৃশ্য ভিত্তিক বিভাজনের প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। অর্থাৎ লিনিয়াসের যুগেই প্রয়োগ-সিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হতে থাকে।

নতুন যোগাযোগের ফলে স্থানীয় বা অঞ্চলভিত্তিক জীব সংক্রান্ত গবেষণার পরিবর্তে গুরুত্ব পেতে থাকে গোত্র, বর্গ বা শ্রেণীভিত্তিক গবেষণা। এ যুগের গবেষণার ফলে পূর্ববর্তী কিছু কিছু প্রকৃতি বিজ্ঞানীর ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মতে জীবজগতের অসীম বৈচিত্র্য একটি প্রাকৃতিক বন্ধনে গ্রথিত রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর নিকটতম গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়ঃ করাত মাছ (Saw shark), হাতুড়ি মাছ (Hammer headed shark) ইত্যাদি নিয়ে কারচারিডি (Carchariidae) গোত্র গঠিত। আবার কারচারিডি ও স্কাইলিডি (Scyllidae) গোত্রগুলি নিয়ে গঠিত হয় স্কোয়ালয়ডিয়া (Squaloidia) অধিগোত্র। স্কোয়ালয়ডিয়া, স্কাইলইডিয়া (Scylloidea) এবং নটিডেনয়ডিয়া (Natidanoidea) অধিগোত্রগুলি নিয়ে গঠিত হয় উপবর্গ প্লুরোট্রিমাটা (Pleurotremata)। প্লুরোট্রিমাটা ও হাইপোট্রিমাটা (Hypotremata) উপবর্গ দুটি নিয়ে গড়ে উঠেছে ইউসিলাচি (Euselachi) বর্গ ইত্যাদি। এ যুগের শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা বিশেষত প্রয়োগসিদ্ধ বা অবেক্ষণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকরা প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসকে একটি উন্নত মানের 'প্রাকৃতিক পদ্ধতি' স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হন। যদিও প্রকৃতির এই সুবিন্যস্ততার ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেননি। এই সময়ের বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের শুধুমাত্র বিন্যস্তই করেননি, শ্রেণীবিন্যাসের কিছু কিছু পদ্ধতি ও মতবাদের প্রচলনও করেছেন। প্রাণীবিভাগের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্নতা বা ছেদ সম্পর্কেও তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন এবং প্রাণী শ্রেণীবিভাগের আরোহী-অবরোহী ধাপের যথার্থতা স্বীকার করেন। লিনিয়াস-উত্তর যুগের বিজ্ঞানীরা এরিস্‌টটলীয় চিন্তাধারার বিরোধী এবং অবেক্ষণ ভিত্তিক বা সার্বিক চারিত্রিক গুণাগুণ

ভিত্তিক. শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষপাতী হবার ফলে শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

4. ডারুইন ও জাতিজনি চিন্তাধারার যুগ (Darwin and phylogeny) ঃ

চার্লস ডারুইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of species through natural selection) প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা প্রধানত দুটি ধারায় বইছিল— একটি ধারার বক্তব্য ছিল জীবজগতে কোন প্রাকৃতিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই ; তা' মানুষের কল্পনা সৃষ্ট। অন্যটিতে বলা হয়েছে প্রকৃতিতে জীবজগতের সুবিন্যস্ত অস্তিত্ব সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা প্রসূত এবং প্রতিটি গোষ্ঠী এই পরিকল্পনার অংশমাত্র।

এই দুটি চিন্তাধারার কোনটিতেই প্রকৃতপক্ষে জীবজগতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম ধারাটি অবাস্তব এবং অন্যটি অবৈজ্ঞানিক। প্রথম দিকে ডারুইন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় এই জীবজগৎ কিছুটা এই ধারণায় প্রভাবিত থাকা সত্ত্বেও পাঁচ বছরের 'বিগ্‌ল' জাহাজের অভিযানের অভিজ্ঞতা প্রসূত 'প্রজাতির উদ্ভব' পুস্তকে নতুন চিন্তা ও তত্ত্বের সন্ধান দিলেন। এরই ফলে শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানে নতুন ব্যাখ্যার সন্ধান মিলল। এই নতুন ব্যাখ্যায় জীব-জগতের বৈচিত্র্যের কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য হল। সেই সঙ্গে এ তথ্যও বোঝা গেল যে পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষের আবির্ভাব এবং শাখা বিস্তারের সঙ্গে চলে অভিব্যক্তি। ক্রমাগত বংশধর আবির্ভাবে শাখাবিস্তারের কেন্দ্রা-পসারিতা অর্থাৎ ভেদ বা পরিব্যক্তি (Variation or mutation) ঘটেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে গোষ্ঠীর মধে গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী এবং স্পষ্ট হয়েছে এই গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী বিরতি বা বিচ্ছেদ।

শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত ডারুইনের কিছু কিছু সুস্পষ্ট বক্তব্যের ফলে তাঁর পূর্বসুরীদের বিশেষত লিনিয়াস, ক্যুভার প্রভৃতির বৃত্তিয় যুক্তির হাত থেকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের কিছুটা মুক্তি ঘটে। এই সঙ্গে সুস্পষ্ট হয় যে বংশ-ধরের আবির্ভাবের সঙ্গে চলে শাখাবিস্তার ও পরিব্যাপ্তি বা পরিব্যক্তি। ফলে আবির্ভাব ঘটে নতুন প্রজাতি ও উপপ্রজাতির, অর্থাৎ গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে ল্যামার্কের নাম স্মরণীয়। কারণ তিনিই

সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে বিবর্তনের মাধ্যমে। যদিও ল্যামার্কের সৃষ্ট শ্রেণীবিভাগ তাঁর পূর্ববর্তীদের জাতিজনি চিন্তাবিহীন শ্রেণীবিভাগ থেকে বিশেষ তফাৎ ছিল না।

ডারুইনের একটি মূল্যবান অবদান শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণীদের যথাযথ চরিত্র নিরূপণ পদ্ধতির প্রচলন। তিনি পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পূর্ব ধারণা প্রসূত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব নিরূপণের পরিবর্তে অবেক্ষণ ভিত্তিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের প্রচলন করেন। সেই সঙ্গে নিকটতম গোষ্ঠীর মধ্যে (এমনকি ভিন্ন পরিবেশে জীবন ধারণ করা সত্ত্বেও) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

অভিব্যক্তিবাদী ব্যাখ্যা ছাড়া জীবের শ্রেণীবিভাগ এবং জীব ও জড়ের মধ্যে পরিলক্ষিত পার্থক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে; জড়ের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে জীবের শ্রেণীবিভাগের যে তাৎপর্য তা লোপ পায়। তদবস্থায় প্রাণী শ্রেণী-বিন্যাস একটি কুৎকৌশলের পর্যায়ে থেকে যায়, বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ডারুইনের মতবাদে প্রয়োগবাদীরাও উৎসাহিত হলেন কারন বিবর্তনবাদী ভাবধারায় তাঁদের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী বিচ্ছেদ সম্পর্কে অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে নিকটতম গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য কিভাবে নির্ণীত হয় তা নিরূপণের অনুসন্ধিৎসা দেখা দিল। সেই সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র খুঁজে পাবার অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের সন্ধান করা এবং আরনেস্ট হেকেলের কথিত "জাতিজনি বৃক্ষ" (Phylogenetic tree) সম্পর্কে সুসংহত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলল। এই প্রচেষ্টারই ফলে নতুন করে সন্ধান পাওয়া গেল আরও বেশ কিছু জীবের এবং অভিব্যক্তি মতবাদকে আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হল। একই সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষামূলক জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার সূচনা হল। বহু সংখ্যক প্রাণিপ্রজাতির সনাক্তকরণ সম্পন্ন হওয়া এবং অভিব্যক্তি মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা নতুন প্রজাতি সনাক্ত-করণের তুলনায় সনাক্ত জীবের সঠিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া ও শ্রেণীবিভাগের যথাস্থানে স্থাপনের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। এর ফলে অবশ্য কিছু কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হল। কোন কোন শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বেকার শ্রেণীবিভাগকে ভেঙ্গে নতুন করে

সাজালেন (Splitter)। কেউ কেউ একাধিক প্রজাতি বা গণকে একত্রিত করলেন (Lumper)। এই পরিস্থিতিতে নতুনভাবে প্রকাশ পেল মেণ্ডেলের বংশধারা সংক্রান্ত মতবাদ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হল।

5. প্রাণিপ্রজন ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস প্রণালী :

প্রজাতির সনাক্তকরণ বা বিবরণ দানে জাতিভিত্তিক (Typological) পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে বিশেষত ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের প্রাণীদের মধ্যে কিছু কিছু চারিত্রিক পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত এই বৈষম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় বহুজাতিক প্রজাতি (Polytypic species)। ক্রমে জীবসংখ্যা বা প্রাণিপ্রজন শ্রেণীবিন্যাসে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। প্রাণী তার পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়। প্রাণীকে তার আকার, আচরণ ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদির সম্যক সম্বন্ধের দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা শুরু হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই জৈবিক শ্রেণীবন্যাস পদ্ধতি বলা যায় (J. S. Huxley, 1940 বলেন New Systematics)। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আকারগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আচরণগত বৈশিষ্ট্য, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক, শারীরবৃত্তিয় বিষয়, জীবরাসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির মারফৎ প্রাণীকে জানার চেষ্টা চলে। ফলে শ্রেণীবিন্যাসে পরিবেশ এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচলন হয়।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বপ্রচলিত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিকে স্থানচ্যুত করেনি বরং বলা যায় প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে নতুন সংযোজন। তবে একথাও উল্লেখ্য, যে সকল গোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম অর্থাৎ অনেক প্রজাতি বা গণ অজানা থেকে গেছে বলে মনে করা হয় অথবা যে সকল অঞ্চলের প্রাণীদের সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ এখনও সম্ভব হয়নি সে সব ক্ষেত্রে প্রজনভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস আশা করা বাস্তবানুগ নয়, অন্যভাবে বলা যায় কোন্ ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস কোন্ পর্যায়ের হবে তা নির্ভর করবে সেই গোষ্ঠী বা অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞানের মানের উপর।

প্রজন ভিত্তিক এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণীবিন্যাসের একক কোন একটি নমুনা বা জাতিরূপ প্রাণীকে না ধরে প্রাণিপ্রজনকে শ্রেণীবিন্যাসের একক হিসাবে ধরা হয়। প্রজন অন্তর্ভুক্ত পরিলক্ষিত বৈষম্যের ভিত্তিতে প্রজাতির

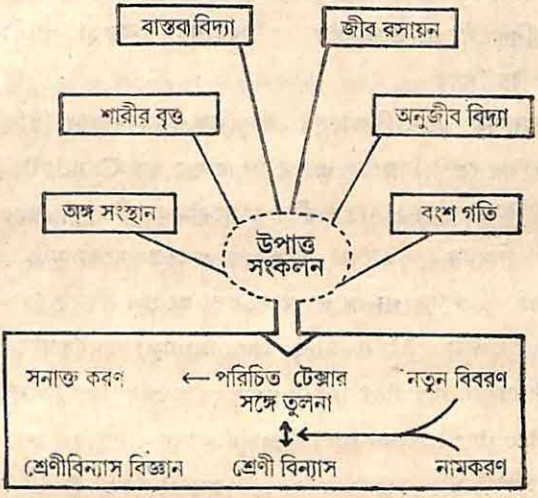
জাতিরূপ প্রাণী উপাদান (Type specimen) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও এ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। তবে শ্রেণীবিন্যাস যেহেতু রাশিতত্ত্ব জাতীয় বিজ্ঞান সেই কারণে সম্পূর্ণ প্রাণিপ্রজনের পরিবর্তে জাতিরূপ বা নমুনা প্রাণীর বিবরণ অর্থবহ মনে করা হয়। একথাও বোঝা দরকার যে প্রাণীর যথেষ্ট সংখ্যক চারিত্রিক গুণাগুণই প্রধান কথা নয় বরং চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্পর্কই বিবর্তন বা জাতি জনির ইঙ্গিত বহন করে। চলমান এই প্রাণিপ্রজন দৃশ্যের গতিশক্তি যেহেতু বিবর্তন সেই কারণেই সম্ভবত শ্রেণীবিন্যাসের মৌল একক প্রজাতিকে গতিহীন কোন চিরকালীন সূত্রে আবদ্ধ করা অযৌক্তিক।

6. আধুনিক ধারা ঃ

এই ধারাকে শ্রেণীবিন্যাসের সর্বাধুনিক ধারা মনে করা হয়। তবে এই ধারা পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। এই ধারার প্রচলন হয়েছে হাক্সলে কথিত 'নব শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি' প্রবর্তিত হবার সময় থেকেই এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি—(1) শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সমস্ত পদ্ধতি ও মতামতের পুনর্মূল্যায়ন। ইদানীং কালের প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত প্রকাশনের দিকে নজর দিলেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। প্রাসঙ্গিক-ভাবে উল্লেখ্য Henig (1950-'66), Cain (1958), Simpson (1961), Gunther (1962), Mayr (1957-58, '64, '70, '81) প্রভৃতি প্রকাশন। (2) আধুনিক কালের আবিষ্কৃত নবতর সহায়ক যন্ত্রপাতি ও কৃতকৌশলের প্রয়োগের মাধ্যমে আরও সহজে অধিকতর বস্তুগত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা। (3) জীব-রাসায়নিক ও অণুজীববিজ্ঞানের জ্ঞানকে শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আরো বেশী কাজে লাগানো এবং জাতি জনি বা অভি-ব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকা। অণুজীববিজ্ঞানীরা ক্রমশ অনুধাবন করতে পারছেন, বৃহৎ অণুর বিবর্তন বোঝার পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রাণীর জাতিজনি বোঝা। বিভিন্ন গোষ্ঠীর তুলনামূলক বিশ্লেষণেও অভিব্যক্তি এবং শ্রেণী-বিন্যাস প্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায় প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসের আধুনিক ধারা জীববিজ্ঞানের সমস্ত শাখার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিশীলিত এবং নিত্য নতুন উদ্ভাবিত প্রকরণকে কাজে লাগাতে অকৃপণ। Trüper and Krämer, (1981)-এর উপস্থাপিত চিত্রের সামান্য পরিবর্তনসহ শ্রেণীবিন্যাসের আধুনিক ধারাকে

সহজেই পরিস্ফুট করা যায় (চিত্র 1)।

অঙ্গসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুত পূর্ণাঙ্গ ও ভ্রূণ উভয় অবস্থায় অঙ্গ-সংস্থানকে বোঝায়। পূর্ণাঙ্গের অঙ্গসংস্থানে যৌনাঙ্গ, শুঁড় ইত্যাদি বিভিন্ন



চিত্র 1 : Trüper ও Krämer (1981)-এর চিত্রের সামান্য পরিবর্তনসহ প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসের আধুনিক ধারা।

আকৃতির প্রাধান্য সত্ত্বেও আধুনিক ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ, কম্পুটার ইত্যাদির ব্যবহারে আরও নির্ভরযোগ্য চরিত্রের সন্ধান, সহজ পন্থা অথবা সময়ের অপচয় কমানোর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ভ্রূণাবস্থা অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত বহুরূপতা দশাযুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে কিংবা শোষকের ভ্রূণাবস্থা অনেক সময়ই যথেষ্ট সহায়ক হয়ে থাকে।

শারীরবৃত্তিয় বিষয় অনেক সময়ই জীব রাসায়নিক বিষয়ের সঙ্গে মিশে যায়। কারণ শারীরবৃত্তিয় বিষয়গুলি বৃহৎ অণু এবং উৎসেচকের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

শারীরবৃত্তিয় বিষয়েরই অঙ্গাঙ্গি আর একটি দিক হচ্ছে প্রাণীদের **আচরণগত দিক**। প্রাণীদের বেশ কিছু আচরণ বংশধারা সম্পৃক্ত এবং উন্নততর শ্রেণীবিভাগে অনেক ক্ষেত্রেই সহায়ক। পাখির স্বর বা বাসা-বাঁধা অথবা ব্যাঙের বা মাছের কোন কোন আচরণ ইত্যাদি উল্লেখ্য।

বাস্তব্য বিদ্যা শ্রেণীবিন্যাসে স্থান করে নিয়েছে এরিস্টটলের সময় থেকেই, তবে আধুনিক কালে বাস্তব্য বিদ্যার উন্নততর জ্ঞানভাণ্ডার শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে সহায়ক উপাদান হিসাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। একথা আজ স্বীকৃত যে নিকটতম গোষ্ঠীর মধ্যে বাস্তব্য স্তরের (Ecological niche) প্রভেদ এবং বিধ্বংসী প্রতিযোগিতা পরিহারের প্রবণতা প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাসে লক্ষণীয় বিষয়।

জীব রসায়ন শ্রেণীবিন্যাসের আধুনিক চিন্তাধারায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। যদিও শ্রেণীবিন্যাসে এর ব্যবহার শুরু হয় Candolle (1813)-এর সময় থেকেই কিন্তু বর্তমান সময়ে জীব রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক সময়ই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। সেই দিক থেকে অণু-শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান (Molecular taxonomy) 'বৃহদাণু শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান' (Macromolecular taxonomy), 'ক্ষুদ্রাণু শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান' (Micromolecular taxonomy) ইত্যাদি পদের ব্যবহারও করা হয়েছে।

জীব রাসায়নিক পর্যালোচনায় প্রধানত দৈহিক উপাদানের (রক্ত, কোষনির্যাস, কোষপর্দা, নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, বিপাকীয় পথ ইত্যাদি) তুলনামূলক পরিস্থিতির মাধ্যমে সম্পর্ক নির্ধারণ ও শ্রেণীবিন্যাসের অবস্থান নিরূপণ করার চেষ্টা হয়। এই কাজে ক্রোমাটোগ্রাফি, ইলেক্ট্রোফোরেসিস্, ইনফ্রারেড স্পেকটোগ্রাফি ইত্যাদি নবতর কৃতকৌশলের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।

Krämer এর ব্যবহৃত চিত্রের অনুজীব বিদ্যার স্থলে **কোষ বিজ্ঞানের** আলোচনা আরও বেশী অর্থবহ হবে। কোষ বিজ্ঞানের জ্ঞান শ্রেণীবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানত দুটি উপায়ে—(1) ডি. এন. এ—যোজ্যতা এবং (2) ক্রোমজমের গঠন ও সংখ্যা ইত্যাদির তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে। উন্নত কৃৎকৌশলের সহায়তায় ডি. এন. এ এবং ক্রোমজমের পর্যালোচনার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

বংশগতি বিজ্ঞান বা **জেনেটিক্স** শ্রেণীবিন্যাসের আধুনিক ধারাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা দিতে সহায়তা করেছে। জেনেটিক্স বস্তুত জাতিজনি, পরিব্যক্তি, বিবর্তন ইত্যাদির সমন্বয় ও সংশ্লেষণের পথে শ্রেণীবিন্যাসের উন্নত ব্যাখ্যাদানে সহায়ক হয়েছে।

আধুনিক ধারায় নিকটতম শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠীর মধ্যে সাযুজ্য বা আত্মীয়তা নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে সাংখ্যিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম দেওয়া হয়েছে **সাংখ্যিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান** (Numerical Taxonomy) অথবা 'ট্যাক্সিমেট্রিক্স' (Taximatrix) কিংবা 'ট্যাক্সোনোমেট্রিক্স' (Taxonomatrix) কিংবা 'ট্যাক্সোমেট্রিক্স' (Taxomatrix)। এই পদ্ধতিতে সম্ভাব্য বেশী সংখ্যক চরিত্রকে ধরা হয় এবং সব চরিত্রকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত চরিত্রের সম্পর্ক বা তুলনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী স্থাপন সম্ভব মনে করা হয়। Womble (1951) বহুমুখী পরিমাপ সূচক সংখ্যা ও পরিসংখ্যাকে একটি **বিমিশ্র চলে** (Composite variable) সংশ্লেষণের একটি পদ্ধতি হিসেবে **"বিভেদক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি"** (Differential systematics) নামটি ব্যবহার করেছেন। **বিমিশ্র চলের** রীতিগত কাজ হচ্ছে সকল সঞ্চার পথের (প্রাণীর) সম্পূর্ণ বাস্তবতা অর্থাৎ মূল বস্তুগত চরিত্র থেকে গড় পরিবর্তনের মূল্যায়ন। অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের দূরত্বের সঙ্গে পরিবর্তনের হার একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের স্থল নির্ধারণে সহায়তা করে। তবে বিভেদক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি খুব বেশী বিজ্ঞানী এখনও ব্যবহার করেন না।

Trüper ও Krämer-এর চিত্র শ্রেণীবিন্যাসের আধুনিক ধারাকে অনেকটাই প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছে। প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসে অঙ্গসংস্থানিক, বাস্তব্য বিদ্যা, জীবরাসায়নিক, অনুজীববিদ্যা ইত্যাদি জীববিজ্ঞানের সব দিকের তথ্য বা জ্ঞানের সংশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচিত নিকটতম প্রাণিগোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা পদ্ধতিতে সনাক্তকরণ এবং নামকরণ প্রক্রিয়ার পথে শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই আধুনিক ধারার বৈশিষ্ট্য।

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদ ঃ

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানেও কয়েকটি মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন দিকের মত শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানেরও অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা প্রাণিগোষ্ঠীর (Taxa) গুরুত্ব, আরোহী-অবরোহী ধাপের (Hierarchy) অর্থ এবং শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। পূর্বেকার অধিকাংশ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক গোষ্ঠী নির্ধারণ

অর্থাৎ প্রকৃতিতে অবস্থিত জীবগোষ্ঠীদের খুঁজে বার করা মাত্র। কারও কারও মতে শ্রেণীবিন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য একান্ত চরিত্র বা চারিত্রিক নির্যাসের (Essense) সাহায্যে গোষ্ঠী নিরূপণ। আবার কারও কারও মতে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য জীবজগতের প্রকৃত সাযুজ্য খুঁজে বার করা।

এসব বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের মতবাদ সম্পর্কে কিছু না থাকলেও শ্রেণীবিন্যাসের মতবাদ বা দর্শনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদিও আজও লেখা হয়নি তবুও উপস্থাপিত শ্রেণীবিন্যাস ও সম্পর্কিত মতবাদকে প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এইসব মতবাদে ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকলেও শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক এগুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

মতবাদগুলিকে পর্যায়ক্রমে এভাবে সাজানো যায় :—

1. নির্যাস বাদ (Essentialism) ;
2. নামিক (ব্যক্তিসত্ত্বা) বাদ (Nominalism) ;
3. প্রয়োগ বাদ (Empericism) ;
4. জাতিজনির শাখা বিস্তার বাদ (Cladism) ;
5. অভিব্যক্তি ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস (Evolutionary classification)।

এই মতবাদগুলো সম্পর্কে ইদানীং কালে কিছু কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। একটি অভিযোগ মতবাদগুলো সাময়িক বা শর্তসাপেক্ষ। বিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্বইতো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না, অনুমানের সাহায্যে অগ্রসর হতে হয়। প্রমাণ সাপেক্ষ নক্সা (Model) বা অনুমানসিদ্ধ মতবাদের ব্যবহার বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখার ন্যায় শ্রেণীবিন্যাসেও বাতিল করা যায় না। বস্তুত শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদের ভিত্তি যথেষ্ট গভীর ও ব্যাপ্ত।

1. নির্যাস বাদ (Essentialism) ঃ

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদের ক্ষেত্রে এরিস্ট্টলীয় যুক্তিবাদের প্রভাব প্রাথমিকভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতীয়মান হয়। পরে লিনিয়াস এই মতবাদ গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করেন। আধুনিক সময়ের Thompson (1952, 62), Borgmeier (1957) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের বক্তব্যেও এই মতবাদের সমর্থনই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়। Karl Popper (1950) প্লেটো ও তাঁর অনুবর্তীদের অভিপ্রায় রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পদ্ধতিগত নির্যাসবাদ (Metho-

dological essentialism) নামটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বস্তুর সত্য প্রকৃতি অর্থাৎ তাদের লুক্কায়িত বাস্তবতা বা নির্যাসের আবিষ্কার ও বিবৃত করা। প্লেটো এরিস্‌ট্‌টল ও অন্যান্য নির্যাসবাদীরা মনে করেন যে প্রত্যেক নির্যাসের এক একটি নাম আছে যে নামে সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুটিকে ডাকা হয়। এই নির্যাসের বিবরণকেই বলা যায় সংজ্ঞা।

এই দর্শন জীবজগতের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিচিত্র এই সম্ভারকে বিভিন্ন স্তরের কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রকারে বিন্যস্ত করে।

এই দর্শন বা মতবাদ অনুসারে জীবজগতের বৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন স্তরের প্রকারে স্থাপন করে এবং এক একটি গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীরা একই একান্ত বা নির্যাস চরিত্র প্রতিফলিত করে মনে করা হয়। যেহেতু তারা একই প্রকারের প্রতিফলন ঘটায় সেই দিক থেকে এই মতবাদকে জাতি বা প্রকার বাদও (Typology) বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত ভেদকে নগণ্য এবং গুরুত্বহীন মনে করা হয়। গোষ্ঠীর (Taxa) স্থিতিস্থাপকতা ও অন্তর্গোষ্ঠীয় বিচ্ছেদের সুস্পষ্টতা যেভাবে ধরে নেওয়া হয় তাতে অতিশয়োক্তির আভাস পাওয়া যায়। এই মতবাদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই বাধার সন্মুখীন হয়। তাত্ত্বিক দিকের প্রধান ত্রুটি—নির্যাস বা একান্ত চরিত্র নির্ধারণের কোন পদ্ধতির অনুপস্থিতি এবং অন্য কোন চরিত্র গণ্য না হয়ে ঐ চরিত্রটি গণ্য হবার কোন যুক্তির অভাব। ব্যবহারিক দিকের প্রথম অসুবিধা অধিকাংশ গোষ্ঠীই বহুচারিত্রিক প্রকৃতির (Polythetic); প্রায় প্রতিটি উচ্চতর গোষ্ঠীর মধ্যেই কিছু কিছু প্রজাতি থাকে যাদের একান্ত বা নির্যাস প্রকৃতির চরিত্র না থাকা সত্ত্বেও সার্বিক সাক্ষ্য ও মূল্যায়নে সুস্পষ্টভাবে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ এই মতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সাধারণ চরিত্র এবং অভিসারীতা (Convergence) জনিত সাধারণ চরিত্রের কোন পার্থক্য করা হয় না। এ বাদেও বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে পারম্পর্যযুক্ত (Correlated) চরিত্রের বিতর্কিত বা বিরুদ্ধ মতের সাক্ষ্য পাওয়া যায়—সেসব ক্ষেত্রেও এই মতবাদ অসহায়। এই মতবাদীরা শ্রেণীবিভাগ ও যুক্তিবাদকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন এবং সব কিছুকেই হয় 'ক' বিভাগভুক্ত কিংবা 'ক' বিভাগ বহির্ভূত এইভাবে দেখতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্য দু'একটি ব্যবহারিক ভাল পদ্ধতিও বেরিয়ে

এসেছে যেমন ঐ চরিত্র একমাত্র বিচার্য (ছ' পাযুক্ত বনাম চার পা যুক্ত) এবং এর সাহায্যে দ্বিশাখা নির্দেশিকা দাঁড় করান সম্ভব। এখনও অনেক বিজ্ঞানী সনাক্তকরণের দ্বিশাখা নির্দেশিকা (Dicholtomous identification key) ব্যবহার করেন, এমনকি এই নির্দেশিকাকেই প্রায় শ্রেণীবিন্যাস বলে মনে করেন। নির্যাসবাদীদের পদ্ধতির অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক সম্ভবত শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানীর ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করতে সাহায্য করা। তাতে কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের মতবাদের বিশেষ সুবিধা হয় না।

নির্যাসবাদীদের শ্রেণীবিন্যাসের আদর্শ ছিল প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে আবিষ্কার করা। তাদের প্রাকৃতিক পদ্ধতি কিন্তু সৃষ্টির পরিকল্পনার এতটুকু এদিক সেদিক নয়। অভিব্যক্তিবাদীদের ধারণার সঙ্গে এর মিল খুঁজতে যাওয়া অনর্থক।

তাত্ত্বিক দিক থেকে নির্যাসবাদীদের মতধারা Simpson (1961), Hull (1965), Crowson (1965) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা যথেষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন। কখনো কখনো প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে খুঁজতে গিয়ে প্রকৃতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে সংখ্যার ব্যবহারে। লিনিয়াস সহ বেশ কিছু বিজ্ঞানীর সংখ্যা ব্যবহারের প্রতি বেশ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সংখ্যার ব্যবহারে প্রকৃতিকে প্রকাশ করার এই প্রবণতাকে Stressmann (1950) বলেছেন বিপথগামীতা এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ডারুইনের 'প্রজাতির উদ্ভব'...প্রকাশিত হবার পর থেকে।

2. নামিকবাদ বা ব্যক্তিসত্ত্বাবাদ (Nominalism) ঃ

এই মতবাদে কেবলমাত্র স্বতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত। শ্রেণী, বর্গ, পর্ব ইত্যাদি মানুষের মনের কল্পিত বা আরোপিত ধারণা। প্রকৃতিতে মাছ, পক্ষী, প্রজাপতি ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব অবর্তমান এবং মানুষ এই নামগুলো উদ্ভব করে তার ধারণামত একই রকম প্রাণীদের জন্য এক একটি নাম ব্যবহার করেছে। Gilmour (1940)-এর ভাষায় এই দর্শন অনুসারে শ্রেণীবিন্যাসকে প্রকাশ করা যায় এইভাবে, যদি কোন উচ্চতর গোষ্ঠী কিছু নির্বাচিত চরিত্রের মানের তারতম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠী পৃথকীকরণ ব্যবহারিক বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু অভিব্যক্তি প্রসূত বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবহারিকতা সম্পূর্ণভাবে অপ্রযোজ্য। কারণ উচ্চতর প্রাণিগোষ্ঠীরা শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারিক তৎপরতার সৃষ্টি

নয় বরং অভিব্যক্তির ধারায় সৃষ্ট। সেই কারণেই সংজ্ঞার কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা জীবের ক্ষেত্রে অনুপযোগী।

এই মতে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত বোধগম্য তথ্য অনুভবের ভিত্তিতে প্রাণীদের একত্রিত করে একই শ্রেণীভুক্ত করেন। বস্তুর ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি কাজে লাগান যায়। এইভাবে নীল রং-এর অনুভূতি জাগাবার মত বস্তুদের নিয়ে একটি নীল বস্তুর শ্রেণী সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে যেহেতু অনুভূত বিষয় ভিত্তিক যুক্তি সাপেক্ষে সেই কারণে শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যসাধনে কৌশল প্রয়োগের কিছু সুযোগ থেকে যায়। এ পদ্ধতিতে জড় বস্তু এবং জীবেরা কার্যত একই পন্থায় বিন্যস্ত হয়। বাস্তবে জীবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সম্পর্ক বা আত্মীয়তা নির্ভর করে বংশপরম্পরা ও ডি. এন. এ-র অংশীদারের মাত্রার উপর। জড় পদার্থের ক্ষেত্রে কিন্তু অনুরূপ বা সমান্তরাল কোন বিষয় নেই। মৎস্য, পক্ষী, প্রভৃতি গোষ্ঠীতে পাওয়া যায় বংশপরম্পরা ও সাধারণ ডি. এন. এ ভাণ্ডার। এরা মানুষের কোন কল্পিত বা আরোপিত ধারণা নয়, প্রাকৃতিক বাস্তব সত্বা। জড় বস্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের বিষয় পাওয়া সম্ভব নয়। নামিকবাদে সাযুজ্য ও সম্পর্ক বা আত্মীয়তার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কিত সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত। বাস্তবে কিন্তু কোন প্রাণিগোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যেকার সাযুজ্যের কারণ একই বংশ-পরম্পরতা। সাংখ্যিক বর্হিচরিত্রবাদীরা (Numerical pheneticists) অবশ্য নামিকবাদকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নিয়েছেন। তাদের মতে প্রাণিগোষ্ঠী তৈরী হয় দৃশ্যমান সাদৃশ্যের ভিত্তিতে। অনেক সময়ই এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট শ্রেণীবিভাগ এবং অভিব্যক্তি ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ কাছাকাছি পৌছবার কারণ সাধারণ বর্হিচরিত্র তাদেরই মধ্যে বেশী থাকা স্বাভাবিক যাদের মধ্যে আত্মীয়তা বা বংশপরম্পরতার নৈকট্য :বেশী থাকবে। বর্হিচরিত্র ভিত্তিক দৃষ্টিতে পরিচালিত হয়ে গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিভাগে পৌছবার সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ সকল বর্হিচরিত্রের সমান গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিচিত্র অভিব্যক্তি (Mosaic evolution), বিশেষ অভিযোজন (Special adaptation), অভিসারিতা (Convergence), সমান্তরালতা (Parallelism), গঠনগত এবং জিনগত বিভিন্ন বিষয়ে মনযোগ দিতে পারেন না। Sokal ও Sneath (1963) সাংখ্যিক বর্হিচরিত্রবাদীদের বক্তব্য মেনে নিলেও Mayr (1956), Simpson (1961) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন।

বস্তুত নামিকবাদের প্রবক্তা পদার্থবিদ্যাবিদ Bridgmann। পদার্থবিদ্যার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হলেও জটিল ক্ষেত্রে অনেক সময় অকেজো হয়ে পড়ে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে শ্রেণী, গণ, প্রজাতি ইত্যাদিকে মানবমনের সৃষ্টি মনে করলে সংজ্ঞাগুলো শুধু ব্যবহারিক হয়ে দাঁড়ায়। বিবর্তনমুখী ঘটনায় কেবলমাত্র সংজ্ঞা অপ্রয়োজনীয় এবং অনুপযোগী। কার্য-কারণ বিশ্লেষণের পথেই বৈজ্ঞানিক ধারায় অগ্রসর হয়।

3. **প্রয়োগবাদ** (Empericism) :

এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ধরা হয় লিনিয়াসের সমসাময়িক এবং প্রতিদ্বন্দ্বী Adanson (1724-1806) নামক উদ্ভিদবিদ্যাবিদকে। তাঁর উপস্থাপিত শ্রেণীবিভাগ সেই সময়ের তুলনায় বর্তমানে অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ তিনিই সেই সময়ে অবরোহী যুক্তিবাদের পথ ও ত্রুটিপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। এই মতবাদের বক্তব্য অনুযায়ী সুচিন্তিত-ভাবে প্রাণীদের যথেষ্ট সংখ্যায় চরিত্রের মূল্যায়ন করা হলেই একটি প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগের আবির্ভাব ঘটে। এর জন্য শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক কোন মতবাদ অপ্রয়োজনীয়। ব্যবহারিক দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী এই চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে যদি কোন শ্রেণীবিভাগে উপনীত হন এবং সেই শ্রেণীবিভাগের যদি কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকে সে ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিন্যাস উন্নত কৃৎকৌশল রূপে গণ্য হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের মর্যাদালাভে বঞ্চিত হয়। প্রয়োগবাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও এবং এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটা সত্ত্বেও কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক মর্যাদালাভে অসমর্থ। Blackwelder-এর মতে প্রাকৃতিক শ্রেণী-বিভাগে দলগুলোতে বৃহত্তম সংখ্যক সাধারণ চরিত্র থাকে এবং দলগুলোর পরিসীমা প্রতিসারিতা জনিত বিচ্ছেদ দ্বারা নির্ধারিত থাকে।

শ্রেণীবিন্যাসের বিজ্ঞানসম্মত যথাযথ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ডারুইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' প্রকাশিত হবার সময় থেকে।

4. **জাতিজনি শাখাবিস্তারবাদ** (Cladism) :

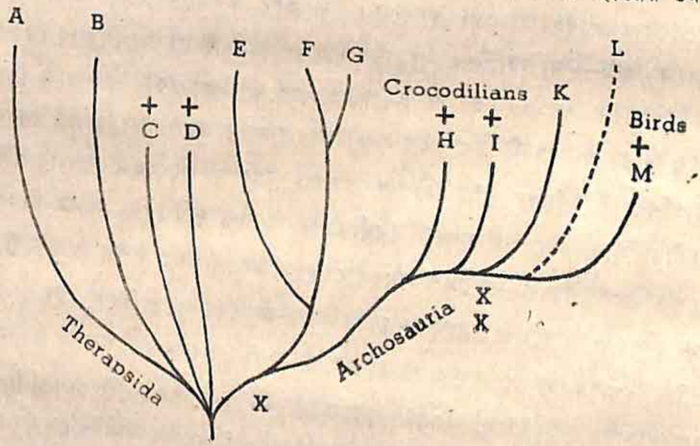
এই মতধারায় জীবের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় জাতিজনিক কল্পিত বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বিস্তারের ভিত্তিতে। অর্থাৎ কোন প্রাণিগোষ্ঠী সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে কোন্ ক্ষণে পৃথক হয়ে ভিন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে তারই

ভিত্তিতে। Hennig (1950, 1966) সহ এই মতের প্রবক্তরা নিজেদের জাতিজনি'ক শাখা বিস্তারবাদী (Cladist) বলে পরিচয় দিতেন। এঁরা শ্রেণীবিন্যাস করেছেন শুধুমাত্র জাতিজনির শাখা বিস্তারের বিন্দুকে ভিত্তি করে। যেহেতু শাখাবিস্তার জাতিজনি পদ্ধতির একাধিক বিষয় বা ঘটনার একটিমাত্র বিষয় বা ঘটনা সেই কারণে Rensch (1974), Cain & Harrison (1960), Mayr (1956, 1971) প্রমুখের মতে সংশয় বা অস্পষ্টতা দূর করার উদ্দেশ্যে এই মতবাদকে জাতিজনিক শাখাবিস্তার বাদ (Cladism) আখ্যা দেয়াই শ্রেয়। Mayr-এর মতে জাতিজনি'র শাখা-বিস্তারবাদ (Cladisim) ও জাতিজনি (Phylogeny) সমার্থ-শব্দ হিসেবে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। Gisin (1964) উল্লেখ করেছেন যে শাখা-বিস্তারবাদকে আবার বংশলতিকা বিষয়ক (Geneological) ভাবধারা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। ডারুইনের মতে শাখাবিস্তারবাদীদের প্রধান ত্রুটি—অভিব্যক্তির ধারায় জীবের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা নির্ভর করে শাখাবিস্তার ও পরবর্তী অভিসারীতা এই দুই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে, কিন্তু তাঁরা এ বিষয়টি ঠিকভাবে লক্ষ্য করেন না ; ফলে তাঁদের দৃষ্টি থেকে যায় আংশিক। Mayr (1966) এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে শাখাবিস্তার-বাদীরা আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নির্ধারণের সুস্পষ্ট দুটি দিক—জিন বিষয়ক ও বংশলতিকা বিষয়ক—অনেক সময়ই খেয়াল করেন না। অবশ্য নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে বাস্তবে অনেক সময়ই এ দুটো একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। জাতি-জনির ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র এমনকি লক্ষ লক্ষ প্রজন্মকে হিসেবে আনতে হয় এবং পরিব্যক্তি (Mutation), পুর্ণমিলন ও নির্বাচনের (Recombination and selection) দরুন সহস্র রকমের জিন পরিসংখ্যা পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই কারণেই আত্মীয়তা নিরূপণ শুধু বংশলতিকা ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের প্রধান বিচার্য বিষয় জিন সংক্রান্ত সাযুজ্য। যদি এমন ঘটনা প্রকৃতিতে ঘটে যে কোন একটি শাখা তীব্র কোন নির্বাচনী চাপের সম্মুখীন হবার ফলে বংশলতিকা সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের থেকে নাটকীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তাদের জিনের গঠনের এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে যে তাদের আর পূর্বতন বংশলতিকার নিকটাত্মীয়দের কাছাকাছি বলে দাবী করা সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ

করা যায় যে যদিও কুমীর ও পক্ষীরা শাখা বিস্তারের দিক থেকে নিকটাত্মীয়, কারণ উভয়েই Pseudosuchian গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, কিন্তু পক্ষী খেচর অভিযোজনের ফলে জিন গঠনের দিক থেকে কুমীর থেকে অনেক পৃথক হয়ে পড়েছে (চিত্র 2)। কুমীরের জিনের গঠন পক্ষীর তুলনায় বরং অন্যান্য সরীসৃপের কাছাকাছি।

শাখাবিস্তার বিন্দুর ভিত্তিতে প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করা প্রায়শই সঠিক হয় না। এই ভিত্তিতে গোষ্ঠীভুক্ত করা হলে আফ্রিকার বানরদের (Ape-Pan) প্যানজিডি গোত্র থেকে সরিয়ে হোমিনিডি গোত্রভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিত। ফলে প্রাণীবিজ্ঞানীদের একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো। শাখাবিস্তারবাদীদের নজর প্রধানত শাখাবিস্তার বিন্দুর দিকেই নিবদ্ধ থাকায় বিভিন্ন শাখার অভিব্যক্তি জনিত পরিবর্তনের বিভিন্ন হারের গুরুত্ব,



চিত্র 2 : সরীসৃপের শাথাবিস্তারের অনুমিতিক জাতিজানি
(A) mammals, (B) turtles, (C) ichthyosaurs, (D) plesiosaurs, (E) rhyncocephalians, (F) lizards, (G) snakes, (H) ornithischian dinosaurs, (I) pterosaurians, (K) crocodilians, (L) birds, (M) saurischian dinosaurs ;
+ Extinct. (Mayr, 1969 থেকে)।

এমনকি উপস্থিতি পর্যন্ত অনুধাবনে অসমর্থ হন। Hennig (1966) কিন্তু প্রজাতি বিভাজনই অভিব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান

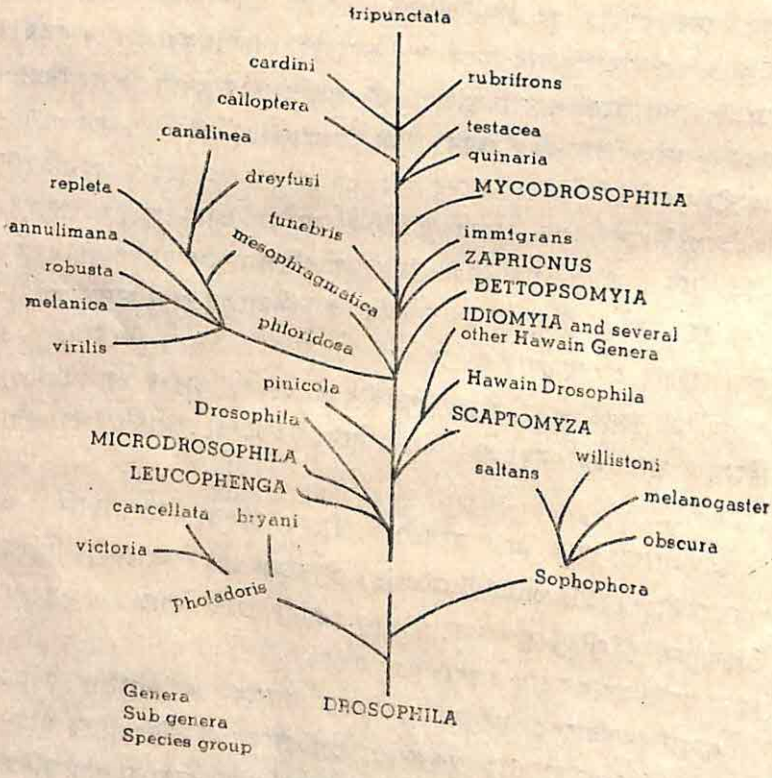
উপাদান মনে করেন। এগুলোকে কেবলমাত্র প্রকৃতিতে জীবগোষ্ঠী স্তরে দর্শনীয় বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করা হয়। Hennigএর এই বক্তব্য গ্রহণ যোগ্য হতে পারে যদি বিভিন্ন শাখার বংশলতিকা জনিত দূরত্ব ও জিন-সংক্রান্ত দূরত্ব একই হয়। তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে শাখাবিস্তার বিন্দুর নির্দেশের মাধ্যমে শিলাস্তরের মাপকাঠিতে প্রাণিগোষ্ঠীর যথাযথ পর্যায় নিরূপণ সম্ভব। উত্তরাধিকার সূত্রে কোন গোষ্ঠী কোন গোষ্ঠীর অধঃস্তন হবে কিনা তা নির্ধারিত হয় শাখাবিস্তার বিন্দু ও বর্তমানের পার্শ্বীয় দূরত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আবির্ভাবের আধুনিকতার উপর। এই ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঘোষণা করা হল যে ভূতত্ত্বীয় স্তরের মাপকাঠিতে শাখাবিস্তার বিন্দুই প্রাণিগোষ্ঠীর যথাযথ পর্যায় নিরূপণ করে। ফলে প্রাক্-কেমব্রিয়ান (Pre-Cambrian) যুগে যে সব প্রাণি-গোষ্ঠীর পৃথকীকরণ ঘটেছে তাদের পর্ব পর্যায়ে গণ্য করা যায়। কেমব্রিয়ান ও ডেভোনিয়নের মধ্যে যাদের পৃথকীকরণ ঘটেছে তারা শ্রেণী পর্যায়ে গণ্য হতে পারে। যাদের পৃথকীকরণ ঘটেছে পারমিয়ান যুগে তাদের বর্গ পর্যায়ে গণ্য করা যায়। ট্রায়াসিক ও নিম্নতর ক্রিটেসিয়াসের মধ্যে যাদের পৃথকী-করণ ঘটেছে তাদের গোত্র পর্যায়ে গণ্য করা যায়। উচ্চতর ক্রিটেসিয়াস্ ও অলিগসিন যুগের মধ্যে যাদের পৃথকীকরণ হয়েছে তাদের দল (Tribe) হিসেবে গণ্য করা হয় এবং মায়োসিনে উদ্ভূতদের গণ পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে।

এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে হলে স্তন্যপায়ীদের বর্গভুক্ত, মারসুপিয়ালিয়া ও অমরাদেহীদের (Placental/Eutheria) গোত্রভুক্ত এবং অমরাদেহীর বিভিন্ন বর্গকে দল (Tribe)-ভুক্ত করতে হয়। প্রাণী শ্রেণীবিভাগে এ ধরনের কল্পনাপ্রসূত অবাস্তবতার ব্যাখ্যা অপ্রয়োজীয়।

শাখাবিস্তারবাদের দুর্বলতা ড্রসফিলা গোত্রের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে Throckmorton (1965) সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এই গোত্রের অভি-ব্যক্তিতে প্রায়শই প্রতিসারিতা ঘটেছে একই বৃন্ত থেকে, রেখা বা শাখাগুলির বিস্তার বিভিন্ন মাত্রায় ঘটেছে। যেসব শাখার সূচক চরিত্র সহ বহিঃচরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে তাদের ভিন্ন গণভুক্ত করা হয়েছে (চিত্র 3)। এই মতবাদীরা ধরে নেন যে কোন গোষ্ঠী থেকে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলে পূর্বপুরুষ গোষ্ঠীর অবলুপ্তি ঘটে। বাস্তবে কিন্তু এ ধরনের ঘটনা

বিরল। সাধারণত পূর্বপুরুষ গোষ্ঠী উত্তরপুরুষ গোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি অপরিবর্তিত বা সামান্য পরিবর্তন সহ থেকে যায়।

শাখাবিস্তারবাদীরা বংশলতিকা প্রস্তুত ও জিন সংক্রান্ত দূরত্বকে এক করে ফেলা ছাড়াও বিচিত্র (Mosaic) অভিব্যক্তি অস্বীকার করেন এবং অনেক সময়ই মনে রাখেন না শ্রেণীবিন্যাস শুধু বুদ্ধিজীবীর কচকচানি নয়, তথ্যের বিশ্লেষণ এবং প্রধানত জৈব জগতের বৈচিত্র্যকে একটি সুসংহত বিন্যাসভুক্ত করা। এঁরা দাবী করেন যে একমাত্র তাঁদের শ্রেণীবিন্যাসের



চিত্র 3 : *Drosophila* ও সংশ্লিষ্ট গণসমূহের জাতিজনি
(Throckmorton, 1965 থেকে)।

মতবাদের মাধ্যমেই **একজাতিজনি** প্রস্তুত (Monophylectic) গোষ্ঠী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ দাবীও সম্ভবত ঠিক নয়। কেউ কেউ

কোন গোষ্ঠীর নির্দেশক চরিত্রের বহুজাতিক প্রবণতাকে গোষ্ঠীর বহুজাতিজনি (Polyphyly) বলে ভুল করেছেন। এটা ঘটতেই পারে যে একটি মাত্র পূর্বপুরুষের এক জাতিজনি প্রসূত বিভিন্ন শাখায় অঙ্গসংস্থানগত চরিত্রে বিভিন্ন মাত্রার পরিবর্তন দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় বহিঃচারিত্রিক ও জেনোটাইপের কি পরিবর্তন ঘটেছে।

স্তন্যপায়ীর কান-চোয়াল (Jaw-ear) অঞ্চলের আবির্ভাব বারে বারে ঘটেছে থিরাপসিড জাতের সরীসৃপ পূর্বপুরুষদের থেকে, যাদের মধ্যে স্তন্যপায়ীর দিকে বিবর্তিত হবার প্রয়োজনীয় জিন অনুক্রম বর্তমান ছিল এবং একই রকম নির্বাচন চাপের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। একে নিশ্চয় বহুজাতিজনিতা বলা যায় না। স্তন্যপায়ীরা একজাতিজনি প্রসূত কারণ সকল স্তন্যপায়ীই ঠিক পূর্ববর্তী মৌলিক থিরাপসিড গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত।

একজাতিজনিতা সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা আছে যে এটি কেবলমাত্র ভূতাপেক্ষিক। এর একটি ভবিষ্যাপেক্ষ দিকও আছে। বক্তব্য রাখা হয়েছে এভাবে—প্রতিটি উচ্চতর গোষ্ঠীভুক্ত প্রজাতিদের একটি সাধারণ কাণ্ড প্রজাতি (Stem species) থেকে উদ্ভূত হতেই হবে (ভূতাপেক্ষ বক্তব্য), এবং এই কাণ্ড প্রজাতি থেকে উদ্ভূত কোন প্রজাতি এই গোষ্ঠীর বাইরে স্থাপিত হবে না (ভবিষ্যাপেক্ষ বক্তব্য)। পরের বক্তব্যটি সাধারণ ধারণা ও অভিব্যক্তিবাদী প্রতিসারীতার বিরোধী। কোন একটি গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষদের মধ্যে অন্য সহ-পার্শ্বিক (Collateral) রেখাগুলির তুলনায় কোন রেখায় তাড়াতাড়ি অভিব্যক্তি ঘটলে সেই গোষ্ঠীকে পৃথক উচ্চতর গোষ্ঠীতে স্থাপন করার দরকারও হয়েছে। উল্লেখ্য Archosauria সরীসৃপদের মধ্য থেকে পক্ষীর বিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটেছে এবং পৃথক উচ্চতর গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। এতে কিন্তু একজাতিজনিক সূত্রের ভূতাপেক্ষ বক্তব্যের সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটেনি। পক্ষীগোষ্ঠী একজাতিজনিক হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং কুমীর ও অন্যান্য সরীসৃপরাও একজাতিজনিক হিসেবেই গণ্য হয়েছে। একজাতিজনিক মতবাদ প্রজাতির নিম্নতর স্তরে যেখানে শঙ্কর বা সংমিশ্রণের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে সেখানে কার্যকরী নাও হতে পারে, এমনকি প্রজাতি স্তরেও একজাতিজনিকতার গুরুত্ব অনেকে বেশী দেন না।

জাতিজনির শাখাবিস্তারবাদ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রূপে গণ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই মতবাদের অপূর্ণতা বা আংশিক

প্রকৃতিও সহজেই নজরে আসে। ফলে অনতিকালের মধ্যেই শ্রেণীবিন্যাসে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব দেখা দিতে থাকে।

5. **অভিব্যক্তিবাদী শ্রেণীবিন্যাস** (Evolutionary classification) :

ডারুইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' প্রকাশিত হবার ফলে জীবজগতের বৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হল। জীবের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ধারণারও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হল। এই সময় থেকেই সুস্পষ্ট হল যে বিভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে সাযুজ্য ও পার্থক্যের প্রধান কারণ পুরুষানুক্রমিক সম্পর্ক ও পরিবর্তন এবং এই পুরুষানুক্রমিক সম্পর্ক ও পরিবর্তনই জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করে। বংশানুক্রমিকতায় পরিবর্তনের বা ভেদের আবির্ভাব পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয় শ্রেণীবিন্যাসের মাপকাঠিতে। অন্যভাবে বলা যায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী প্রকৃতিতে অবস্থিত প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসের আবিষ্কার করেন। প্রয়োগবাদের সঙ্গে এই ধারার পার্থক্য এইটুকু উল্লেখেই পরিষ্কার হয় যে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী প্রকৃতিতে উপস্থিত প্রাণীদের বিন্যাসকে খুঁজে বের করেন বা আবিষ্কার করেন, প্রাণীদের চরিত্রের শ্রেণীবিন্যাস করেন না। চরিত্রকে কেবলমাত্র প্রকৃতিতে উপস্থিত প্রাণীর নিজস্ব সত্বার সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করেন। প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস যে চরিত্রের বিন্যাস নয় একথা ঠিকমত না বোঝায় অনেক সময় গণ ও উচ্চতর গোষ্ঠীকে অনেকে অপ্রয়োজনীয় বিভাজন করেন। **অক্সিপটিলা** (Oxyptila) গণের মাকড়সা চোখের চরিত্রের দিক থেকে **মিসুমিনিনি** (Misumininae) গোত্রের অন্যান্যদের তুলনায় পৃথক। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের বিচারে গোত্রের অন্যান্যদের সঙ্গে মিল থাকা সত্বেও শুধু এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে **অক্সিপটিলা** গণের মাকড়সাদের জন্য একটি পৃথক গোত্র বা উপগোত্র সৃষ্টি করা হলে সে ধরনের শ্রেণীবিন্যাস বা গোষ্ঠী নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হবে না। শ্রেণীবিন্যাসে দৃষ্টি সার্বিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোন বিশেষ একটি চরিত্র ভিত্তিক না হওয়াই কাম্য।

গোষ্ঠী নিরূপণে নির্দেশক **এক চারিত্রিক** (Monothetic) ভিত্তির পরিবর্তে **বহু চারিত্রিক** (Polythetic) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তদবস্থায় কোন প্রজাতির বা উচ্চতর গোষ্ঠীর কোন একটি নির্দেশক চরিত্রের অভাব বা অনুপস্থিতি গোষ্ঠীভুক্ত বা বহির্ভূত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ অসুবিধা থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মাত্র নির্দেশক চরিত্র বা চরিত্রযোগ

যথেষ্ট নির্ভরশীল মনে হতে পারে, যেমন পাখীর পালক বা অণ্ডজ স্তন্যপায়ী ও হংসচঞ্চু। এসব চরিত্রের বা চরিত্র যৌগের ব্যবহারিক উপযোগিতা সত্বেও বহু চারিত্রিক সার্বিক মূল্যায়ন অনেক বেশী বিজ্ঞান-সম্মত।

দার্শনিক বা তার্কিকদের সঙ্গে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের মৌলিক পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গির। জড়ের ক্ষেত্রে বহিঃচরিত্র ভিত্তিক বিভাজন অনেকাংশেই গ্রহণ-যোগ্য। কিন্তু জীবের শ্রেণীবিভাগে আকারগত চরিত্র (Phenotype) প্রথম পদক্ষেপ। অন্য একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক জিনগত চরিত্র (Genotype) বা জিন অনুক্রম (Genetic programme)। এই জিন অনুক্রমই নির্ধারণ করে আত্মীয়তা এবং এরই ভিত্তিতে গড়ে উঠে বিভিন্ন ব্যাখ্যা। এ সবের বাইরেও তাকে নজর দিতে হয় প্রজনের দিকে। বস্তুত শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীকে বিন্যস্ত করতে হয় প্রাণীপ্রজনকে, কোন একটি পৃথক প্রাণী বা এমনকি একটিমাত্র গোষ্ঠীকেও নয়। নিম্নস্তরের গোষ্ঠী যেমন প্রজাতি স্তরের বিন্যাস, বিজ্ঞানীর ইচ্ছানুযায়ী হয় না, হয় বসতিতে প্রজনসূত্রে যুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন কিংবা জিন অনুক্রমের দিক থেকে স্বতন্ত্র কিনা এসব দিকের বিচারে। বিভিন্ন প্রজাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিকতার বিচ্ছেদ একদিকে যেমন জড়ের সঙ্গে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে অন্যদিকে শ্রেণীবিন্যাসের একটি সহায়ক ভিত্তিরূপে গণ্য হয়। এই বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় প্রতিসারী অভিযোজন, অভিব্যক্তির বিষম হার, নিরুদ্দিষ্ট সূত্র (Missing link) ইত্যাদি। নিরুদ্দিষ্ট সূত্রের আবির্ভাব কোন না কোন সময়ে ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।

শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি :

শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনির মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তব্যে কিছু অস্পষ্টতা দেখা দেয়। এই অস্পষ্টতা নিরসনে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি উভয়েই একই সাক্ষ্য বা ভিত্তি নির্ভর। অর্থাৎ উভয়ের গঠন প্রধানত প্রজাতির নৈকট্য ও দূরত্ব এবং চরিত্রের তুলনামূলক সাযুজ্য ও বৈষম্যের ভিত্তিতে। তবে একথা ভাবাও ঠিক হবে না যে জাতিজনি গড়ে উঠে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে কিংবা শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে জাতিজনির উপর, বরং উভয়েই নির্ভরশীল প্রাকৃতিক গোষ্ঠীর অবস্থিতির উপর। যেহেতু চারিত্রিক গঠন বংশপরম্পরা সম্পৃক্ত সেই দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি সম্পর্কহীন বলা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়

যে সব প্রাণিগোষ্ঠী বংশলতিকা বিচারে খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে চারিত্রিক সাযুজ্য তুলনামূলকভাবে বেশী আশা করা যায় এবং আত্মীয়তার বিচারে যারা যত দূরে তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈষম্যও বেশী থাকাই স্বাভাবিক। একে কিন্তু আবর্ত যুক্তি ভাবা ঠিক হবে না।

শ্রেণীবিভাগের প্রকার ঃ

জীব শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদ ও শ্রেণীবিভাগের প্রকার এই দুটি বিষয় এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যে একটিকে আর একটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উল্লেখ করা কষ্টকর। অন্যভাবে বলা যায় প্রথম থেকে যে সব প্রকারের শ্রেণীবিভাগের আভাস বা উল্লেখ পাওয়া যায় সেই সব শ্রেণী-বিন্যাসের যুক্তি বা ব্যাখ্যা হিসেবেই গড়ে উঠেছে এ বিষয়ক মতবাদ। কিংবা শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে যে সব মতবাদের আভাস পাওয়া যায় তা থেকেও চেহারা পেয়েছে শ্রেণীবিভাগের।

শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয় দুটি দিক হচ্ছে প্রাণী উপাদানের প্রজাতি-ভুক্তি এমনকি প্রয়োজনে উপ-প্রজাতি ভুক্তি এবং প্রজাতি উচ্চতর পর্যায় নিরূপণ। প্রজাতি ভুক্তির বিষয়ে যতটা তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের আয়ত্তাধীন উচ্চতর গোষ্ঠী বা পর্যায় নিরূপণের দিকের যুক্তি বা ব্যাখ্যা আমাদের ততটা আয়ত্তাধীন এখনও হয়নি। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের এই দিকটায় উৎসাহ বৃদ্ধি করেছেন Hennig, Cain, Michener, Simpson, Mayr প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ইদানীং কালের শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা কার্যপ্রণালী (Methodology) এবং সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপনার দিকে আগ্রহী হয়েছেন।

শ্রেণীবিন্যাসের প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে এভাবে সাজানো যায় :—

প্রাণীর আকারগত বা রূপগোষ্ঠী (Phenon) নিরূপণ, এরপরই প্রজাতি নির্ধারণ,

প্রজাতি নিরূপিত হওয়ার পরই প্রজাতি উচ্চতর গোষ্ঠী বা পর্যায় নির্ধারণ এবং

শ্রেণীবিন্যাসের আরোহী অবরোহী ধাপে স্থান নির্ধারণ।

বিভিন্ন ভাবে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ থাকলেও তাদের নিম্নোক্ত প্রকারগুলির যে কোনটির মধ্যে ফেলা যায়।

1. আকার ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Phenetic classification)।

2. প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ (Natural classification)।

3. জাতিজনি ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Phylogenetic classification)।

4. অভিব্যক্তি ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Evolutionary classification)।

5. অমনিস্পেকটিভ শ্রেণীবিভাগ (Omnispective classification)।

1. আকার ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ঃ

এই পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ হয় দৃশ্য চরিত্রের ভিত্তিতেই। এ ক্ষেত্রে জাতিজনি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নজর এড়িয়ে যায়।

আকারগত চরিত্রের বিচার সামান্য দু'একটি চরিত্রের ভিত্তিতেও হতে পারে বা সর্বমোট চরিত্রের ভিত্তিতেও হতে পারে। যদি সামান্য দু'একটি চরিত্রের ভিত্তিতে হয় সে ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক চরিত্রের ভিত্তিতে গোষ্ঠী নিরূপণের তুলনায় সম্পর্কের আবিষ্কারে সহজেই গোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। একটি মাত্র চরিত্র ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হবার ফলে শ্রেণীবিন্যাসীরা সার্বিক চরিত্র বা প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই বেছে নিয়েছেন। রক্তমস্তু (Plasma) বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রোটিনের কার্যক্রম ধারা খুঁজে পাবার চেষ্টা হয়েছে আবার গোষ্ঠীর সাদৃশ্য মূল্যায়নে ডি. এন. এ তুল্যতাকে কাজে লাগাতে চাওয়া হয়েছে।

কিন্তু আকারগত চরিত্র ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের অনেকগুলি ত্রুটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রূপগোষ্ঠী (=Phenon) ও শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠীর (=Taxon) পার্থক্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকারগত চরিত্র প্রাণীর সার্বিক চরিত্রের সামান্য অংশই প্রতিফলিত করে ফলে জিনের গঠনগত চরিত্র সঠিক প্রতিফলিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জিনগত প্রকৃতি ও পরিবর্তনের গুরুত্ব যথেষ্ট। একদিকে যেমন জিনগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আকারগত মিল দেখা দিতে পারে (সমাকৃতি প্রজাতি)। অন্য দিকে জিনগত মিল থাকা সত্ত্বেও আকারগত পার্থক্য থাকাও বিরল নয় (যৌনদ্বিরূপতা, যৌননির্বাচনগত প্যারাডাইস পাখীর উপদল)। সামান্য কিছু প্রাণী ব্যতিরেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রেণীবিভাগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র খুব কমই পাওয়া যায়। আবার অভিসারী অভিযোজনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কৌলিক চরিত্রের তুলনায় আকারগত নৈকট্য বেশী দেখা দেয়।

আকারগত শ্রেণীবিভাগের সব থেকে বড় দুর্বলতা এই পদ্ধতিতে

প্রাকৃতিক গোষ্ঠী নির্ধারণের তুলনায় অনেক সময়ই মানব-মনের চিন্তাপ্রসূত কৃত্রিম গোষ্ঠী গড়ে উঠে, অভিব্যক্তির গোষ্ঠী না হয়ে।

আকারগত চরিত্র ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির উপযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য। বর্তমানে চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রুত তালে ব্যাপক তথ্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবার উদ্দেশ্যে কম্প্যুটারের ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং (E. D. P.) ইত্যাদি সহযোগীরূপে কাজে সহায়তা করছে। অর্থবহ চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সঠিক মূল্যায়ন, জাতিজনি বা অভিব্যক্তির গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় চিন্তাধারার মাধ্যমেই উন্নত শ্রেণীবিভাগ সম্ভব।

2. প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ :

শ্রেণীবিভাগ যে প্রাকৃতিক হওয়া একান্ত আবশ্যক কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের পুরোপুরি বর্জনের মাধ্যমেই তা স্থাপিত হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি গোষ্ঠীর প্রকৃত চরিত্র। অনেকে এই শ্রেণীবিভাগকে জাতিজনি ভিত্তিক অভিব্যক্তি জনিত আত্মীয়তা নির্ভর শ্রেণীবিভাগ বলে মনে করেন। কেউ কেউ (Black welder) প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগকে জাতিজনি ভিত্তিক মেনে নিতে অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর মতে জাতিজনি বিষয়টি অজ্ঞাত এবং মানুষের উপস্থাপিত একটি প্রকল্পমাত্র। প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগে প্রাণীদের মিল ও অমিলের ভিত্তিতে অনেকগুলো দল ও উপদলে বিভক্ত করা হয়। **Blackwelder** 'প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ'কে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন—এর মধ্যবর্তী গোষ্ঠীরা স্বীকৃত হয় সর্বোচ্চসংখ্যক সাধারণ চরিত্রের উপস্থিতিতে, সীমা নির্ধারিত হয় প্রতিসারিতার বিচ্ছেদ দ্বারা এবং তাদের চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্ভুল সিদ্ধান্ত যোগাতে পারে।

প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে অস্পষ্টতা বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। সবারই কাম্য প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ এবং সবাই দাবী করেছেন তার শ্রেণীবিভাগটিই প্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ বা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করে, এমন কি যারা কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের স্রষ্টা তারাও। এসব সত্ত্বেও সিম্পসন মনে করেন যে প্রজাতি যেহেতু উদ্ভূত হয়েছে এবং প্রকৃতিতে বর্তমান সুতরাং এটি প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। সমস্যা উচ্চতর গোষ্ঠী নিয়ে। কিন্তু তারাও তো অভিব্যক্তিরই ফসল। সুতরাং প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ অভিব্যক্তি

জনিত শ্রেণীবিভাগেই অর্থবহভাবে প্রতিভাত হতে পারে।

3. জাতিজনি বা জাতিজনি-শাখা বিস্তার ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ঃ

জাতিজনি শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষে যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এ সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। তবে শাখাবিস্তার বিন্দুই যে একমাত্র শ্রেণীবিন্যাসের উপাদান এ কথাও বলা যায় না। মায়ার জাতিজনি (Phylogeny) ও শাখাবিস্তার বাদ (Cladism) সমার্থক মনে করেন না। অনেকে আবার জাতিজনি ভিত্তিক ও অভিব্যক্তি ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগকে একই ভাবেন। শ্রেণীবিভাগে যে জাতিজনির প্রতিফলন থাকা দরকার একথা Hennig প্রথম উল্লেখ করেন। এই পথেই আদি চরিত্রের অংশীদার ও আবর্তিত চরিত্রের অংশীদারের (Symplesiomorphic and Synopomorphic) চিত্র পাওয়া সম্ভব। তবে জাতিজনি ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ সামান্য দু'একটি গোষ্ঠী ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থে অসম্ভব, কারণ অধিকাংশ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই জাতিজনির সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়নি প্রধানত জীবাশ্মের অপূর্ণতার জন্য। অন্যান্য দিক থেকেও তথ্য লাভের প্রয়োজনীয়তা মেটেনি। এ সত্ত্বেও শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ জাতিজনির ধারণা ব্যতিরেকে শ্রেণীবিন্যাস অভাবনীয়।

4. অভিব্যক্তি ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ

এ বিষয়ে শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক মতবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে অভিব্যক্তিবাদী শ্রেণীবিভাগ বস্তুত জাতিজনির সঙ্গে অভিব্যক্তিজনিত প্রতিসারীতা এবং চারিত্রিক তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে। এই বিভাজনে অভিব্যক্তির ফলে যে সব প্রাণিগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে বা ঘটেছে তাদের বিন্যস্ত করা হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক বা আত্মীয়তা বিদ্যমান তারই ভিত্তিতে গোষ্ঠী নির্ধারণ হয়।

5. অমনিস্পেকটিভ শ্রেণীবিভাগ (Omnispective classification) ঃ

এই শ্রেণীবিভাগের ধারণাটি উপস্থাপিত করেন Blackwelder (1967) প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগেরই বর্ধিত রূপ হিসাবে। এই বিভাজনে প্রাপ্ত সব চরিত্রকেই ধরা হয় কিন্তু ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র সেই সব চরিত্রকে যেগুলো শ্রেণীবিন্যাসের দল স্থাপন ও দলের বা গোষ্ঠীর পার্থক্য নির্ধারণে সহায়ক। এই পদ্ধতিকে অনেকেই বাস্তবানুগ মনে করেন এবং ব্যবহার করেন।

শ্রেণীবিন্যাসে জাতিজনি স্মরণে না রাখলে উদ্ভূত বা উত্থানশীল প্রাণীদের চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন নাও হতে পারে। কোন্ চরিত্রটি আদিম (Primitive), কোন্ চরিত্রটি অভিসারী অভিযোজনের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে অথবা লোপ পেয়েছে কিংবা আকারগত মিল-অমিল অভিসারী বা প্রতিসারী অভিযোজন প্রসূত তা জাতিজনি বিষয়ক ধারণা ব্যতিরেকে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বস্তুত চরিত্রকে ব্যবহার করা হয় জিন সংক্রান্ত সম্পর্ক নির্ধারণের হাতিয়ার হিসেবে। সুতরাং বলা যায় প্রাণীদের শ্রেণী-বিন্যাস যদিও পুরোপুরি জাতিজনির উপর নির্ভরশীল নয়, তবে জাতিজনির সম্যক ধারণার সাহায্যেই শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাসের আরোহী-অবরোহী ধাপ

দৃষ্টিগোচর বিভিন্ন বস্তুকে মানুষের সনাক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলেছে মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই। শ্রেণীবিভাগের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন বস্তুর আপাত সাযুজ্য ভিত্তিক গোষ্ঠীভুক্তি এবং প্রতিটি গোষ্ঠীকে কোন নাম বা প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা। প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এই ধারার শ্রেণীবিভাগের প্রচলন বিভিন্ন দেশে ও ভাষায় বহুকাল থেকেই দেখা যায়। পূর্বের এই শ্রেণীবিভাগ ও স্থানীয় নামকরণের সঙ্গে পরবর্তী শ্রেণীবিভাগের মিল অনেক ক্ষেত্রে না পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সনাক্তকরণ হত বাহ্যিক ধারণা প্রসূত। চারিত্রিক গুণাগুণ বা সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলে অনেক প্রাণীর নামকরণ বা সনাক্তকরণ বহুকাল আগে হলেও অবস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণা গড়ে উঠেনি। জীব বা জড়, উদ্ভিদ বা প্রাণী যে কোন ক্ষেত্রেই সাযুজ্য বা সম্পর্ক ভিত্তিক বিভাজন ও স্তর নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই প্রয়োজন বোধে প্রাণিকুলের বিভাজন করা হয়ে থাকে। মাছ বললে সব মাছকেই বোঝায়, কিন্তু তাদের মধ্যে আকার ও প্রকৃতিগত দিক থেকে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং বিশদভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ করা যায়। ফলে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে বিন্যস্ত করা হয় অর্থাৎ গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীভুক্তি এবং সৃষ্টি হয় বিভিন্ন স্তর বা ধাপের।

লিনিয়াস প্রবর্তিত আরোহী-অবরোহী ধাপ ও পরবর্তী সংযোজন

বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগৎ সম্পর্কে উৎসাহ মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই পরিলক্ষিত হয় এবং এই উৎসাহের ফলে প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শ্রেণীবিন্যাসের ইতিহাসের ভিত্তিতে মনে করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল প্রথম প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করতে প্রয়াসী হন। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে প্রাণিজগতকে 'এনাইমা' ও 'ইনাইমা' (Anaima and Enaima) এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। লাল রক্তহীন অমেরুদণ্ডীদের 'এনাইমা' এবং লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডীদের

'ইনাইমা' ভুক্ত করা হয়। স্তন্যপায়ীদের 'জরায়ুজ' এবং মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ প্রভৃতিকে 'অণ্ডজ' বিভাগভুক্ত করা হয়। প্রাচীন ভারতে প্রাণি-জগতের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে প্রাণীদের আকৃতি ও প্রকৃতি হিসাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(1) জরায়ুজ (মানুষ, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য মাংসাশী প্রাণীসমূহ) (2) অণ্ডজ—(পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ইত্যাদি প্রাণীসমূহ) এবং (3) স্বেদজ (মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাণীসমূহ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাণীর জন্ম হয় গরম ও সিক্ত মাটি থেকে)। প্রাচীন ভারতের এই শ্রেণীবিভাগ সমকালীন চিকিৎসা শাস্ত্রে গ্রাহ্য ছিল; তৎকালীন বিভাজনে আকারগত দিক প্রাধান্য পেলেও জনন পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য ছিল না;

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক প্রাচীন কালের প্রচেষ্টা পুরোপুরি মূল্যহীন না হলেও সুসংহত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক মনে করা যায় না। সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক জীব-শ্রেণীবিভাগ সর্বপ্রথম স্থাপনা করেন সুইডেনের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Carolus Linnaeus (1707-1778) তাঁর প্রসিদ্ধ 'সিষ্টেমা নেচারীতে' (Systema Naturae)। তিনি শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করেন। এই বইয়ের দশম সংস্করণে দ্বিপদ নামকরণ (Binomen nomenclature) পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং অসংখ্য প্রাণীর নামকরণ করেন।

শ্রেণীবিন্যাসের ধাপ বা স্তর যদিও লিনিয়াসের পূর্বেই প্রচলিত ছিল তবুও লিনিয়াসের সময়েই তা সুনির্দিষ্ট চেহারা পেল। লিনিয়াসই প্রথম সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অবলম্বনে সুস্পষ্ট আরোহী-অবরোহী ধাপের প্রচলন করেন।

শ্রেণীবিন্যাসের আরোহী-অবরোহী ধাপকে (Hierarchy) Simpson (1961) সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—আরোহী-অবরোহী ধাপ হচ্ছে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধাপে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো কতগুলি প্রাণিদল বা প্রস্তের অনুক্রমিক কাঠামো, যে কাঠামোর নিম্নতম দলটি বাদে অন্য দলগুলো এক বা একাধিক অধীনস্থ দলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

লিনিয়াস প্রাণিরাজ্যে শ্রেণী (Class), বর্গ (Order), গণ (Genus), প্রজাতি (Species) ও প্রকার (Variety) এই পাঁচটি ধাপের ব্যবহার করেন। লিনিয়াসের পরে খুব অল্পদিনের মধ্যেই আরও বেশ কিছু প্রাণী সনাক্ত হবার

সঙ্গে সঙ্গে 'পর্ব' (Phylum) ও 'গোত্র' (Family) নামক দুটি ধাপ সাধারণ-ভাব স্বীকৃত হয়। 'পর্ব' ধাপটি প্রাণিরাজ্য ও শ্রেণীর মধ্যবর্তী এবং 'গোত্র' ধাপটি 'বর্গ' ও 'গণ' এই ধাপ দুটির মধ্যবর্তী ধাপ হিসেবে গণ্য হয়। 'প্রকার' স্তরটি লিনিয়াস প্রজাতি নিম্নস্তর বিভিন্ন প্রভেদযুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে লিনিয়াসের প্রবর্তিত প্রকার অপ্রচলিত হতে থাকে।

লিনিয়াসের প্রবর্তিত শ্রেণী, বর্গ, গণ, প্রজাতি ও প্রকার ধাপগুলির সাহায্যে প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাসে সঠিক স্থান নিরূপণ সম্ভব। সেই সঙ্গে পর্ব ও গোত্র প্রচলিত এই ধাপ দুটি ধরে নিয়ে উচ্চতর গোষ্ঠীগুলি স্থির করে প্রাণীদের আরোহী-অবরোহী ধাপ অনুসারে সাজালে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ও স্তর বা পর্যায় ভেদ সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এই ধাপ বা স্তরের শীর্ষদেশে থাকে প্রাণিরাজ্য এবং নিম্নতম স্তরে থাকে প্রজাতি। উপ-প্রজাতি (অনেকটা লিনিয়াসের প্রকার) শ্রেণীবিন্যাসের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী স্তর হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। লিনিয়াস ও তাঁর অব্যবহিত পরে স্বীকৃত প্রাথমিক আরোহী-অবরোহী ধাপ উদাহরণসহ নীচের ক্রম অনুসারে সাজানো যায়।

ধাপ	উদাহরণ
প্রাণিরাজ্য	এনিমেলিয়া
⇅	(ANIMALIA)
পর্ব*	কর্ডাটা
⇅	(CHORDATA)
শ্রেণী	স্তন্যপায়ী
⇅	(MAMMALIA)
বর্গ	কার্নিভোরা
⇅	(CARNIVORA)
গোত্র*	কেনিডি
⇅	(CANIDAE)
গণ	কেনিষ্‌
⇅	(CANIS)
প্রজাতি	ফেমিলিয়ারিস

৭৷ (FAMILIARIS)

* লিনিয়াসের ব্যবহৃত নয়।

ক্রমাগত প্রাণী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও তথ্যের পরিধি যত বিস্তৃত হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রাণী জানা গেছে তাদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টাও চলেছে। ক্রমশ উপলব্ধি করা গেছে যে তদানীন্তন প্রচলিত ঐ ধাপগুলো শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে আরও কিছু নতুন নতুন ধাপ সংযোজিত হয়েছে। পর্ব ও শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্তরে উপপর্ব, শ্রেণী ও বর্গের মধ্যবর্তী স্তরে উপশ্রেণী, কোথাও বা কয়েকটি শ্রেণীকে একত্র বোঝাবার জন্য অধিশ্রেণী ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। বৃহৎ প্রাণিগোষ্ঠীর পক্ষে ব্যবহৃত আরোহী-অবরোহী ধাপের স্তর বিন্যাস প্রধানত নিম্নরূপ (তারকা চিহ্নিত ধাপগুলো সচরাচর ব্যবহৃত হয়):

প্রাণিরাজ্য (Anima lkingdom)*
উপ-রাজ্য (Sub-kingdom)
অধিপর্ব (Super phylum)
পর্ব (Phylum)*
উপপর্ব (Sub-phylum)*
অধিশ্রেণী (Super class)
শ্রেণী (Class)*
উপ-শ্রেণী (Sub-class)*
অবশ্রেণী (Infra class)
কোহর্ট (Chohort)
অধিবর্গ (Super order)*
বর্গ (Order)*
উপ-বর্গ (Sub-order)*
অববর্গ (Infra order)
অধিগোত্র (Super family)*
গোত্র (Family)*
উপ-গোত্র (Sub-family)*
ট্রাইব (Tribe)
উপ-ট্রাইব (Sub-tribe)

গণ (Genus)*

উপ-গণ (Sub-genus)

অধিপ্রজাতি (Super species)

প্রজাতি (Species)*

উপ-প্রজাতি (Sub-species)

উপরের ধাপের অতিরিক্ত কিছু ধাপেরও ব্যবহার কোথাও কোথাও দেখা যায়। তবে সবগুলো ধাপের ব্যবহারিক প্রয়োজন অনেক সময়ই অনুভূত হয় না।

এই ধাপগুলো মানুষের সৃষ্ট হলেও প্রকৃতিতে এগুলো অবাস্তব বা অবান্তর বলে ভাবা যায় না। লিনিয়াস নিজে পাঁচটি ধাপের প্রবর্তন করলেও অনতিবিলম্বে ব্যবহৃত আরও দুটি ধাপসহ সাতটি ধাপের উল্লেখ লিনিয়াসের 'সিষ্টেমা নেচারীর' দশম সংস্করণে পাওয়া যায়। কোন প্রাণীকে এই সাতটি প্রচলিত ধাপের অন্তর্ভুক্ত না দেখানো হলে ধরে নেওয়া যায় যে প্রাণীটির শ্রেণীবিন্যাস অসম্পূর্ণ। এর অতিরিক্ত ব্যবহৃত ধাপগুলোর ব্যবহার প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক এবং শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষে আবশ্যিক নয়। তবে অতিরিক্ত ধাপের ব্যবহার কোথাও করা হলে ঐ গোষ্ঠীর বিভাজন যতটা সম্ভব সবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য। কোন শ্রেণীর বিভাজনে উপ-শ্রেণীর ব্যবহার কোথাও করা হলে ঐ শ্রেণীর সব ক্ষেত্রেই উপ-শ্রেণীর ব্যবহার আবশ্যিক। তবে একই পর্ব বা উপ-পর্বভুক্ত অন্যান্য শ্রেণীর বিভাজনে উপ-শ্রেণীর ব্যবহার আবশ্যিক নয়।

লিনিয়াসের প্রবর্তিত আরোহী-অবরোহী ধাপ অনেক সময় অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচিত হলেও বিকল্প পদ্ধতি, বিশেষত রাশিতাত্ত্বিক পরিকল্পনা শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের কাছে প্রধানত দুটি কারণে গ্রহণযোগ্য হয়নি। প্রথমত রাশিতত্ত্বভিত্তিক বিন্যাস পরিকল্পনায় সম্পর্ক বা আত্মীয়তা বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য অনেকটাই অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত রাশিতত্ত্বভিত্তিক শ্রেণী-বিন্যাসের উন্নতিবিধানের সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। কিন্তু লিনিয়াস অনুসৃত পদ্ধতিতে উন্নতিসাধনের অথবা সম্পর্ক বিষয়ে বিকল্প কোন প্রস্তাবনার নমনীয়তা বর্তমান। ফলে এই ধারায় সংবেষ্টন (Lumping) ও সংবিভাজনের (Splitting) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনাও থাকে। এখানে স্মর্তব্য যে নির্দিষ্ট কোন প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না, করা হয়

প্রাণিগোষ্ঠীর। নির্দিষ্ট কোন প্রাণী যদি কোন গোষ্ঠীভুক্ত থাকে, তার সনাক্তকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস অবিচ্ছেদ্য হলেও এক নয়। কোন একটি প্রাণীকে নমুনা হিসেবে ধরে কোন একটি গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব ও আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এটি কিন্তু প্রাণীটির শ্রেণীবিন্যাস নয়। এই নমুনা প্রাণীটির মাধ্যমে প্রজন সম্পর্কে ধারণা করা হয় এবং প্রজনেরই শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

আরোহী-অবরোহী ধাপ ও উচ্চতর পর্যায়

এরিস্টটলের কাল থেকেই প্রাণীদের শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ও উচ্চতর পর্যায় নির্ধারণের প্রয়োগ দেখা যায়। লিনিয়াস ও সমকালীনরাও উচ্চতর পর্যায়ের ব্যবহার করেছেন। তবে অভিব্যক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ের ব্যবহারের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্তী সময়ে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে যে উচ্চতর পর্যায়ের বিভাজন দ্বারাই নিম্নতর ধাপের সৃষ্টি। ডারুইন প্রথম পর্যায় বা ধাপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন। ডারুইনের ভাষায় প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিন্যাস বংশানুক্রমিক, কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর রূপান্তরের মাত্রার ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন গণ, উপ-শ্রেণী, শ্রেণী ইত্যাদি ধাপে প্রকাশ করা হয়। রূপান্তরিত বা ভেদযুক্ত কোন প্রজাতির বংশধরেরা ভিন্ন গণভুক্ত হতে পারে।

শ্রেণীবিন্যাসের যেসব ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক (Geneological) এবং জিন সংক্রান্ত (Genetical) দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটে সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উচ্চতর পর্যায় অধিকাংশ সময়ই গ্রহণযোগ্য না হবার সম্ভাবনা থাকে।

Kinsey (1963) উচ্চতর পর্যায় নির্ধারণে প্রজাতিকে প্রজনের একক এবং শ্রেণীবিন্যাসের নিম্নতম এককরূপে গণ্য করেন। প্রজাতির ঊর্ধ্বে যে কোন স্তরকেই উচ্চতর পর্যায় হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর ব্যবহৃত প্রজাতি এবং উপ-গণ অনেক ক্ষেত্রেই জিন ভিত্তিক প্রজাতির সমতুল্য। শ্রেণীবিন্যাসের দৃষ্টিতে উচ্চতর পর্যায় বলতে যা বোঝায় Kinsey-এর 'উচ্চতর পর্যায়' গ্রন্থের অধিকাংশ বক্তব্যই সেদিক থেকে গ্রাহ্য নয়। তাঁর আলোচনায় প্রজাতি ও গণের পর্যায় স্পষ্ট নয়। তিনি গণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে যেসব চরিত্রের অবতারণা করেছেন সেগুলো বাস্তবে অভিব্যক্তিমূলক প্রজাতির চরিত্র। ফলে তাঁর গণ একটি গোষ্ঠী হলেও উচ্চতর গোষ্ঠী নয়। অন্যদিকে অনেকের মতে

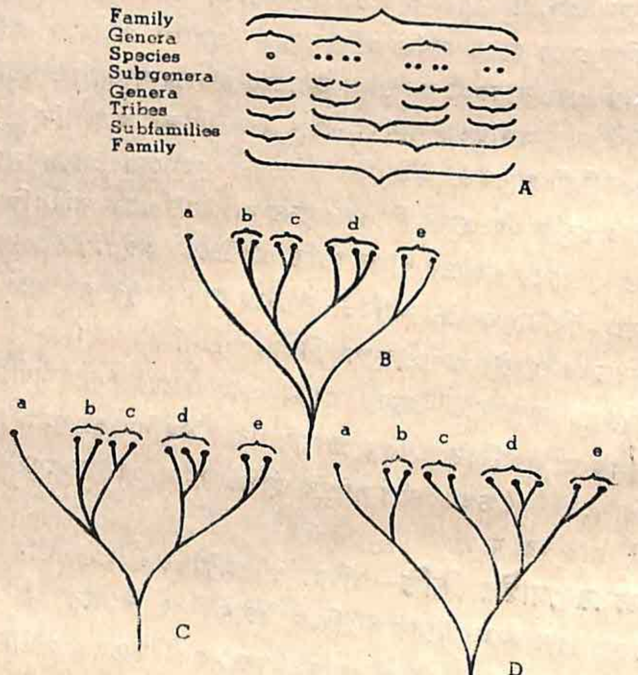
গোত্র এবং তদূর্ধ পর্যায়কেই উচ্চতর পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে শ্রেণীবিন্যাসের আরোহী-অবরোহী ধাপে উচ্চতর পর্যায় বোঝাতে প্রজাতি ও গণের মধ্যে একটি নীতিগত পার্থক্য বোঝায় এবং প্রজাতি উচ্চতর যে কোন পর্যায় বা ধাপকে উচ্চতর পর্যায় হিসেবে গণ্য করার পক্ষেই মতামত বেশী পাওয়া যায়।

উচ্চতর পর্যায়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে :—একটি উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে একটি শ্রেণী (গোষ্ঠী), যে শ্রেণী (গোষ্ঠী)-ভুক্ত করা হয় শ্রেণীবিন্যাসের একই স্তরের সমস্ত জীবগোষ্ঠীকে। কোন গোষ্ঠীর পর্যায় সেই গোষ্ঠীর শ্রেণী-বিন্যাসের স্তরের নির্দেশ করে এবং বংশানুক্রমিক স্থান নির্ণয় করে। প্রাণী-গোষ্ঠী একটি বস্তুগত বিষয় কিন্তু পর্যায় বা স্তর একটি ধারণাগত বিষয়। এ দিক থেকে প্রজাতি পর্যায় ও উচ্চতর পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও অন্যান্য দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রজাতি পর্যায়কে প্রকৃতিতে পৃথকযোগ্য স্বয়ং কার্যকরী কতগুলো উপায়ের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যথা অদ্বিতীয়তা, স্বকীয়তা, পার্থক্য অর্থাৎ জনন বিচ্ছেদ দ্বারা নির্দিষ্ট, জিন ভাণ্ডারের স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি। উচ্চতর পর্যায়ের ক্ষেত্রে সাযুজ্যের ভিত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া বিশেষ ধরনের মাপকাঠি প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। তবে উচ্চতর পর্যায়ের বাস্তব ভিত্তি প্রকৃতিতে অনুপস্থিত ভাবা ঠিক নয়, কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই এবং বিভিন্ন উচ্চতর গোষ্ঠীর মধ্যেও সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় উচ্চতর গোষ্ঠী এবং তাদের পর্যায় নির্ধারিত হয় তুলনামূলক তথ্যের ভিত্তিতে কিন্তু প্রজাতি পর্যায় নিরূপিত হয় জনন সম্ভাব্য-তার ভিত্তিতে। উচ্চতর পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বা বক্তব্যের অভাব প্রায়শই বোধ করা যায়।

উচ্চতর গোষ্ঠীর ভিত্তি—অধিকাংশ শ্রেণীবিভাগ সমকালীন জীবের ভিত্তিতে হওয়ার ফলে কালের পরিধিকে বিচার্য বিষয় হিসেবে ধরা হয়নি। ফলে উচ্চতর গোষ্ঠীও এই সীমাবদ্ধতা মুক্ত নয়। উচ্চতর গোষ্ঠীর প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তি—বিচ্ছেদের মাত্রা, কেন্দ্রাপসারিতার পরিমাণ এবং নিম্নতর গোষ্ঠীর গুণন বা সংখ্যা। Mayr, Linsley and Usinger (1953) এক জাতিজনি সম্ভূত ও বিচ্ছেদ এই দুটি বিষয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। এই সংজ্ঞাতে কোন একটি উচ্চতর গোষ্ঠী সাধারণ জাতিজনি

থেকে উদ্ভূত এক বা একাধিক নিম্নতর গোষ্ঠীযুক্ত হবে এবং অন্যান্য অনুরূপ গোষ্ঠী থেকে সুনির্দিষ্ট বিচ্ছেদ দ্বারা পৃথক থাকবে। তাঁদের মতে বিচ্ছেদের আকার গোষ্ঠীর আকারের বিপরীতানুপাতিক হবে। সাধারণ চরিত্র মোটামুটি ভাবে সাধারণ পূর্বপুরুষের আধুনিকতার সঙ্গে আনুপাতিক থাকে। এদিক থেকে নিম্নতর গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সাধারণ চরিত্রের বিপরীতানুপাতিক। কেন্দ্রাতিগতার মাত্রা সাধারণ পূর্বপুরুষের দূরত্বের আনুপাতিক। সুতরাং বিচ্ছেদের আকার বেঁচে থাকা নিম্নতর গোষ্ঠীগুলোর সাধারণ পূর্বপুরুষের দূরত্বের আনুপাতিক। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এগুলোই সাধারণ ঝোঁক এবং অন্য কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় নিয়মানুসারে বা সাধারণ ধারণামতে সম্ভাব্য অনুমিতি জাতিজনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।



চিত্র 4 : উচ্চতর বিভাগের এক জাতিজনিতা ও বিচ্ছেদ বৈশিষ্ট্য ; (A) বিভিন্ন মাপের বিচ্ছেদযুক্ত দশটি সমকালীন প্রজাতি ও পাঁচটি উচ্চতর বিভাগ, বিন্দুগুলি প্রজাতি বোঝায় ; **(B-D)** ঐ দশটি প্রজাতির সম্ভাব্য জাতিজনি (Simpson, 1961 থেকে)।

সাধারণ চরিত্র ও কেন্দ্রাতিগতার মাত্রাকে ভিত্তি করে জাতিজনি চিত্রে প্রকাশ করা যায় (চিত্র 4)।

বিচ্ছেদের আকারকে উচ্চতর পর্যায় ও তাদের সম্পর্ক নিরূপণের পক্ষে যথেষ্ট চরিত্র মনে করা হয় না। Sokal and Michener (1958) সাযুজ্যের মিশ্রিত পরিমাপের ভিত্তিতে উচ্চতর পর্যায় নির্ধারণের কথা বলেছেন। জাতিজনি জনিত কেন্দ্রাতিগতা অনেক সময় কিছুটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তবে এ বিচ্ছেদ অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খলভাবে হয়। সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ না থাকলেও কেন্দ্রাতিগতার মাত্রা উচ্চতর পর্যায়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়।

উচ্চতর পর্যায়ের গোষ্ঠী সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনায় প্রথমেই গণের উল্লেখ করা যায়। কারণ গণই প্রজাতি ও উচ্চতর পর্যায়ের মধ্যে সীমারেখা এবং উচ্চতর পর্যায়ের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত।

গণ—Cain (1956)-এর মতে যে পর্যায়গুলো তুলনামূলক তথ্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয় গণ তাদের মধ্যে নিম্নতম ধাপ।

আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের চোখে গণ এবং শ্রেণী, বর্গ ইত্যাদি অন্যান্য উচ্চতর পর্যায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এরিস্টটলীয় যুক্তিবাদ অনুসৃত লিনিয়াসের 'গণ' একটি বিশেষ ব্যবহার। লিনিয়াসের দ্বিপদ নামকরণে এরিস্টটলীয় যুক্তিবাদই গণের তাৎপর্য্য যুগিয়েছে। উচ্চতর পর্যায়ের সংজ্ঞা পেতে হলে বাস্তবানুগ কাজ চলার মত সংজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

গণের সংজ্ঞা—গণ শ্রেণীবিন্যাসের একটি পর্যায় যার মধ্যে থাকে এক জাতিজনি প্রসূত এক বা একাধিক প্রজাতি বা প্রজাতিগুচ্ছ (Species group) এবং এই পর্যায়টি সমান্তরাল অন্যান্য গোষ্ঠী অর্থাৎ গণ থেকে বিচ্ছেদ সূত্রে পৃথক থাকে। এই বিচ্ছেদের আকার বা পরিমাণ নির্ভর করে গোষ্ঠীর পরিমাপের উপর। অর্থাৎ গণের প্রজাতি সংখ্যা যত বেশী হবে বিচ্ছেদের আকার তত ছোট হবে। গণের আকার অবশ্যই শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা ও সুবিচারের উপর নির্ভরশীল। কোন স্তরভুক্তির জন্য একটি গোষ্ঠীর সেই স্তরের অন্য গোষ্ঠী থেকে সুস্পষ্ট এবং যথেষ্টভাবে পৃথক হওয়া আবশ্যক। গোষ্ঠীটি বিচ্ছেদ দ্বারা অন্যগোষ্ঠী থেকে পৃথক থাকবে, একটি বাস্তব্য স্তর বা অভিযোজিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে, গোষ্ঠী-অন্তর্ভু'ক্তদের মধ্যে

বড় ধরনের বিভিন্নতা থাকবে না এবং কিছু ব্যবহারিক সর্ত পূরণে সক্ষম হতে হবে।

গণের চরিত্র—লিনিয়াসের মতে গণই চরিত্র নির্দিষ্ট করে, চরিত্রের ভিত্তিতে গণ নিরূপিত হয় না। এরিস্টটলীয় যুক্তিভিত্তিক লিনিয়াসের এ বক্তব্য বর্তমানে বর্জিত বলেই ধরা হয়। গণ নিরূপণে সুনির্দিষ্ট চরিত্র তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। গণ নিরূপিত হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক সর্তের পরিপ্রেক্ষিতে। উচ্চতর পর্যায় নিরূপিত হয় পরস্পর সম্পর্কিত চরিত্রমালার ভিত্তিতে। এই চরিত্রমালার কিছু চরিত্র কম গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে। কিন্তু এসব চরিত্রের গুরুত্ব বুঝতে হয় অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে এগুলি কিভাবে সম্পর্কিত তারই ভিত্তিতে।

গণভুক্তির তাৎপর্য্য—কোন প্রজাতি বা প্রজাতিগুচ্ছকে কোন গণভুক্তির মাধ্যমে অনেকগুলি দিক একই সঙ্গে বোঝানো হয়ে যায়। এক জাতিজনি প্রসূত একক অর্থাৎ গণভুক্ত প্রজাতিগুলি একই পূর্বপুরুষ সম্ভূত। কিছু কিছু ব্যাতিক্রম সত্ত্বেও সাধারণভাবে একটি বাস্তব্য একক এবং একই রকম জীবন ধারায় অভিযোজিত। অবশ্যই প্রজাতির বাস্তব্য স্তরের তুলনায় গণের বাস্তব্য স্তর অনেক বেশী প্রসারিত।

কোন প্রাণিগোষ্ঠীকে গণে স্বীকৃতি দেবার তাৎপর্য্য একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপনার সমতুল্য। কারণ এই স্বীকৃতির ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক দিক থাকা প্রয়োজন এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ উপপত্তি বা সিদ্ধান্ত নেবার সম্ভাবনা থাকা দরকার।

Igner (1958)-এর ভাষায় গণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি একাধিক পন্থা বর্তমান থাকে কোন একটি মতবাদ বা প্রত্যয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে মতবাদ বা প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা ব্যবহারযোগ্য এবং অধিকাংশ পরীক্ষায় সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয় সেই মতবাদ বা প্রত্যয়েরই অগ্রাধিকার পাওয়া বিধেয়।

গোত্র—অনেক সময়ই সাধারণ মানুষ প্রাণীদের বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে থাকেন, সেগুলো অধিকাংশ সময়ই গোত্র হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। গুবরে পোকা (Dung beetle—Scarabiidae), কাঠঠোকরা পাখী (Wood peckers—Picidae), বোরা সাপ (Vipers—Viperidae) বস্তুত গোত্র বোঝায়। লিনিয়াস গোত্র পর্যায়টি ব্যবহার করেননি। কিন্তু

পরবর্তী সময়ে অসংখ্য প্রাণিগোষ্ঠী আবিষ্কারের ফলে বর্গ ও গণের মধ্যবর্তী একাধিক পর্যায়ের ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। লিনিয়াস গোত্র পর্যায়টি ব্যবহার না করলেও খুব অসুবিধা হয়নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিনিয়াসের ব্যবহৃত গণ পরবর্তী বিচারে গোত্র পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে।

গোত্রের সংজ্ঞা—গোত্র হচ্ছে এক জাতিজনি প্রসূত এক বা একাধিক গণের সমষ্টি, যে গোষ্ঠী সমপর্যায়ের অন্য প্রাণিগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছেদ দ্বারা সুনির্দিষ্ট। গণের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও বিচ্ছেদের আকার গোত্রের আকারের উপর নির্ভরশীল।

গোত্রকেও বিশেষ বাস্তব্য স্তর বা অভিযোজনমূলক চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা নির্ধারণ সম্ভব। গোত্র যেহেতু গণের তুলনায় পুরাতন সেই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার আশা করা যায় এবং প্রায়শই একই রকম পরিস্থিতিতে বর্তমান মনে করা হয়। তবে গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতি বিশেষ পরিস্থিতিতে পাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে।

গোত্রের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার বিষয়ে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। প্রতিটি মহাদেশ বা ভৌগোলিক অঞ্চলে গোত্র সুস্পষ্ট কিছু বিভাগ বা দলে পরিলক্ষিত হতে পারে। এমনকি এই দল বা বিভাগের উপস্থিতিতে অন্য গোত্রের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ থাকা বাঞ্ছনীয় তা লুপ্তপ্রায় হতে পারে। এ ধরণের সংযোগকারী প্রাণিদলকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা পৃথক গোত্রভুক্ত করেন অথবা এদের সহ অধিগোত্র পর্যায় ব্যবহার করেন।

বর্গ, শ্রেণী ও পর্ব—গণ ও গোত্র ব্যাতিরেকে প্রধান প্রধান উচ্চতর পর্যায়গুলির মধ্যে বর্গ, শ্রেণী ও পর্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উচ্চতর এই পর্যায়গুলির ক্ষেত্রেও কার্যকরী এবং অবিসংবাদী কোন সংজ্ঞা না থাকায় কাজ চালানোর মত সংজ্ঞার আশ্রয় নিতে হয়। গণ ও গোত্রের মত একই ভাবে বর্গ, শ্রেণী ও পর্বের সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

বর্গ শ্রেণীবিন্যাসের একটি পর্যায় যে পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে এক জাতি-জনি প্রসূত এক বা একাধিক শ্রেণীগোষ্ঠী এবং তা সমস্তরের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে সুনির্দিষ্ট বিচ্ছেদ দ্বারা পৃথক বা অন্তরিত থাকে। শ্রেণী এবং পর্বেরও একইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। বর্তমান সময়ের প্রাণিপ্রজনের ব্যতিক্রম না রেখেই বলা যায় যে বর্গ এবং আরও উচ্চতর পর্যায়গুলো অনেক সুনির্দিষ্ট এবং অন্তর্বর্তী প্রাণীদ্বারা অনেক কম সংযুক্ত। ব্যতিক্রমগুলোকে দুটি ভাগে

ধরা যায়। প্রথমত কোন কোন চরিত্রের মূল্যায়নে পুনরায় শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন অনুভূত হয় যথা ছিদ্রাল প্রাণী (Sponges), টারবেলেরিয়া জাতের চ্যাপ্টা কৃমি ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত প্রাণিগোষ্ঠী নিরূপণে একমত হওয়া সত্বেও কোথাও কোথাও পর্যায় বা স্তর নিরূপণে বিতর্ক দেখা যায়।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের পরিচিত প্রাণীর পরিধি ক্রমাগতই প্রসারিত হবার ফলে প্রজাতি সংখ্যার সঙ্গে শুধু গণ ও গোত্রের সংখ্যাই নয়, পর্ব, শ্রেণী ও বর্গের সংখ্যাও বেড়ে বর্তমান সময়ে ক্রমানুসারে 25, 80 ও 350 সংখ্যা ছাড়িয়ে চলেছে।

শ্রেণীবিন্যাসের আরোহী-অবরোহী ধাপ এবং শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিকা (Taxonomic key) বা কাঠামো তথ্যগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও অনেক সময় মিলে যেতে দেখা যায়। আরোহী-অবরোহী ধাপটি প্রাকৃতিক ও তত্বগত প্রক্রিয়া এবং নির্দেশিকাটি কৃত্রিম ও সুবিধামত তৈরী কাঠামো শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিকা যেহেতু বাস্তবে সনাক্তকরণের কাঠামো সেই দিক থেকে একে সনাক্তকরণের নির্দেশিকা (Identification key) নামে প্রকাশ করা হয়। সনাক্তকরণের অধ্যায়ে নির্দেশিকা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ট্যাক্সন বা শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠী নিরূপণের সিদ্ধান্ত

শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণীদের গোষ্ঠী (Taxon) নিরূপণের গুরুত্ব অপরিসীম। গোষ্ঠী উচ্চতর বা নিম্নতর যে পর্যায়েরই হোক এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতেই গড়ে উঠে শ্রেণীবিন্যাস। ডারুইনের বক্তব্য অনুসারে বলা যায়, প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণের সাযুজ্য ও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এই মিল-অমিলের ভিত্তিতেই গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী পাওয়া সম্ভব। এভাবেই পরিস্ফুট হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তা বা সম্পর্কের পরিমান। এর ফলে শ্রেণীবিভাগ ফুটে ওঠা সম্ভব হয়।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের গোষ্ঠীনিরূপণে যে সব লক্ষণ উল্লেখ করে থাকেন তাদের প্রধানত বহির্চরিত্রভিত্তিক ও জিনঅনুক্রমভিত্তিক এই দুই ভাগে ধরা যেতে পারে।

বহির্চরিত্র বা আকারগতচরিত্র ভিত্তিক ঃ

গোষ্ঠীনিরূপণে বহির্চরিত্রের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। বহির্চরিত্রের মাধ্যমে জিনের গঠন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা না করা গেলেও পরোক্ষভাবে জিনগত চরিত্র বা গঠন সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ তর্কাতীত নয় কারণ, এ বিষয়ে বেশ কিছু গোলমেলে শব্দের ব্যবহার রয়েছে এবং এ বিষয়ক চিন্তাভাবনাও খুব সুচিন্তিত নয়। সিম্পসনের ভাষায় শ্রেণীবিন্যাস একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ এবং যে সব প্রজাতি উচ্চতর একটি গোষ্ঠীভুক্ত হয় তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্য (Affinity) লক্ষ্য করা যায়। নৈকট্য কেবলমাত্র বাহ্যিক সাযুজ্যের ভিত্তিতে অথবা কেবলমাত্র জাতিজনির শাখাবিস্তার বিন্দুর দূরত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। নৈকট্য নিরূপণ শ্রেণীবিন্যাসে একটি জটিল সমস্যা।

শ্রেণীবিন্যাসের গোষ্ঠীনিরূপণ বস্তুত বহির্চরিত্র বা আকারগত চরিত্র, আচরণগত চরিত্র, অভিব্যক্তির ধারা, জাতিজনির ধারা, জিনগত চরিত্র ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চিন্তার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। জাতিজনি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না হলেও বিভিন্ন ঘটনা বা সাক্ষ্য প্রমাণের

মাধ্যমে এ বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব হয়। জিনগত চরিত্রের সম্পর্কেও পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানেও অনুমিতি ও যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং পরে সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করা নীতি বিরুদ্ধ নয়। অনেক সময় শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন স্তর নিরূপিত হয়েছে এই পথে অভিব্যক্তির মাপকাঠিতে এবং গোষ্ঠী নিরূপিত হয়েছে শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র দ্বারা।

জিনগত অনুক্রম ভিত্তিক :

অধিকাংশ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী মনে করেন উচ্চতর গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে অভিব্যক্তিজনিত প্রতিসারিতার ফলে। অভিব্যক্তির প্রতিটি ধারায় কৌলিক ট্যাক্সার (গোষ্ঠীর) জিন অনুক্রমের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য উত্তর পুরুষের মধ্যে পাওয়া যায়। ফলে অন্য কোন কৌলিক ট্যাক্সা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধারার প্রাণীদের তুলনায় পূর্ববর্তী ধারার প্রাণীদের মধ্যে জিন অনুক্রমের মিল অনেকটা বেশী থাকে। প্রতিটি প্রাণিপ্রজাতির জিন অনুক্রম সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হলে প্রাণীদের প্রাকৃতিক বিভাগ সঠিকভাবে করার চেষ্টা হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু এই পর্যায়ে পৌছানো এখনও সম্ভব হয়নি। বিশেষত উচ্চতর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে জিনের গঠন জানা অসম্ভব না হলেও অবাস্তব, কারণ (1) প্রজাতি উচ্চতর গোষ্ঠীর মধ্যে পর-নিষেক (cross fertilization) অবাস্তব, (2) আকারগত ও জিনগত চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট বা ঘনিষ্ঠ নয়। অনেক সময় আন্তঃপ্রজাতিক (Intraspecific) বৈষম্য সমাকৃতি (sibling) প্রজাতির তুলনায়ও প্রখর হয়। (3) উচ্চতর গোষ্ঠীর চরিত্র সাধারণত বহুসংখ্যক জিন নির্ভর হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতগুলি জিন নির্ভর তা' নির্ধারণ কষ্টকর হয়। জীব রাসায়নিক বিশ্লেষণ অন্যপক্ষে জিনের গঠন সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে। জীবজগতের গঠনের উপাদান মূলত সর্বক্ষেত্রে প্রায় একই। কিন্তু কোন নিচু বা উঁচু স্তরের প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য বস্তুত বৃহৎ অণুর (Macromolecule) পরিব্যক্তিমূলক (Mutational) ধাপের ব্যবধান। এদিক থেকে পরোক্ষভাবে জিন অনুক্রমের ধারণা করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রেও অভিসারী অভিব্যক্তি এবং সাধারণ বংশধারা প্রসূত সাযুজ্যের মধ্যে অস্পষ্টতা যাতে দেখা না দেয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শ্রেণীবিন্যাসে, বিশেষত উচ্চতর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ডি. এন. এ তুল্যতা বা সমকক্ষতাকে (D. N. A. matching)

উল্লেখযোগ্য একটি জীব রাসায়নিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যদিও ডি. এন. এ-তুল্যতা বিষয়ক কৃৎকৌশল এখনও আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। প্রাণীদের চরিত্র যে জিন অনুক্রমের যৌগিক ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ এ বিষয়টি স্বীকৃত হওয়াতে সমান্তরাল রেখায় কোন একটি নতুন স্বাধীন চরিত্রের আবির্ভাব এবং কোন একটি চরিত্রের অবলুপ্তি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত সমান্তরাল রেখাগুলির পর্যালোচনায় অনেক গুপ্ত জিন অনুক্রম সম্পর্কে কিছু তথ্যের ধারণা করাও সম্ভব হয়েছে।

বহুচারিত্রিক ট্যাক্সা (গোষ্ঠী) নিরূপণ ঃ

শ্রেণীবিন্যাসের গোষ্ঠী নিরূপণে উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে বহুচারিত্রিক গোষ্ঠী নিরূপণ পদ্ধতি। পূর্বে শ্রেণীবিন্যাসগোষ্ঠী নিরূপিত হত একান্তভাবেই নির্দেশক চরিত্রের ভিত্তিতে। লিনিয়াসের সময় গোষ্ঠী নিরূপণ করা হত প্রধানত 'সাধারণ চরিত্রের' ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে চরিত্র একটি বা একাধিক হতে পারত। উদাহরণস্বরূপ প্ল্যাটিপাস গোষ্ঠীর পক্ষে 'অণ্ডজ' এবং হংসচঞ্চু এই চরিত্র যৌগ প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট মনে করা হয়। Beckner (1959) ও Simpson (1966) এই ধরনের গোষ্ঠীর জন্য এক-জাতিরূপী (Monotypic) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেহেতু শ্রেণীবিন্যাসে এই শব্দটি অন্য একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই Smith (1962) একচরিত্রে আবদ্ধ গোষ্ঠীর অর্থে মনোটাইপিক (Monotypic)-এর পরিবর্তে একচারিত্রিক বা মনোথেটিক (Monothetic) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ডারুইনের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত মতবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকে 'সাধারণ চরিত্রের অধিকারীর' পরিবর্তে 'সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত' সংজ্ঞাতেই গোষ্ঠী নিরূপিত হতে থাকে এবং নির্দেশক চরিত্রভিত্তিক গোষ্ঠী নিরূপণ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে কোন প্রাণীগোষ্ঠীভুক্ত সকল প্রাণীকেই নির্দিষ্ট বা সকল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বীজ পাওয়া যায় প্রয়োগবাদীদের বক্তব্যে। নির্দেশক একচরিত্রের পরিবর্তে একগুচ্ছ চরিত্রের ভিত্তিতে কোন গোষ্ঠী নিরূপিত হলে এবং ঐ গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যে অধিকাংশ চরিত্র বর্তমান থাকলে ঐ ধরনের গোষ্ঠীকে বহুচারিত্রিক গোষ্ঠী (Polythetic taxa) বলা হয়। উচ্চতর কোন গোষ্ঠীকে বহুচারিত্রিক বলা যায় গোষ্ঠীটি যদি

নিম্নোক্ত সর্তগুলি পূরণ করে—

(1) প্রতিটি প্রজাতিতে মোট চরিত্রের অধিকাংশ চরিত্র বর্তমান থাকবে।

(2) প্রতিটি চরিত্র অধিকাংশ প্রজাতিতে বর্তমান থাকবে এবং

(3) গোষ্ঠীর সকল প্রজাতিতে উপস্থিত না থাকা কোন চরিত্র উচ্চতর অন্যকোন গোষ্ঠীস্থ প্রজাতিতে উপস্থিত থাকবে না।

ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট চরিত্রই বহুচারিত্রিক গোষ্ঠীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নয় এবং কোন একটি চরিত্রই যথেষ্ট নয়। অধিকাংশ গণ উচ্চতর গোষ্ঠী নিরূপণে নির্দেশক চরিত্রের সঙ্গে অন্য কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ থাকে। তবে চরিত্রগুলি নিয়মিতভাবে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। এই কারণে চরিত্র ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক একান্তভাবে সম্পূর্ণ না থাকায় নির্দেশক চরিত্রভিত্তিক সনাক্তকরণের নির্দেশিকা তৈরী কষ্টকর হয়।

ট্যাক্সা বা শ্রেণীবিন্যাসের গোষ্ঠী নিরূপণে সমসংস্থ ও সমবৃত্তি এবং আরও কয়েকটি শব্দের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক।

সমসংস্থ অঙ্গ ঃ

প্রতিসারীতা এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে অনেক ক্ষেত্রেই চারিত্রিক সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেণীবিন্যাসে গোষ্ঠী নিরূপণে সমসংস্থ চরিত্রের সাযুজ্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। সমসংস্থ শব্দটি অভিব্যক্তির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন চারিত্রিক সাযুজ্যকে প্রধানত দুটি পর্যায়ে দেখা হয়—সমসংস্থ ও সমবৃত্তি চরিত্র। সমসংস্থ চরিত্র বা অঙ্গকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়—দুই বা ততোধিক জীবের মধ্যে যে চরিত্র অথবা চরিত্রের অবস্থা (State of feature) তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সেই চরিত্র বা চরিত্রের অবস্থাকে সমসংস্থ চরিত্র বলা হয়। আকৃতিগতভাবে এরা একই রকম হতে পারে বা না হতেও পারে, কিন্তু সৃষ্টি ও বৃদ্ধির দিক থেকে একই সূত্রের হতে হবে, কাজে ভিন্ন হলেও। যেমন উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের অগ্রপদের অন্তকঙ্কাল।

সমবৃত্তি চরিত্র ঃ

সমবৃত্তি চরিত্রে দুই বা ততোধিক জীবগোষ্ঠীর মধ্যে কোন চরিত্র বা চরিত্রের অবস্থার আকৃতিগত মিল লক্ষ্য করা যায়। তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেই সাধারণ চরিত্র খুঁজে না পাওয়া সত্ত্বেও কর্মগত দিক থেকে মিল

থাকে। এই ধরনের চরিত্র বা চরিত্রের অবস্থাকে সমবৃত্তি চরিত্র বলা হয়। (দৃঃ পাখীর ডানা ও প্রজাপতির পাখা)। চারিত্রিক সাযুজ্য খোঁজার ক্ষেত্রে সমসংস্থ ও সমবৃত্তি চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহায়ক না হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তা সত্ত্বেও কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

অন্য কয়েকটি ব্যবহৃত পদের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক।

অভিসারীতা (Convergence)—দুই বা ততোধিক বংশধারার মধ্যে প্রাসঙ্গিক কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ না থাকা সত্ত্বেও একই প্রকার বাস্তব্য অবস্থায় থাকায় চারিত্রিক সাযুজ্যের আবির্ভাব ঘটলে তাকে অভিসারীতা বলা হয়।

প্রতিসারীতা (Divergence)—কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত দুই বা ততোধিক বংশধারা যদি ভিন্ন বাস্তব্য অবস্থার অধিবাসী হয় এবং চারিত্রিক পার্থক্য দেখায় তাকে প্রতিসারীতা বলা হয়।

সমান্তরতা (Parallelism)—কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আবির্ভূত দুই বা ততোধিক বংশধারায় পৃথকভাবে অনুরূপ চরিত্রের উপস্থিতি বর্তমান থাকলে এবং ঐ চরিত্রটি পূর্বপুরুষভিত্তিক হলে তাকে চারিত্রিক সমান্তরতা বা সমান্তরাল চরিত্র বলা হয়।

প্রজাতি-উচ্চতর ট্যাক্সা নির্ধারণ

প্রজাতি-উচ্চতর গোষ্ঠী নিরূপণে প্রথমেই প্রয়োজন দেখা দেয় প্রজাতির নিকটতম আত্মীয় নির্ধারণ এবং আত্মীয়তা প্রসূত নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রজাতিকুলের মধ্যে বিচ্ছেদ নিরূপণ। এই নৈকট্য এবং বিচ্ছেদের ভিত্তিতেই প্রজাতিদের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। এই গোষ্ঠী বা দল সাধারণত গণ পর্যায়ের হয়। গণ নির্ধারণের পরে প্রয়োজন দেখা দেয় এক বা একাধিক গণকে গণ-উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত করা। প্রাণীদের ট্যাক্সা নিরূপণ তথা শ্রেণীবিন্যাস সাদৃশ্য ও সম্পর্কের বা আত্মীয়তার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সম্পর্ক বা আত্মীয়তা বিভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন অর্থ বহন করে। আকারগত সাদৃশ্য, শাখাবিস্তার বিন্দু বা জাতিজনি ও কেন্দ্রাপসারিতার হারের বিচার বোঝাতে পারে। প্রজাতির নিকটতম আত্মীয় নিরূপণে প্রথমেই প্রয়োজন নিকটবর্তী প্রজাতিদের সঙ্গে চারিত্রিক সাদৃশ্যের মূল্যায়ন। ধরা যাক 'ক' প্রজাতি নিকটবর্তী 'খ' ও 'গ' প্রজাতির মধ্যে 1, 2, 3, 4 নং চরিত্রে 'খ' প্রজাতির সঙ্গে সদৃশ 5, 6, 7, 8 নং চরিত্রে 'গ' প্রজাতির সঙ্গে সদৃশ এবং 9, 10,

11, 12 নং চরিত্রে 'খ' ও 'গ'-এর সঙ্গে বিসদৃশ। এমতাবস্থায় আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নিরূপণে চরিত্রের মূল্যায়নই প্রধান বিষয়। অভিব্যক্তিবাদীরা শুধুমাত্র আকারগত চরিত্রকে ভিত্তি না করে চরিত্রকে উপাদান হিসেবে ধরে জিন সম্পর্কিত বিষয় এবং সাদৃশ্যের কারণগুলি খুঁজে সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

চারিত্রিক সাদৃশ্য সাধারণ পূর্বপুরুষ আবর্তিত হতে পারে। সাধারণ পূর্বপুরুষ জনিত জিনের অংশীদার হয়েও স্বাধীনভাবে চারিত্রিক সাদৃশ্য লাভ করতে পারে (সমান্তরাল অভিব্যক্তি)। কিংবা সাধারণ পূর্বপুরুষ উত্থিত জিনের অংশীদার না হয়েও পৃথকভাবে চারিত্রিক সাদৃশ্যের অধিকারী হতে পারে (অভিসারীতা প্রসূত)।

আকারগত সাদৃশ্যভিত্তিক গোষ্ঠী নিরূপণে প্রয়োগবাদকেই প্রধানত বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রোটিন কার্যক্রমের ধারায় ও ডি. এন. এ তুল্যতার পথে সাদৃশ্যের মূল্যায়নের ঝোঁক ইদানীংকালে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এ সব কোন পথই পুরোপুরি সঠিক মনে না হওয়ায় চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাদৃশ্যের পরিমাণগত মূল্যায়নের পথকে অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

সাদৃশ্যের পরিমাণগত মূল্যায়ন ইদানীং উন্নত পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। Startevant (1942) ড্রসফিলা জাতের মাছির 56টি প্রজাতির 33টি চরিত্র সারণি তৈরি করে দেখান—দুটি প্রজাতির মধ্যে চারিত্রিক মিলের সংখ্যা 0 থেকে 25-এর মধ্যে থাকে। এবং অতিরিক্ত 11টি চরিত্রের সারণির মাধ্যমে দেখান যে সব প্রজাতি প্রথম সারণিতে সাযুজ্য প্রকাশ করে দ্বিতীয় সারণিতেও তারা মিল প্রদর্শন করে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। সম্পর্ক নির্ধারণের বা পরিমাপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত Sokal ও Sneath (1963) এর তথ্য সারণি (Data matrix) উল্লেখ্য। এই সারণিতে তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী উল্লম্বভাবে এবং চরিত্র আনুভূমিকভাবে সাজানো হয়। চরিত্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি + (যোগ) ও – (বিয়োগ) চিহ্নে প্রকাশ করা যায় অথবা সংখ্যার মাধ্যমে চারিত্রিক অবস্থা প্রকাশ করা যায়। এই তালিকা চরিত্র যুগলের সম্পর্ক নির্ধারণে ব্যবহৃত হলে R-technique এবং গোষ্ঠী যুগলের সম্পর্ক নিরূপণে ব্যবহৃত হলে Q-technique বলা হয়। আকারগত চরিত্রভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা সব চরিত্রই সমান তথ্যবহ

এই সহজ ধারণার বশবর্তী হয়ে Q-technique বেশী ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা যে অবাস্তব সে কথা প্রায় সবাই বোঝেন। আরও একটু পরিবর্ধিত চেহারায় গোষ্ঠীর সাদৃশ্য নিরূপণে সাদৃশ্যে অনুষঙ্গ (Association), অনুবন্ধ (Correlation) ও দূরত্বের সহগের পর্যালোচনার কথাও ভাবা হয়েছে।

গোষ্ঠী নিরূপণে, বিশেষত উচ্চতর পর্যায়ের গোষ্ঠী নিরূপণে চরিত্রের সংখ্যা একটি আপেক্ষিক বিষয়। একটিমাত্র চরিত্রভিত্তিক সনাক্তকরণ পদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক চরিত্রভিত্তিক সনাক্তকরণ পদ্ধতি দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে একটিমাত্র চরিত্র ও সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। Kendrick, Weresup (1966) প্রমুখের মতে বহুসংখ্যক চরিত্র সহায়ক না হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ অধিকাংশ চরিত্রই গুরুত্বহীন এবং উপযুক্ত তথ্য পরিবেশনে অসমর্থ। চরিত্র ব্যবহারের লক্ষ্য হওয়া উচিত ত্রিমুখী গ্রাহ্য শ্রেণীবিভাগ মেনে নেবার উপযোগিতা, শ্রেণীবিভাগের উন্নতি বিধানের সম্ভাব্যতা এবং শ্রেণীবিভাগের উন্নতি বিধান করার উপযোগিতা।

সাদৃশ্যের মূল্যায়নে আত্মীয়তা বিষয়ক সিদ্ধান্ত

কেবলমাত্র আকারগত চরিত্র অথবা জাতিজনির শাখা বিস্তার বিন্দু ভিত্তিক কোন বলিষ্ঠ শ্রেণীবিভাগ না গড়ে উঠায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আত্মীয়তার নির্দেশ পাওয়া এবং শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠার পথেই এগোতে হয়েছে বা হচ্ছে। আত্মীয়তার মূল্যায়ন সঠিক হলে শ্রেণীবিভাগ হয় স্থায়ী এবং মূল্যায়নে দারিদ্র্য থাকলে শ্রেণীবিভাগ হয়ে উঠে বিতর্কিত বা ক্ষণস্থায়ী। সাদৃশ্য-মূল্যায়ন আত্মীয়তা এবং গোষ্ঠী নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ।

এরিস্টটল ও তাঁর অনুগামীরা পূর্বনির্ধারিত চরিত্র মূল্যায়নকেই (Apriori weghting) শ্রেণীবিন্যাসের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই পন্থার প্রধান অসুবিধা কোন একটি চরিত্র কোন একটি গোষ্ঠীর মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে (স্তন্যপায়ীর পক্ষে সাতটি গলার কশেরুকা) কিন্তু সেই একই চরিত্র অন্য গোষ্ঠীর পক্ষে অতি সামান্য গুরুত্ব বহন করতে পারে (পক্ষীর গলার কশেরুকার সংখ্যা)। Adanson ও সমকালীনরা পূর্বনির্ধারিত চরিত্র পদ্ধতির পরিবর্তে চরিত্র মূল্যায়নোত্তর (Postpriori) শ্রেণী-

বিভাগ পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষপাতী। এই পদ্ধতিতে কেউ কেউ ভুল করে থাকতে পারেন কিন্তু এ পথে উন্নতমানের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হয়েছে। ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সাদৃশ্যের সঠিক মূল্যায়নের পথে সম্পর্ক নিরূপণে সহায়ক হয়েছে। অভিব্যক্তিবাদে কোন্ চরিত্র অধিক অর্থবহ তার যুক্তি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছে। কারণ বিভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মৌলিক তথ্যের ইঙ্গিত বহন করে। এ দিক থেকে বলা যায় সাদৃশ্যের মূল্যায়ন জাতিজনি সংক্রান্ত তথ্য নিরূপণের উপায়। চরিত্রের পরিমাণগত পরিমাপের তুলনায় গুণগত দিকটাই অনেক সময় অধিক অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়। কর্ডাটার পক্ষে জীবনের কোন না কোন অবস্থায় নোটোকর্ডের উপস্থিতি যত প্রকার সম্ভব পরিমাণগত বা রাশিতাত্ত্বিক তথ্যের তুলনায় অনেক বেশী অর্থবহ। আকারগত চারিত্রিক মূল্যায়নে যে চরিত্রে যত বেশী জিনগত গঠনের প্রতিফলন থাকবে সেই চরিত্র তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ চরিত্রের গুরুত্ব নির্ধারণে চরিত্রটি অস্থায়ী, অভি-সারীতা, অভিযোজন ইত্যাদি জনিত বাহ্যিক প্রকৃতির কিনা সেটা ভাবা দরকার। শেষ সিদ্ধান্তে না পৌছতে পারলেও পূর্বনির্ধারিত চরিত্র মূল্যায়নের তুলনায় পরীক্ষা সাপেক্ষ চরিত্র মূল্যায়ন যে অধিক গ্রহণযোগ্য সে কথা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। নবতর কৃৎকৌশল সিদ্ধান্তে পৌছতে বেশ কিছুটা সহায়ক হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাস ও গোষ্ঠী নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—(1) আকার-গত জটিলতা। এই আকারগত জটিলতা থাকায় নিকটবর্তী প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (2) কৌলিক চরিত্রের তুলনায় উদ্ভূত চরিত্রের (Derived character) অংশীদারের ভিত্তিতেই গোষ্ঠী নিরূপণ বাঞ্ছনীয়। কৌলিক চরিত্র পূর্বপুরুষের চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু অভিব্যক্তির ধারায় উদ্ভূত চরিত্র নৈকট্য প্রকাশ করে। (3) স্থিতিশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র অস্থিতিশীল এবং অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্রের তুলতায় গুরুত্বপূর্ণ। (4) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত চরিত্রগুচ্ছ শ্রেণীবিন্যাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। (5) পরিবেশগত স্থান পরিবর্তনে যে সব চরিত্র নিম্নতর স্তরের শ্রেণীতে অপরিবর্তিত থাকে তাদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রজাতি সংক্রান্ত প্রত্যয়াবলী, বিবিধ প্রজাতি ও প্রাণিপ্রজন

মানুষের সহজাত প্রবণতা পরিবেশের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটায়। এরই ফলে চারপাশের বস্তু অর্থাৎ জীব ও জড়ের সনাক্তকরণ ও নামকরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। জীবের সনাক্তকরণ ও নামকরণ শুরু হয়েছে সভ্যতার গোড়ার দিক থেকেই। জীবজগতের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ ধারাবাহিক না হয়ে কিছু কিছু বিচ্ছেদ বা বিরতিপূর্ণভাবে আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। এই বিচ্ছেদ থাকার ফলেই প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার বা রকমে (Kinds) বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণীদের প্রকার নির্ধারণে একাধিক বা অনেক-গুলো প্রাণীকে একই প্রকারভুক্ত করা যায় এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার বা দলভুক্ত করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার-গুলিই শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর প্রজাতি।

প্রজাতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে যে এর ফলে শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক শিক্ষার্থীকে প্রথমেই কিছুটা সংশয়ের মধ্যে পড়তে হয়। প্রজাতি সম্পর্কে বিতর্কের অবসান ঘটেছে এমন কথাও বলা যায় না। তবে কিছু কিছু ভিন্নমত থাকলেও সম্প্রতি প্রজাতি সম্পর্কে অনেকটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। বিষয়টির বিশদ আলোচনা করেছেন Mayr (1957a, 1960), Simpson (1961), Heslop-Herrison (1963), Love (1964), Hanson (1981), White (1983) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

প্রজাতি সম্পর্কে ধারণা পেতে অস্পষ্টতার সম্মুখীন হতে হয় প্রধানত জীবগোষ্ঠী (Taxon), রূপগোষ্ঠী (Phenon) বা বিভাগ (Category) সম্পর্কে ধারণার অস্বচ্ছতা হেতু। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী প্রাণীকে প্রথমত চরিত্রভিত্তিক সনাক্তকরণের মাধ্যমে গোষ্ঠীভুক্ত করেন এবং এর পরই প্রয়োজন বোধ করেন এই গোষ্ঠী প্রজাতি পর্যায়ের কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার। রূপগোষ্ঠী অনেক সময় প্রজাতির সঙ্গে মিলে যায় কখনও কখনও পৃথকও হয়।

প্রজাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের

উপস্থাপনা করেছেন। এই সব বক্তব্যকে প্রধানত তিনটি ধারায় বা প্রত্যয়ে আলোচনা করা হত—(1) প্রকার বা জাতিভিত্তিক প্রজাতি প্রত্যয়, (2) নামিক বা নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয় ও (3) জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়। Grant (1971) এই তিনটি প্রজাতি প্রত্যয়ের সঙ্গে (4) বিবর্তনবাদী প্রজাতি প্রত্যয়টির সংযোজন করেছেন।

(1) **প্রকার বা জাতিভিত্তিক প্রজাতি প্রত্যয়** (Typological species concept) :

প্রজাতি প্রত্যয়ের এই ধারার মূল খুঁজে পাওয়া যায় দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলের চিন্তায় এবং লিনিয়াস ও তাঁর অনুবর্তীদের প্রজাতি ধারণায় (Cain, 1958)। এই দার্শনিক চিন্তাধারাকে কোন কোন সময় নির্যাসবাদীদের প্রজাতি সংজ্ঞা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। গাণিতিক বা সাংখ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রজাতির যে সব সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা হয়েছে সেগুলিও এই ধারারই সমতুল্য। এই প্রত্যয়ের মূল উপাদান—(i) জীবজগতের বৈচিত্র্য সীমিত সংখ্যক অন্তর্নিহিত কিছু বিশ্বজনীন (Universal) রূপ বা প্রকারেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। (ii) প্রাণীদের মধ্যে বৈষম্য বস্তুত প্রজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শ বা ভাবের অসম্পূর্ণ প্রকাশ সূচনা করে এবং দু'টি স্বতন্ত্র প্রাণী বা দলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আকারগত পার্থক্য থাকলে তাঁরা পৃথক প্রজাতি রূপে পরিগণিত হয়। উল্লেখ্য, গঠনগত বৈশিষ্ট্যভিত্তিক প্রজাতি ধারণা এবং গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে জৈবিক প্রজাতি ধারণায় রূপায়িত করার সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রকারভিত্তিক প্রজাতি প্রত্যয় বিশ্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য না হবার প্রধান অন্তরায় দু'টি : (i) যৌন দ্বি-রূপতা, বয়স বা দশাজনিত পার্থক্য, বহু-রূপতা প্রভৃতির জন্য আকারগত পার্থক্য বেশী হলেও তাদের পৃথক প্রজাতিভুক্ত করা যায় না। (ii) অনুরূপ বা কাছাকাছি আকারের ভিন্ন প্রজাতিকে অর্থাৎ সমাকৃতি (Sibling) প্রজাতি সমূহকে এক প্রজাতিভুক্ত করা যুক্তিহীন। কারণ তারা পৃথক প্রজাতি হিসেবে গণ্য হবার গুণাগুণযুক্ত।

শুধুমাত্র আকারগত চরিত্রভিত্তিক প্রজাতি নির্ধারণ অধিকাংশ সময়ে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও সে সব প্রাণীদের একই প্রজাতিভুক্ত করা যায় না। আবার আকারগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রাণীদের একই প্রজাতিভুক্ত করা হয়। এই প্রজাতি

প্রত্যয়ে আকারগত চরিত্রের একমাত্র প্রাধান্যের কারণে একে অনেকে অঙ্গসংস্থানিক প্রজাতি প্রত্যয় (Morphological species concept) নামেও অভিহিত করেন।

2. নামিক বা নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয় (Nominalistic species concept) ঃ

নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয়ীরা প্রকৃতিতে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র জীবের উপস্থিতি স্বীকার করেন। প্রকৃতিতে কোন জাতিরূপ বা প্রকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এঁদের মতে প্রজাতি মূলত মানুষের সৃষ্ট ধারণা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধারণা ফরাসীদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। **Buffon, Robinet, Lamarck** প্রমুখের লেখায় এই ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। Occam ও তাঁর সমর্থকরা প্রকার বা জাতিরূপ অথবা প্রজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। Bessey (1908) নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয়ের ব্যখ্যা দিয়ে বলেছেন, প্রকৃতি কেবলমাত্র স্বতন্ত্র জীবের সৃষ্টি করেছে—প্রকৃতিতে প্রজাতির কোন অস্তিত্ব নেই। প্রজাতি কেবলমাত্র মানুষের সৃষ্টি ধারণা। প্রজাতি শব্দের আবিষ্কার করা হয়েছে অনেকগুলো জীবকে একসঙ্গে উল্লেখ করার পদ্ধতি হিসেবে।

যে কোন প্রকৃতি বিজ্ঞানীরই জানা, প্রজাতি জীবজগতে একটি বাস্তব সত্ত্বা, যার সমতুল্য কোন বিষয় অজৈব বস্তুর ক্ষেত্রে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। প্রজাতিকে কিন্তু প্লেটো বা এরিস্টটলের প্রকার (Kind) সমতুল্য বা সমগোত্রের ভাবা ঠিক নয়। নামবাদীদের একটি মৌলিক ভুল ধারণা সাযুজ্য ও আত্মীয়তার পার্থক্য সম্পর্কে। কোন প্রজাতির প্রাণীরা একই রকম কারণ তাঁরা একই বংশধারা-উদ্ভুত। কিন্তু যেহেতু তারা একই রকম তাই একই গোষ্ঠীভুক্ত এমন নয়। জাতিজনি ও অভিব্যক্তির ধারণার নিরিখে যে কোন শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীকে নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয়কে অস্বীকার করতে হয়।

3. জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় (Biological species concept) ঃ

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের মনে প্রকারভিত্তিক বা নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয় সম্পর্কে সংশয় দেখা দিতে থাকে। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে প্রজাতি সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনার আবির্ভাব ঘটে। ফলে উনবিংশ শতকের শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা প্রজাতির নতুন ধারণা অর্থাৎ জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট রূপ দিতে সক্ষম হন। অবশ্যই পূর্বতন প্রত্যয়গুলির মধ্যেও

এই নতুন প্রত্যয়ের কিছু কিছু উপাদান পাওয়া সম্ভব।

জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের পথপ্রদর্শকদের মধ্যে **Merrem, Voigt, Walsh, Jordan** প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। **Buffon**-এর বক্তব্যেও জৈবিক প্রজাতি ধারণার কিছু উপাদান পাওয়া যায়। **Jordan**-এর ভাষায় প্রজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং প্রজাতির নমুনা স্বতন্ত্র জীবের প্রজন পরিসংখ্যান দ্বারা নির্ধারিত হয়। পূর্ববর্তী প্রত্যয় দু'টির সঙ্গে জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের পার্থক্য প্রধানত দুটি দিকে। প্রথমত এই প্রত্যয়ে প্রজন ও তার পরিসংখ্যান এবং জিন ভাণ্ডারের (**Gene pool**) দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। দ্বিতীয়ত এই প্রত্যয়ে জিন ভাণ্ডারের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংবাদ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। এইসব দিকগুলো বিচার করে জৈবিক প্রজাতিকে সুনির্দিষ্ট করা যায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের অবয়বে।

প্রজাতি (1) একটি জনন গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে জনন সূত্রে জোড় বাঁধতে সক্ষম কিন্তু অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে জনন সূত্রে বিচ্ছিন্ন। (2) একটি পরিবেশগত বা বাস্তব্য একক (**Ecological unit**) যে একক একই পরিবেশের অংশীদারী অন্যান্য সমপর্যায়ের গোষ্ঠী বা প্রজাতির সঙ্গে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কের নির্দেশ করে এবং (3) একটি জিনগত (**Genetic**) একক, যে এককের অনেকগুলি আদানপ্রদানযোগ্য জিন-ভাণ্ডার (**Gene pool**) থাকে, সেখানে স্বতন্ত্র প্রাণী এই জিনভাণ্ডারের সামান্যতম অংশ ক্ষণকালের মত প্রকাশ করে। **Mayr (1963)**-এর মতে এই তিনটি কারণেই জৈবিক প্রজাতি ধারণা পূর্ববর্তী জাতিভিত্তিক বা নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয়ের ঊর্ধ্বে স্থান করে নিতে সক্ষম, কারণ এই তিনটি বিষয়ের অভাবেই জাতিভিত্তিক প্রজাতি প্রত্যয় জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করতে অসমর্থ।

জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় অনুসারে প্রজাতির সংজ্ঞা হতে পারে—প্রজাতি একটি প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী যার অন্তর্ভুক্ত জীবরা নিজেদের মধ্যে জননসূত্রে জোড় বাঁধতে ও জননক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম কিন্তু অনুরূপ বা সমপর্যায়ের অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকে জননসূত্রে বিচ্ছিন্ন। এই প্রত্যয় অনুযায়ী প্রজাতির আরও সংজ্ঞা যোগ করা চলে: প্রজাতি একটি সংরক্ষিত জিনভাণ্ডার বা মেণ্ডেলীয় প্রজন, যাদের নিজেদের মধ্যে এমন গঠন বা ব্যবস্থা বর্তমান যার ফলে অন্যান্য জিনভাণ্ডার থেকে জিনের (ক্ষতিকারক) প্রবেশ থেকে মুক্ত

থাকতে পারে ; অর্থাৎ, এক বা একাধিক মেণ্ডেলীয় গোষ্ঠী যাদের জিনের আদানপ্রদান নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জননবিচ্ছেদ দ্বারা যারা অন্য প্রজাতির সঙ্গে জিনের আদানপ্রদানে অক্ষম। এই বক্তব্যের প্রবক্তাদের মধ্যে Dobzhansky, Ayala, Stebbins, Valentine (1977) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। একই জিনভাণ্ডারের জিনগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনে এগুলো অভিযোজিত বলে ধরা হয়। দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জিনের সংমিশ্রণ ঘটার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় যার ফলে এ ধরনের মিলন সাধারণত ঘটে না। ঘটলেও প্রকৃতি সাধারণত এ ধরনের মিলনকে নির্বাচন করে না।

প্রজাতি একটি আপেক্ষিক শব্দ। কোন প্রজাতির ধারণা সুস্পষ্ট হয় কাছাকাছি চরিত্রের এবং একই অঞ্চলের অধিবাসী অন্য এক বা একাধিক প্রজাতির পরিপ্রেক্ষিতে।

জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়কে Simpson ('61) জৈবিক প্রজাতি বলতে কিছুটা দ্বিধান্বিত, যদিও তিনি স্বীকার করেন যে জৈবিক প্রজাতি সংজ্ঞা শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী ক্ষেত্রে কার্যকরী। তিনি একে 'জিনগত' (Genetical) প্রজাতি প্রত্যয় বলতেই অধিক পছন্দ করেন। সিম্পসন মনে করেন জৈবিক গুণাবলীনির্ভর প্রজাতি নির্ধারণ আগেও হয়েছে এবং এটি জাতিভিত্তিক প্রজাতি প্রত্যয়ের পুনরুদ্ধারেরই সামিল। মায়ার কিন্তু সিম্প-সনের এই বক্তব্য অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি মনে করেন Devries, Lotsy, Shull, Bateson প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ব্যতিরেকেই জিনগত প্রজাতি সংজ্ঞা ভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন।

জৈবিক প্রজাতি সংজ্ঞা প্রকৃতি বিজ্ঞানীর প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা এবং অভিব্যক্তিবাদীদের প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা এই দুই আপাতবিরোধী ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ। এই আপাত বিরোধ লিনিয়াসের প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা ও ডারুইনের অভিব্যক্তিমূলক বাস্তব প্রজাতি চিন্তার মধ্যে সুস্পষ্ট।

4. **বিবর্তনবাদী প্রজাতি প্রত্যয়** (Evolutionary species concept) :

যৌন জনন যুক্ত প্রণীদের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় প্রযোজ্য হলেও Grant ('71)-এর মতে একজনিক প্রাণীদের পক্ষে জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় প্রযোজ্য নয়। বিবর্তনবাদী বা অভিব্যক্তিবাদী প্রজাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

একটি বংশানুক্রমিকতা (প্রজনের পূর্বপুরুষ-উত্তরপুরুষের অনুক্রমিতা) রূপে। প্রজাতি নিজস্ব ঐকিক অভিব্যক্তির ভূমিকা এবং ঝোঁক সহকারে অন্যদের মধ্য থেকে পৃথকভাবে বিবর্তনের পথে উদ্ভূত হয়। গ্রান্টের অভিব্যক্তিবাদী প্রজাতি প্রত্যয়ও এই বক্তব্যকে ভিত্তি করেই। এটি কেবলমাত্র একজনিক প্রজনের ক্ষেত্রেই নয় জীবাশ্ম বংশধারায়ও প্রযোজ্য। Wiley (1978) অভিব্যক্তিবাদী প্রত্যয়কে পুন'মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে—একটি প্রজাতি জীবের পূর্বপুরুষ-উত্তরপুরুষের বংশানুক্রমিতা, যা এর নিজস্ব বিবর্তনমূলক ঝোঁক ও ঐতিহাসিক ভবিষ্যত রক্ষা করে।

এই চারটি প্রজাতি প্রত্যয়ের কোনটিই অন্য যে কোনটি থেকে পুরোপুরি সম্পর্কবিহীন নয় এবং কোনটিই পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ নয়। প্রকারভিত্তিক ও নামবাদী প্রজাতি প্রত্যয়ের দুর্বলতা আগেই বলা হয়েছে। অভিব্যক্তিবাদী প্রজাতি প্রত্যয়েরও বেশ কিছুটা দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। এই মতবাদ সম্ভবত অন্যান্য এক প্রজাতি বোধক প্রাণিপ্রজনের আন্তঃপ্রজনন, অথবা অসম প্রজাতিক (Hetero-specific) আন্তঃবন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে কোন সঠিক নির্দেশ দিতে পারে না। এছাড়াও একজনিক প্রাণীর সংখ্যা বা অনুপাত, যাদের জৈবিক প্রজাতি সংজ্ঞায় ফেলা যায় না সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট এবং এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে অভিব্যক্তির ভূমিকা ও জৈবিক প্রজাতি একই রেখায় চলতে পারে।

প্রজাতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্যয় উল্লেখ থাকলেও যেহেতু কোন প্রত্যয়কে পুরোপুরিভাবে সন্তোষজনক বলা যাচ্ছে না এবং একটি গ্রহণ করলেও অন্যটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও সহজ নয় সেই দিক থেকে বলতেই হয় প্রজাতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি। Emerson (1941) জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় এবং অভিব্যক্তিবাদী প্রজাতি প্রত্যয়কে মিলিয়ে প্রজাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন—খাঁটি প্রজাতি অভিব্যক্তির ধারায় উদ্ভূত, জননসূত্রে অন্তরিত (বিচ্ছিন্ন) এবং জিনগতভাবে সুনির্দিষ্ট একটি প্রাকৃতিক প্রজনমাত্র।

জীববিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখায় নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। জীব-রসায়ন প্রজাতি সম্পর্কে নতুন খবর যোগাচ্ছে যা যোগাবে বলে আশা করা যায়। Florkin ('64) উৎসাহী হয়ে প্রজাতির জীব-রাসায়নিক সংজ্ঞা দিয়েছেন—প্রজাতি হচ্ছে এমন সব জীবের সমষ্টি যাদের ডি. এন. এ বৃহৎ অণুতে অনুরূপ সংযোগযুক্ত পিউরিণ ও পাইরে-

মিডাইন ক্রমের স্থিতি রয়েছে এবং এসবের পরিচালন ও অবদমন ঘটে এমন পদ্ধতিতে যাতে একপ্রজাতিভুক্ত প্রাণীতে সর্বদা অনুরূপ এমাইনো এসিড ক্রমেরই জৈবিক সংশ্লেষ সম্ভব হয়।

শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন পর্যায় এবং গোষ্ঠীর মধ্যে প্রজাতির স্থান অনন্য কারণ কেবলমাত্র প্রজাতিকেই কার্যক্রমের পথে প্রত্যয়িত বা পরীক্ষিত করা সম্ভব। জননসূত্রে মিলিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা অন্য কোন পর্যায়ের গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন সীমারেখা সুনির্দিষ্ট নয়। ফলে প্রজাতিকেই শ্রেণীবিন্যাসের একক বা নির্দিষ্ট মান বা পর্যায় হিসেবে ধরে প্রজাতির চাইতে উচ্চতর স্তর বা পর্যায় (যথা গণ, বর্গ, শ্রেণী ইত্যাদি) এবং প্রজাতির চাইতে নিম্নতর স্তর (যথা উপ-প্রজাতি) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

একথা বর্তমান অবস্থায় বলা সম্ভবত অসঙ্গত নয় যে প্রজাতি সম্পর্কে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় প্রকৃতি বিজ্ঞানীর প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা এবং অভিব্যক্তিবাদীদের নতুন প্রজাতির আবির্ভাবের গ্রহণযোগ্য নমনীয়তার সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম বলেই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য প্রত্যয় মনে করা হয়।

জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের ব্যবহারিক অসুবিধা ও বিবিধ প্রজাতি :

জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই অসুবিধাগুলোকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে উল্লেখ করা যায়।

1. **তথ্যের অপ্রতুলতা :** প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক আকারগত বৈশাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের পৃথক প্রজাতিভুক্ত করা যায় কিনা এ বিষয়ে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর মনে সংশয় দেখা দিতে পারে। এই সংশয়ের অনেকটা নিরসন হতে পারে লিঙ্গ, বয়স, জীবনবৃত্তের দশা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। জীব প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ বা কেবলমাত্র সংগ্রহশালার রক্ষিত প্রাণীদের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হলে জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় আপাতভাবে অব্যবহার্য মনে হতে পারে, কারণ এসব ক্ষেত্রে জনন অন্তরন (বিচ্ছেদ) লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিতে হয় কতগুলি জৈবিক তথ্য ও ধারণার ভিত্তিতে। যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হলে অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত হয়।

2. **এক জনিক জনন** (Uniparental reproduction) : বেশ কিছু প্রাণিগোষ্ঠীতে এক জনিক জনন দেখা যায় এবং এসব ক্ষেত্রে দ্বিজনিক জননের ন্যায় জিনের আদান-প্রদান বা মিলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। এক জনিক জনন স্বনিষেক, অপুংজনি (Parthenogenesis), অঙ্গজজনন ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। এ সমস্যা সমাধানে **অযোনি প্রজাতি** (Agamospecies) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সমস্যার পুরোপুরি সমাধান অবশ্য হয়নি। অভিব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে আকারগত সুস্পষ্ট বিভেদ শ্রেণীবিন্যাসের উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং সৌভাগ্যক্রমে এক জনিক প্রাণীদের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

3. **অভিব্যক্তির মধ্যবর্তীরা** (Evolutionary intermediates) : কোন স্থানীয় প্রজনের পর্যালোচনায় প্রজাতির সীমারেখা সুস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রজাতির জনন বিচ্ছেদ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কাল ও স্থানের পরিধি প্রসারিত করলে কিছু কিছু প্রাণীর সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা থাকে যাদের নতুন প্রজাতিভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই সব প্রাণীদের মধ্যে কিছু কিছু নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটলেও মূল প্রজাতির চরিত্র অনেকটাই থেকে যায়। অর্থাৎ মূল প্রজাতি থেকে অনেকটা সরে এলেও এরা নতুন বা পৃথক প্রজাতি হিসেবে গণ্য হবার পরিপূর্ণতা অনেক সময়ই লাভ করে না। এখানে উল্লেখ্য আকারগত পরিবর্তনের সঙ্গে জনন অন্তরণ সব সময় একই সঙ্গে চলে না। জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রজাতির রকম-ফের সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হোল :

সিবলিং বা সমাকৃতি প্রজাতি (Sibling species including cryptic species) : প্রকৃতিতে এমন কিছু প্রাণিদল দেখা যায় যাদের দুই বা তার বেশি দলের মধ্যে আকারগত পার্থক্য খুবই নগণ্য বা নেই। কিন্তু তারা জনন সূত্রে সম্পূর্ণ অন্তরিত থাকে। এই ধরনের অনুরূপ বা খুব কাছাকাছি আকারযুক্ত প্রাণিগোষ্ঠীকে সমাকৃতি প্রজাতি বলা হয়।

Steyskal (1972) এই শব্দটিকে ব্যবহার না করে প্রজাতি-পার্থক্য যে ক্ষেত্রে আপাতদৃশ্য নয় সেখানে **এ্যাফানিক প্রজাতি** (Aphanic species) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। Mc Cafferty ও Chandler (1974) Steyskal এর সঙ্গে একমত হয়েও আকারগত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর নয় এমন সব প্রাণি-

প্রজাতিকে **সিম্মর্ফিক** (Symmorphic) এবং সুস্পষ্ট পার্থক্যযুক্ত প্রাণি-প্রজাতিকে **এ্যালোমর্ফিক** (Allomorphic) নামে অভিহিত করেছেন। তবে সিবলিং বা সমাকৃতি প্রজাতি নামটিই সর্বাধিক প্রচলিত।

অভিন্নক্ষেত্রিক বা সমক্ষেত্রিক প্রজাতি (Sympatric species) ঃ একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তৃত অথবা অধিকান্ত বিস্তারণযুক্ত (Overlapping distribution) একাধিক নিকটাত্মীয় প্রজাতিদের অভিন্নক্ষেত্রিক প্রজাতি বলা হয়।

কোন কোন সময় অভিন্নক্ষেত্রিক দুটি প্রজাতি নিজেদের বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে বজায় রাখলেও তাদের মধ্যে জনন অন্তরণ কোথাও কোথাও লোপ পেতে পারে। এরূপ অবলুপ্তির ফলে, প্রজাতি-জুটির মধ্যে মিলন ঘটায় সংকরের আবির্ভাব ঘটতে পারে। একে অভিন্নক্ষেত্রিক সংকরায়ন (Sympatric hybridization) বলা হয়। জনিত্র প্রজাতি দুটি নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে চলতে থাকলে সংকর প্রাণীদের পৃথক প্রজাতিভুক্তির কথা ভাবা হয় না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মেক্সিকোর *Pipilo erythrophthalmus* এবং *P. ocai*। এরা কখনও কখনও সংকর সৃষ্টি করলেও তাদের প্রজাতি পর্যায় দেওয়া হয়নি। তবে জনন অন্তরণ লোপ পেলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হতে পারে।

ভিন্নক্ষেত্রিক প্রজাতি (Allopatric species) ঃ দুই বা ততোধিক নিকটাত্মীয় প্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তৃত থাকলে তাদের ভিন্নক্ষেত্রিক প্রজাতি বলা হয়।

Rivas (1964) অভিন্নক্ষেত্রিক ও ভিন্নক্ষেত্রিক শব্দ দুটিকে সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে Syntopic ও Allotopic শব্দ দুটির ব্যবহার করেছেন।

সিনটপিক প্রজাতিরা যেহেতু একই বৃহৎ বসতির (Macrohabitat) অধিবাসী তাদের মধ্যে যৌন মিলনের সম্ভাবনা অবাস্তব নয়। **এলোটপিক** প্রজাতিরা ভিন্ন বৃহৎ বসতির অধিবাসী; তাদের মধ্যে যৌন মিলনের সম্ভাবনা খুবই কম। দুটি সংশ্লিষ্ট শব্দ **অভিন্নকালিক** (Synchronic) ও **ভিন্নকালিক** (Allochronic) সময়ের বিস্তার বোঝাবার উদ্দেশ্যে শ্রেণী-বিন্যাস বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন।

অযোনি প্রজাতি (Agamospecies) ঃ যে সব প্রাণিপ্রজাতি এক-

জনিক-জনন-সম্ভূত অর্থাৎ অপুংজনি, অঙ্গজ জনন প্রভৃতি উপায়ে বংশ বৃদ্ধি করে তাদের অযোনি প্রজাতি নামে চিহ্নিত করার প্রচলন দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের আক্ষরিক প্রয়োগ সম্ভব নয়।

অঙ্গসংস্থান-ভৌগোলিক প্রজাতি (Morpho-geographical species) ঃ লিনিয়াসের সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অঙ্গসংস্থান ও ভৌগোলিক তথ্যের বা চরিত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত প্রজাতিরা এই পর্যায়ের (এরা শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের বুনিয়াদ হিসাবে পরিগণিত)।

প্যানমিকটিক্ প্রজাতি (Panmictic species) ঃ যে সব প্রজাতির প্রতিটি লিঙ্গের অপত্য পৃথক প্রাণীদ্বারা (এক লিঙ্গধর) অক্রম মিলনের ফলে সৃষ্ট কিংবা যে সব প্রজাতির দুটি লিঙ্গেরই অপত্য সৃষ্টি একই প্রাণী থেকে হলেও কিছু কিছু অপত্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে পরনিষেক পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয় (যেমন কেঁচো জাতের প্রাণীরা) তাদের প্যান্‌মিকটিক্ প্রজাতি বলা যায়।

এপোমিকটিক প্রজাতি (Apomictic species) ঃ যে সব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে জননকোষের আদানপ্রদান হয় না, প্রায়শঃই কেবল ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় কিংবা কোরক সৃষ্টি বা বিভাজন পদ্ধতির অযোনি জনন প্রথায় বংশ বৃদ্ধি ঘটে এবং জীবনচক্রের কোন না কোন দশায় কার্যকরী যৌন দশা থাকে না তাদের এপোমিকটিক প্রজাতি বলা হয়।

সমকালীন প্রজাতি (Contemporaneous species) ঃ যে সব প্রাণী প্রজাতি একই সময়ে বর্তমান থাকে তাদের সমকালীন প্রজাতি বলা যায়। এই প্রজাতিরা কোন এক সময়ের জাতিজনি রেখার সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে।

অশ্মী প্রজাতি (Palaeontological species) ঃ অশ্মীভূত প্রজাতি।

অপ্রসারী প্রজাতি (Philopatric species) ঃ যে সব প্রজাতির মধ্যে প্রসারের কোন লক্ষণ দেখা যায় না তাদের অপ্রসারী প্রজাতি বলা হয়।

পরিবর্তমান প্রজাতি (Transient species) ঃ যে সব প্রজাতি কোন সময়ে উপস্থিত বিবর্তিত প্রজাতির বিভিন্ন ধারার প্রতিভূ হিসেবে প্রতি-ফলিত হয় তাদের পরিবর্তমান প্রজাতি বলা হয়।

প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি (Parapatric species) ঃ দুটি সংলগ্ন ক্ষেত্রের

প্রজনের মধ্যে জনন অন্তরণ রক্ষিত থাকলে প্রজন ছুটি প্রজাতি পর্যায় লাভ করেছে মনে করা যায় এবং যথার্থ প্রজাতিরূপে গণ্য হতে পারে। সংলগ্ন অঞ্চলের প্রজনের অধিক্রমণ না হবার কারণ প্রধানত সংযোগস্থলের ছুদিকের পৃথক বাস্তব্য স্তরের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অথবা অনুরূপ বাস্তব্য প্রয়োজন জনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সংযোগস্থলের জনন অন্তরণ প্রাপ্ত প্রজনকে প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি নামে অভিহিত করা হয়।

White (1957) অবশ্য দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার Moraba Viatica ঘাসফড়িং-এর পূর্বাঞ্চলের 17-ক্রোমজম বিশিষ্ট এবং পশ্চিমাঞ্চলের 19-ক্রোমজম বিশিষ্টদের মধ্যে যৌন মিলন সহজে ঘটা এবং সংকরদের অপত্য সৃষ্টির হারের হ্রাসের বিষয় একটু ভিন্ন ধরনের প্যারাপ্যাট্রিক বিস্তারের উল্লেখ করেন।

মহাদেশীয় প্রজাতি (Continental species): যে সব প্রজাতি বিরাট ভূখণ্ডে বিস্তৃত তারা সাধারণত মহাদেশীয় প্রজাতি নামে চিহ্নিত।

অন্তরীণ প্রজাতি (Insular species): যে সব প্রজাতি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সীমাবদ্ধ তাদের অন্তরীণ প্রজাতি বলা হয়। এই ধরনের প্রাণিকূলের বিস্তৃতি ভূখণ্ডীয় প্রব্রজনের পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্যভাবে ঘটে।

বিশ্বজনীন প্রজাতি (Cosmopolitan species): যে সব প্রজাতি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তৃত তাদের বিশ্বজনীন প্রজাতি বলা হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রজাতি (Tropicopolitan/Pantropical species): যে সব প্রজাতি গ্রীষ্মমণ্ডলে বিস্তৃত থাকে তাদের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রজাতি বলা হয়। তবে এ নামটি সম্পর্কে অস্পষ্টতা দেখা যায়।

পার্বত্য প্রজাতি (Montane species): যে সব প্রজাতি কেবলমাত্র পর্বতের উচ্চে বা শীর্ষ দেশে বিস্তৃত থাকে তাদের পার্বত্য প্রজাতি বলে।

পর্যায়ক্রমিক প্রজাতি (Successional species or Palae species): কাল পর্যায়ের একটি বিবর্তনের ধারার প্রজাতি। এদের মধ্যে খুব মসৃণভাবে পর্যায় লক্ষ্য করা যায়।

উপক্রান্ত প্রজাতি (Incipient species): যে সব উপ-প্রজাতি বা দল অন্তরিত অবস্থায় থাকার ফলে সুস্পষ্ট প্রজাতি পর্যায় বা স্তর লাভ করতে সক্ষম হয় তাদের উপক্রান্ত প্রজাতি বলা হয়।

অঙ্গসংস্থানিক প্রজাতি (Morphospecies): অন্য সব দিকের

বিচার না করেই কেবলমাত্র অঙ্গসংস্থানিক মিলের ভিত্তিতে স্থাপিত প্রজাতিকে অঙ্গসংস্থানিক প্রজাতি বলা হয়। জনন অন্তরণ ব্যতিরেকেই এ সব ক্ষেত্রে আকারগত পার্থক্য দেখা যায়।

গঠন প্রজাতি (Form species) ঃ যে সব জীবাশ্মপুঞ্জকে বা জীবাশ্মের অংশপুঞ্জকে জৈবিক প্রজাতির ন্যায় কোন প্রজাতিভুক্ত করা সম্ভব হয় না তাদের গঠন প্রজাতি নামে চিহ্নিত করা হয়।

প্রজাতিপোম (Paraspecies) ঃ কোন কোন সময় প্রাণীর অঙ্গ বা অংশকেই প্রজাতি ও গণভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই অংশ প্রজাতিপোম উপাদানগুলি একাধিক প্রজাতিভুক্ত হতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এই প্রজাতিপোমরা প্রজাতি পর্যায়ের অর্ধগোষ্ঠী, অবশ্য প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসে অর্ধগোষ্ঠীর বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই।

অর্ধ-প্রজাতি (Semi species) ঃ ভৌগোলিক বিস্তারের চক্রাকার অধিক্রমণ ও প্রান্তিক সীমায় কিছু কিছু প্রাণী দেখা যায় যাদের কোন কোন দিক থেকে পৃথক প্রজাতিভুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করা যায়। কিন্তু অন্য কিছু দিক থেকে এ প্রয়োজন বোধ হয় না। এদের অর্ধ-প্রজাতি বলা যায়। তবে এদের যে প্রজাতির সঙ্গে সর্বাধিক মিল থাকে সেই প্রজাতিভুক্ত করাই বিধেয়।

একজাতিরূপী প্রজাতি বা অমাত্রিক প্রজাতি (Monotypic species or Non-dimensional species) ঃ স্থান ও কালের মাত্রাহীন প্রজাতিকে অমাত্রিক প্রজাতিরূপে ধরা হয়। এদের কোন উপ-প্রজাতি নেই। Sneath একজাতিরূপীর বদলে **এক চারিত্রিক** (Monothetic) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

বহুজাতিরূপী প্রজাতি বা বহুমাত্রিক প্রজাতি (Polytypic species or Multidimensional species) ঃ ভিন্নকালিক (Allochronic) ও ভিন্নক্ষেত্রিক (Allopatric) অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে যৌন মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের মিলনের ফলে যে প্রজাতি পাওয়া সম্ভব হয় তাদের উপ-প্রজাতি থাকে। এ ধরনের প্রজাতিকে বহুজাতিরূপী প্রজাতি বা বহু-মাত্রিক প্রজাতি বলে। Sneath (1962) বহুজাতিরূপীর (Polytypic) বদলে **বহুচারিত্রিক** (Polythetic) নামটি ব্যবহার করেছেন। কিছু কিছু প্রজাতি

পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিস্তৃত থাকার ফলে তাদের মধ্যে কিছু কিছু স্থানীয় প্রজন গড়ে উঠে এবং এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে চারিত্রিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই চারিত্রিক বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকার ফলে তাদের পৃথক পৃথক উপ-প্রজাতিভুক্ত করা হয়ে থাকে। যে সব প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত প্রাণীরা একাধিক উপ-প্রজাতিভুক্ত হয় সেই সব প্রজাতিকে বহুজাতিরূপী প্রজাতি বলা হয়।

কিছু কিছু সুপরিচিত প্রাণিগোষ্ঠী যেমন পক্ষী, স্তন্যপায়ী, সম্বুক ইত্যাদির শ্রেণীবিন্যাসের মান উন্নয়ন ও সরলীকরণে উপ-প্রজাতি ব্যবহারের গুরুত্ব যথেষ্ট অনুভূত হয়েছে। মনে করা হয় পক্ষীদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বর্তমানে অনেকটা সম্পূর্ণ। 1910 খ্রীষ্টাব্দে পক্ষীদের 19,000টি প্রজাতি নথিভুক্ত ছিল। এর পরেও বেশ কিছু সংখ্যক প্রজাতি এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এদের সবাইকেই একজাতিরূপী অর্থাৎ উপ-প্রজাতি বিহীন প্রজাতিরূপে গণ্য করা হত। কিন্তু পরে উপ-প্রজাতির ব্যবহার এবং বহুজাতিরূপী প্রজাতি পদ্ধতির প্রচলন হেতু পক্ষী প্রজাতির সংখ্যা 1910 খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 19,000 বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় 8,600। অন্যান্য প্রাণিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে।

প্রজাতি নিম্নতর পর্যায় (Infra specific categoeies) ঃ প্রজাতি নিম্নতর পর্যায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের যথাযোগ্য গ্রাহ্য স্তর না হলেও শ্রেণীবিন্যাসে, বিশেষত জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এদের গুরুত্ব খুব নগণ্য বলা যায় না। Linnaeus ও Fabricius প্রজাতি নিম্নতর বিভাগকে রকম (Varieties) নামে অভিহিত করেছেন। Kant (1775) প্রথম প্রজাতি, উপ-প্রজাতি ও রকম প্রচলন করেন। এর পরে বেশ কিছু প্রজাতি নিম্নতর স্তরের নামের ব্যবহার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

উপ-প্রজাতি (Sub-species) Kant উপ-প্রজাতি পদটির ব্যবহার করলেও প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসে উপ-প্রজাতির ব্যবহার এবং ত্রিপদ নামকরণ প্রথম করেন Schlegel (1844)। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক প্রাণীবিদ্যা সংসদ উপ-প্রজাতি পদটি আন্তর্জাতিক প্রাণী নামকরণ সংহিতায় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ডারুইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' প্রকাশের পর থেকে এত বেশী প্রজাতি-নিম্নতর পর্যায়ের ব্যবহার করা হয়েছে যে অনেক সময়ই সুচিন্তিতভাবে না করার ফলে একই জিনিস বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। Wilson

ও Brown (1953) এই অবস্থার প্রেক্ষিতে উপ-প্রজাতি ধারণাকে শ্রেণী-বিন্যাসের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি ভেবে ত্রিপদ নামকরণের বিলুপ্তি চেয়েছেন। Blackwelder (1967) উপ-প্রজাতিকে নিম্ন পর্যায়ের ছদ্ম গোষ্ঠী (Pseudotaxa) হিসাবে গণ্য করে শ্রেণীবিন্যাসের গ্রাহ্য স্তর রূপে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

উপ-প্রজাতি সাধারণত ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশস্থ প্রজনকেই বোঝায়। উপ-প্রজাতিকে সংক্ষেপে সংজ্ঞা দেওয়া যায় এইভাবে: কোন প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত আকারগত সাযুজ্যযুক্ত কোন প্রাণিসমষ্টি যদি ঐ প্রজাতির ভৌগোলিক ব্যাপ্তির কোন অংশের অধিবাসী হয় এবং শ্রেণীবিন্যাসের দৃষ্টিতে ঐ প্রজাতির অন্যান্য অধিবাসী বা প্রজন থেকে পৃথক হয় সেই অবস্থায় ঐ প্রাণিসমষ্টিকে উপ-প্রজাতি বলা হয়। প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত উপ-প্রজাতিদের মধ্যে জনন সূত্রে আবদ্ধ হবার সুযোগ থাকলে মিলিত হতে বাধা থাকে না। উপ-প্রজাতি প্রজাতির মধ্য থেকে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয় সেই কারণেই অনেকের কাছেই গৌণ বিষয় রূপে গণ্য হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে অপসারীতা বা প্রভেদ সৃষ্টি একটি বাস্তব ঘটনা। সেই কারণে একে গুরুত্বহীন ভেবে নেওয়া যায় না। একটি প্রজাতিতে অনেকগুলো স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রজন থাকা সম্ভব, লক্ষ্য করলে তাদের মধ্যে আকার ও জিনগত পার্থক্যও টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো উন্নত পরিসংখ্যান দ্বারা নিরূপণ সম্ভব। এছাড়া উপ-প্রজাতিদের অধিক্রমণ জনিত সঙ্কর সৃষ্টির সম্ভাবনাও একেবারে বাতিল করা যায় না।

বেশ কিছু গবেষক উপ-প্রজাতিকে অঙ্গসংস্থানিক, ভৌগোলিক, বাস্তু-সংস্থানিক ইত্যাদি বিভিন্ন ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। Edwards (1955) তাদের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভৌগোলিক উপ-প্রজাতি (Geographical sub-species): এরা প্রজাতি-নিম্নতর অভিন্নকালিক প্রজন বা প্রজন সমষ্টি, যারা প্রজনকালে অবৃহৎ ভৌগোলিক অন্তরণভুক্ত থাকে। কিন্তু প্রজনগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় অভিন্নক্ষেত্রিক হলে তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে পরনিষেক ঘটা সম্ভব।

কাল উপ-প্রজাতি (Temporal sub-species): যে সব অভিন্ন-ক্ষেত্রিক প্রজাতি-নিম্নতর প্রজনকালের দিক থেকে জনন ঋতুতে অন্তরিত থাকে, কিন্তু অভিন্নকালিক হলে স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মধ্যে সাধারণ-

ভাবে যৌন মিলন ঘটা সম্ভব তাদের কাল উপ-প্রজাতি বলা হয়।

মরসুমি উপ-প্রজাতি (Seasonal sub-species) : কোন কোন অভিন্নক্ষেত্রিক একই প্রজাতির দুটি প্রজনের বা প্রজন সমষ্টির বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যৌন পূর্ণতা ঘটে। এই ধরনের উপ-প্রজাতিদের মরসুমি উপ-প্রজাতি বলা যায়।

বার্ষিক উপ-প্রজাতি (Annual sub-species) : যদি কোন প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত একটি প্রজন কোন বৎসর যৌন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং অন্য প্রজন অন্য বৎসর যৌন পরিপূর্ণতা লাভ করে সে ক্ষেত্রে এই প্রজনগুলিকে বার্ষিক উপ-প্রজাতি বলা যায়।

ভূতত্ত্বীয় উপ-প্রজাতি (Gcological sub-species) : পৃথক পৃথক ভূতত্ত্বীয় কালের একই প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত প্রজন অবস্থানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হলে তাদের ভূতত্ত্বীয় উপ-প্রজাতি বলা যায়। ভিন্নকালের ভূতত্ত্বীয় প্রজনের অভিন্নকালীন হওয়া এবং যৌনমিলন কল্পনার ও বাইরে।

বাস্তু সংস্থানিক উপ-প্রজাতি (Ecological sub-species) : অভিন্ন-ক্ষেত্রিক বৃহৎ ভৌগোলিক প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত নিম্নতর প্রজন বা প্রজন সমষ্টি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অবস্থায় অন্তরিত থাকতে পারে। কিন্তু তারা যদি অভিন্ন ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অবস্থায় থাকত তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটতে পারত। এদের বাস্তুসংস্থানিক উপ-প্রজাতি বলা হয়। এ ধরনের প্রজন বাস্তুসংস্থানিক স্তরভেদে ঘটে।

পলিটপিক উপ-প্রজাতি (Polytopic sub-species) : কোন প্রজাতিভুক্ত প্রজন সুস্পষ্টভাবে পৃথক থাকলে বা ভৌগোলিকভাবে অসমসত্ত্ব উপ-প্রজাতি হলে তাকে পলিটপিক উপ-প্রজাতি বলা যায়। কোন প্রজাতিভুক্ত উপ-প্রজাতির মধ্যে নির্দেশক আকারগত চরিত্রের ভেদ দেখা দিতে পারে। পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রজনেও এ ধরনের আকারগত চারিত্রিক ভেদ স্বাধীনভাবে দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আকারগত মিল সত্ত্বেও এদের মধ্যে জিনগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু উপ-প্রজাতি ঠিক একটি অভিব্যক্তিমূলক বিষয় বলে অনেকেই মানেন না সেইহেতু এ ধরনের প্রজনকে পলিটপিক উপ-প্রজাতি নাম দেওয়া হয়েছে।

উপ-প্রজাতি ব্যতিরেকেও অন্য আরও কিছু প্রজাতি-নিম্নতর পর্যায়ের ব্যবহার দেখা যায়।

রূপগোষ্ঠী (≡Phenon)—Camp ও Gilly (1943) প্রথম প্রজাতিভুক্ত আকারগত সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণিদলকে বোঝাবার জন্য এই 'ফেনন' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শব্দটির সমার্থক হিসেবে কখনো কখনো মরফোস্পিসিস (Morphospecies) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু প্রজাতির যৌন দ্বিরূপতা বা বহুরূপতার ফলে একাধিক রূপগোষ্ঠী দেখা যায়। পক্ষান্তরে সমাকৃতি (Sibling) প্রজাতির ক্ষেত্রে একাধিক প্রজাতিভুক্ত প্রাণী একই রূপগোষ্ঠী-ভুক্ত হবার সম্ভাবনাও থাকে। 'ফেনন' শব্দের ব্যবহার মায়ার সমর্থন করেছেন।

ডেমি (=Deme)—প্রথম ব্যবহার করেন Gilmore ও Gregor (1939)। এই শব্দটির অর্থ প্রায় 'ফেননে'র ন্যায়; তবে এর পরিধি আরও বিস্তৃত। এই শব্দটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বংশলতিকা বিষয়ক, জিন বিষয়ক ইত্যাদি প্রাণীদলকে বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিম্পসন্ কোন স্থানের ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একই প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত প্রাণিদলকে বোঝাতে এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। প্রায় কাছাকাছি অর্থে নেটিশ (Natis) শব্দটির ব্যবহারও দেখা যায়।

প্রকার (=Variety)—লিনিয়াস এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং এর পরেও বেশ কিছু কাল সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই শব্দটি শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশী বিতর্কিত বলে বিবেচিত হয়েছে। জাতিরূপ মতধারায় প্রত্যেকটি প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট প্রতিকৃতি থাকে। যাদের এই প্রতিকৃতির সঙ্গে মিল হয় না তাদের 'প্রকার' হিসেবে পরিচিত করা হত। ডারুইনও প্রাণীদের ব্যক্তিগত বা দলগত ভেদ ইত্যাদি বোঝাতে প্রকারের ব্যবহারের যৌক্তিকতা গ্রহণ করতে চাননি। কারণ একে কোন প্রজন হিসেবেও গণ্য করা যায় না। এই সব কারণে প্রাণী নামকরণে প্রকারের ব্যবহার প্রায় বর্জিত।

রকম বা অঙ্গসংস্থানিক জাতিরূপ (=Form or Morphotype)—Edwards (1955) কোন প্রজাতির অভিন্নক্ষেত্রিক ও অভিন্নকালিক যৌন-মিলন সক্ষম পৃথক প্রজন বোঝাবার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শ্রেণীবিন্যাসে এ ধরনের শব্দের বিশেষ গুরুত্ব নেই।

বর্ণ (=Race)—সাধারণভাবে বর্ণ শব্দটি শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে ভৌগোলিক বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য ব্যবহার যেমন বাস্তুসংস্থানিক বর্ণ (Ecological race) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় উপ-প্রজাতি এবং

বর্ণ এই শব্দ দুটি সমার্থক বা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তুসংস্থানিক বর্ণ শব্দসমষ্টিটি ব্যবহৃত হলেও এখনও প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিতর্কিত, কারণ যে কোন দুটি অঞ্চলের পরিবেশের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। সে দিক থেকে প্রতিটি উপ-প্রজাতিকে এক একটি বাস্তুসংস্থানিক বর্ণ বলা যায়। অবশ্য শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় প্রজনের মধ্যে লক্ষ্যণীয় বাস্তুসংস্থানিক প্রয়োজনগত পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু পরজীবীদের ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন শোষক বর্ণের (Hostrace) প্রজনের মধ্যে জিনের প্রবাহ খুব কম হয় বা না হয় সে অবস্থায় এদের মুক্ত অবস্থার ভৌগোলিক বর্ণের (Geographical .race) সমতুল্য ভাবা যায় এবং বর্ণগুলির উপ-প্রজাতি পর্যায় পাবার সম্ভাবনা থাকে।

চারিত্রিক পর্যায় (=Cline)—চারিত্রিক মানের মাত্রা বা পর্যায় বোঝবার উদ্দেশ্যে J. S. Huxley (1935) প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। একটিমাত্র প্রজনের প্রাণীরা চারিত্রিক মানের ভেদাভেদে একাধিক পর্যায়ে বিন্যস্ত হতে পারে। অনেক সময় অবিচ্ছিন্ন অধিবাসীর মধ্যে একটি চারিত্রিক মানের ক্রমাগত পরিবর্তনের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। পরিমাপযোগ্য চারিত্রিক মানের মাত্রা বা পর্যায় বোঝাতেই এই শব্দটির ব্যবহার এবং এই পর্যায়ের সমকোণে যুক্ত যে রেখায় সমমানের চরিত্রের স্ফুরণ বা প্রকাশ ঘটে সেই রেখাকে **সমচারিত্রিক স্ফুরণরেখা** (=Isophene) বলা হয়। চারিত্রিক পর্যায় শারীরবৃত্তীয়, অঙ্গসংস্থানিক, জিনগত, বাস্তুসংস্থানিক ইত্যাদি চরিত্র নির্ভর হতে পারে বা বহুরূপতা প্রসূত চরিত্রের পরিসংখ্যা বোঝাতে পারে। অধুনা ভৌগোলিক, বাস্তুসংস্থানিক, পারস্পরিক চারিত্রিক পর্যায় বোঝাতে যথাক্রমে ভৌগোলিক চারিত্রিক পর্যায় (=Geocline), বাস্তু-সংস্থানিক চারিত্রিক পর্যায় (=Ecocline), কাল চারিত্রিক পর্যায় (Chron-ocline) নামগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে। চারিত্রিক পর্যায় ক্রম মসৃণ (Smooth cilne) বা ধাপে ধাপে (Step cline) হতে পারে। উপ-প্রজাতির সঙ্গে চারিত্রিক পর্যায় বা Cline-এর প্রভেদ সুস্পষ্ট। উপ-প্রজাতি একটি প্রজনকে বোঝায় কিন্তু একটি প্রজন একাধিক চারিত্রিক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। উপ-প্রজাতি একটি শ্রেণীবিন্যাসের ধারণা। কিন্তু চারিত্রিক স্তর একটি অভিব্যক্তির ধারণা।

মণ্ডল/গুচ্ছ/পুঞ্জ (=Group)—শব্দটি সাধারণত নিকটতম গোষ্ঠী সমষ্টিকে বোঝাবার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রজাতি পুঞ্জ (=Species group) বর্তমানে বহু ব্যবহৃত। নিকটতম প্রজাতি সমষ্টিকে বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো কখনো পুঞ্জ (=Group) শব্দের সমার্থক রূপে 'কমপ্লেক্স' (Complex) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। উপশাখা (=Section), ক্রম (=Series), বিভাগ (=Division) প্রভৃতি শব্দগুলো সাধারণত প্রজাতি-উচ্চতর পর্যায় বোঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রজাতি ও প্রাণিপ্রজন (=Species and animal population)—শ্রেণীবিন্যাসে ক্রমাগত উপ-প্রজাতি স্থাপন এবং জাতিভিত্তিক (Typological) প্রজাতি প্রত্যয়ের বদলে জৈবিক প্রজাতি ধারণার প্রসারের ফলে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা আর নমুনা প্রাণীটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁদের দৃষ্টি দিতে হল প্রাণিপ্রজনের দিকে। প্রাণীকে সংগ্রহশালার উপাদান হিসেবে না দেখে দেখা হতে লাগল প্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে। অনেক সময়ই দেখা গেল ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রজনের মধ্যে চারিত্রিক ভেদ। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের এইসব চারিত্রিক গুণাগুণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হল।

প্রজনের আকার ঃ প্রজনের আকার সঠিকভাবে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে প্রজাতির কয়েকটি উপ-প্রজাতি গতানুগতিকভাবে স্থাপন করলেই বাস্তব চিত্রের পরিস্ফুটন ঘটে না, কারণ কোন একটি প্রজাতি কেবল দু'একটি উপ-প্রজাতি দ্বারা চিহ্নিত পার্থক্যযুক্ত প্রাণীদের সমষ্টিই নয় বরং প্রজাতিতে অসংখ্য পার্থক্যযুক্ত স্থানীয় প্রজন থাকে যারা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে ও মাত্রায় সম্পর্কিত। প্রজাতিকে প্রজনের বিচারে জানা যায় প্রধানত তিনটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

1. **প্রজনের ধারাবাহিকতা** (Population continuum) ঃ অধিকাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিস্তারণের অধিকাংশ অঞ্চলেই, বিশেষত কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অনেকগুলি অবিচ্ছিন্ন প্রজনের অবস্থিতি থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বসবাসের অনুপযোগিতা হেতু কোন ছোটখাট অন্তরণ থাকলেও কালের গতিতে প্রাণীদের বিস্তারের ফলে বিচ্ছেদ সঙ্কুচিত বা বিলুপ্ত হয়। ফলে প্রজনগুলোর মধ্যে জিনের আদান প্রদান স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকে। এই ধারাবাহিক প্রজনের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষ্য

করা যায় সেগুলো মূলত বংশগত। এই ধারাবাহিক প্রজনের মেরুপ্রান্তে যে সব প্রজনের প্রাণীরা থাকে তাদের বৈষম্যের ভিত্তিতে সাধারণত উপ-প্রজাতি-ভুক্ত করা হয়।

2. **প্রজনের ভৌগোলিক অন্তরণ** (Geographic isolation of population) ঃ কোন কোন প্রজাতির প্রজনপুঞ্জ ভৌগোলিকভাবে অন্তরিত থাকার ফলে বিভিন্ন প্রজনের মধ্যে জিনের আদান প্রদান খুব সীমাবদ্ধ বা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এই ধরনের প্রজনের মধ্যে পরিলক্ষিত চারিত্রিক বৈষম্যের ভিত্তিতে তাদের পৃথক উপ-প্রজাতিভুক্ত করা যায়। অন্তরিত প্রজনের প্রান্তসীমায় প্রধানত লক্ষ্য করা যায় পৃথক উপ-জাতিভুক্তি যোগ্যতা। জীব-বিজ্ঞানে, বিশেষত অভিব্যক্তির দৃষ্টিতে অন্তরিত প্রজনের গুরুত্ব যথেষ্ট, কারণ এই ধরনের প্রতিটি অন্তরিত প্রজন এক একটি নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনাময়।

3. **অন্তরিত প্রজনের মাধ্যমিক মিলনাঞ্চল** (Zone of secondary integration) ঃ কোন কোন সময় প্রজাতির অন্তরিত প্রজন আবার মূল প্রজাতি প্রজনের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। পুনরায় মিলিত হবার যোগ্যতা নির্ধারিত হয় প্রজনগুলোর মধ্যে আকারগত ও জিনগত পরিবর্তনের মাত্রার উপর। অন্তরিত প্রজনের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটলে এই দুই প্রজনের মধ্যে একটি অঞ্চল সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলকে মাধ্যমিক মিলনাঞ্চল বা সঙ্কর অঞ্চল বলা যায়।

প্রাণী প্রজন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার এখনও যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। তাই শ্রেণীবিন্যাসে প্রজন সম্পর্কিত তথ্যকে কাজে লাগালেও তা' প্রচলিত পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক চরিত্র

প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাসের মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধরদের গুণগত বিচারে। এদিক থেকে বংশধারাগত সাযুজ্যকে শ্রেণীবিভাগের উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। বংশধরদের মধ্যে বর্তমান নৈকট্য ও পার্থক্যের পরিস্ফুটন ঘটে চরিত্রের মাধ্যমে। ফলে শ্রেণীবিন্যাসের উৎস যদিও সাধারণ পূর্বপুরুষ সম্ভূত বংশবিস্তার ঘটিত সাযুজ্য ও পার্থক্য, কিন্তু শ্রেণীবিভাগের গোষ্ঠী নিরূপণে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল-অমিলের ভিত্তিকেই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এই ব্যবহারিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেই শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্ররূপে ধরা হয়। অন্যভাবে বলা যায় এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই কোন প্রাণিগোষ্ঠীকে অন্যান্য প্রাণিগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। তবে সব চরিত্রই শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্ররূপে গণ্য হবার যোগ্য নয়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্ররূপে গণ্য হতে হলে বৈশিষ্ট্যটি এক বা একাধিক গোষ্ঠীতে বর্তমান থাকা ও অন্য এক বা একাধিক গোষ্ঠীতে অবর্তমান থাকা প্রয়োজন এবং এই ভিত্তিতেই গোষ্ঠী নিরূপণ সম্ভব। কোন গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে বয়স ও লিঙ্গভেদ জনিত চারিত্রিক পার্থক্য শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র হিসেবে গণ্য হয় না। তবে শুককীট (লার্ভা) অবস্থার কোন কোন চরিত্র, যৌন দ্বিরূপতা জনিত চরিত্র ইত্যাদি গোষ্ঠী নিরূপণের চরিত্র রূপে গণ্য হতে পারে।

শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র বাস্তব, সঠিক এবং আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। যেমন পাখির পালক কিংবা বারবিসেলযুক্ত বা বিহীন পালক অথবা তিন-জোড়া বা চারজোড়া বা পাঁচজোড়া বক্ষদেশীয় পা ইত্যাদি। শ্রেণীবিন্যাস চরিত্রের প্রধান দুটি দিক—(1) নির্দেশক দিকের সাহায্যে গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নির্ধারণ যা নিম্নতর পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং (2) সম্পর্ক নির্ণয়ের সূচক হিসেবে কাজ করা, যা উচ্চতর পর্যায়ে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশক চরিত্রগুলি গোষ্ঠী নিরূপণের পক্ষে কার্যত একান্ত উপাদান এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার্য। সুতরাং চরিত্রের গুরুত্ব নির্ধারণ সুচিন্তিত ও সামঞ্জস্য-

পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আকারগত চরিত্রকে যদিও প্রাধান্য দিতে হয়, কিন্তু জিন বা ডি. এন. এ সম্পর্কীয় বিষয় স্মরণে রাখা বাঞ্ছনীয়। চরিত্রের গুরুত্ব নির্ধারণে অভিযোজনের বিষয়টিও মনে রাখা দরকার। ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র সাধারণত কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। গোষ্ঠী নির্ধারণে অসংখ্য চরিত্র গ্রহণ করার যেমন ঝুঁকি আছে অতি সামান্য সংখ্যক চরিত্র নির্ভর হলেও ত্রুটি থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

চরিত্রের প্রকার ঃ

শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্রমালাকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। কোন চরিত্রকে শ্রেণীবিন্যাসে উপযোগী মনে করা হয় যদি সমগোত্রীয় চরিত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য প্রতিফলিত করে। তবে কোন্ গোষ্ঠীর পক্ষে কোন্ চরিত্র গ্রাহ্য সে বিষয়ে সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। এদিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস চরিত্র গোষ্ঠীনির্ভর বলা যায়। যেমন টেট্রাগনাথা (Tetragnatha) জাতের মাকড়সার পক্ষে চোয়ালের (Chelicerae) বৈশিষ্ট্য, অনেক সন্ধিপদের জনানঙ্গ (Genitalia) কিছু মেরুদণ্ডীর করোটির গঠন ইত্যাদি।

প্রকার অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস চরিত্রের তালিকা নিম্নরূপ।

1. **আকারগত চরিত্র।**

   সাধারণ আকারগত (অঙ্গসংস্থানিক) চরিত্র।

   বিশেষ ধরনের আকার যথা জননাঙ্গ।

   ভ্রূণতাত্ত্বিক চরিত্র।

   ক্রোমজোম বা কোষ বিজ্ঞান বিষয়ক চরিত্র।

2. **শারীরবৃত্তিয় চরিত্র।**

   বিপাক বিষয়ক।

   জীবরসায়নগত (রক্ত, প্রোটিন, দেহ নিস্রারণ ইত্যাদি)।

   জিন বন্ধ্যাত্ব বিষয়ক।

3. **বাস্তব্য চরিত্র।**

   বাসস্থান ও পোষক বিষয়ক।

   খাদ্য জনিত।

   শোষক-পোষক বিক্রিয়া বিষয়ক।

   ঋতু ভিত্তিক প্রভেদ জনিত।

4. **আচরণগত চরিত্র।**

যৌনমিলন ও অন্যান্য স্বভাবগত বিষয়।

অন্যান্য আচরণগত।

5. **ভৌগোলিক চরিত্র।**

সাধারণ প্রাণি-ভৌগোলিক বিস্তারণ বিষয়ক।

অভিন্নক্ষেত্রিক ও ভিন্নক্ষেত্রিক প্রজন বিষয়ক।

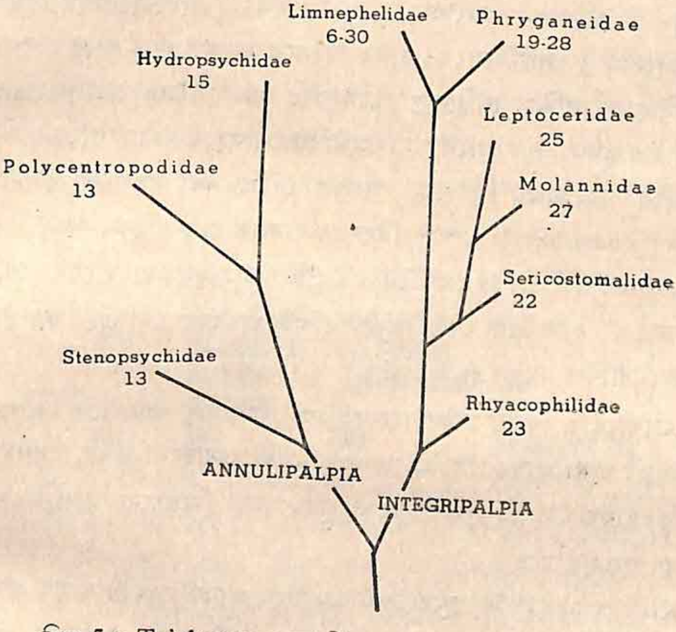
সাধারণ আকার ঃ নির্দিষ্ট এবং নির্দেশক কোন চরিত্রকে সব সময় সর্বাত্মকভাবে না বোঝালেও আকার, আয়তন, বর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন চারিত্রিক দিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীকে প্রাথমিক ভাবে অনেকটা সাহায্য করে। বাইরের আকারগত দিকের পরেই নজর দিতে হয় ভেতরের অঙ্গসংস্থানিক চরিত্রের দিকে। আধুনিককালে উন্নততর বৈজ্ঞানিক উপায় ও সাধনী আবিষ্কারের ফলে অধিকতর তথ্য ও নতুন নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বিশেষ ধরনের আকৃতিগত চরিত্র ঃ অধিকাংশ সন্ধিপদের জননাঙ্গের আকারগত চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নিরূপণে যথেষ্ট সহায়ক। জননাঙ্গের আকারগত বৈশিষ্ট্য সাধারণত প্রজাতি ভিত্তিক। ফলে এ ধরনের চরিত্রকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে ব্যতিক্রম আছে; একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের জননাঙ্গের পার্থক্য অথবা একাধিক প্রজাতির মধ্যে জননাঙ্গের সাদৃশ্য কদাচিৎ হলেও দেখা যায়।

ভ্রূণতাত্ত্বিক চরিত্র ঃ অনেক সময়ই যথেষ্ট সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়। বিভিন্ন জাতের ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী এনোফেলিস্ মেকুলিপেনিস্ (*Anopheles maculipennis*) যৌগে অনেকগুলো সমাকার প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। সেকুলিনা বা অন্য বেশ কিছু শোষক প্রাণীর গোষ্ঠী নিরূপণ ভ্রূণতাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়া প্রায় অসম্ভব। জীবন বৃত্তান্তে রূপান্তর (Metamorphosis) যুক্তদের ক্ষেত্রে চরিত্রের গুরুত্ব নির্ধারণে শুককীটদশা ও পূর্ণাঙ্গের চরিত্র মূল্যায়নের মধ্যে সমতা রক্ষার পথেই যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব।

কোষ বিজ্ঞান বিষয়ক চরিত্র ঃ বিশেষত ক্রোমজমের সংখ্যা ও গঠন বর্তমানে মূল্যবান চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়। বস্তুতপক্ষে প্রজাতির

বা জাতিবিশেষের ক্রোমজমের সংখ্যা ও গঠনের স্থনির্দিষ্টতা এবং বংশগতির ধারক হিসেবে প্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোমজম-শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান বা কোষ বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান স্থাপিত হয়। ক্রোমজম শ্রেণী-বিন্যাসের মাধ্যমে সমাকার প্রজাতি ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়ক। আধুনিক উন্নত মানের প্রযুক্তির ব্যবহারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়েছে। Patterson ও Stone (1952) ড্রসফিলা গণের 16টি প্রজাতি



চিত্র 5 : Trichoptera জাতীয় গোত্রসমূহের জাতিজনির বিপরীতে ক্রোমজম সংখ্যা (Kiauta, 1967 থেকে)।

নির্ধারণ করেন ক্রোমজমের সংখ্যা ও গঠনের ভিত্তিতে। Kiauta (1968) ট্রাইকপ্‌টেরা বর্গের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যবর্তী জাতিজনি বিষয়ক সম্পর্ক ক্রোমজমের সংখ্যার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন (চিত্র 5)।

Mittalet al. (1974) *Labidura* গণের এক নামী দুটি প্রজাতিকে ক্রোমজমের গঠন ও সংখ্যা ভিত্তিতে পৃথক করতে সক্ষম হন। Grewal (1982) *Tephritidae* গোত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিকে ক্রোমজমের আকার ও সংখ্যার ভিত্তিতে পৃথক করেন। তিনি *Dacus Zonatus*

যে একটি প্রজন তা এই ভিত্তিতে আবিষ্কার করেন। পলিপ্লয়ডি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের ব্যাখ্যাও ক্রোমজমের পথেই সম্ভব। তবে ক্রোমজমের গঠন এবং সংখ্যা শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র হিসেবে গণ্য হলেও একমাত্র ও শেষ সিদ্ধান্তের পন্থা নয়। কারণ একই রকম সংখ্যা ও গঠনযুক্ত প্রাণী ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত থাকতে পারে।

ডি. এন. এ তুল্যতা (DNA matching) ও জিনগত উপাদান অর্থাৎ জেনম (নিউক্লিয়াসের ডি. এন. এ) ও প্লাসমন (সাইটোপ্লাসমের ডি. এন. এ উপাদান) শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিপাক জনিত চরিত্র ঃ বিপাকীয় পথ (Metabolic pathways) ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা শ্রেণীবিন্যাসে সহায়ক হতে পারে।

জীব রসায়ন বিষয়ক অন্যান্য চরিত্র যথা রক্তমস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Serology) সম্পর্ক নিরূপণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির মূলসূত্র নিকটতম প্রাণীর প্রোটিনে এন্টিবডি তুলনামূলকভাবে বেশী বিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে রক্তে বেশী অধক্ষেপ পাওয়া যায় এবং এই ক্রমানুসারে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। (চিত্র 6)।

ক্রোমাটোগ্রাফি ইলেক্‌ট্রোফোরেসিস ইত্যাদি পদ্ধতিতে সম্পর্কযুক্ত নিকটবর্তী প্রজাতিদের বিভিন্ন উপাদান যেমন এমাইনোএসিড, পেপটাইড, নিউক্লিওটাইড ইত্যাদি পৃথকীকরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে।

Kirk-et al (1954) ফ্লুরোসেন্ট পদ্ধতিতে সাতটি ডাঙ্গার শামুক প্রজাতি নির্ধারণ করেন। Sibley (1960) কমপক্ষে 100টি পক্ষী প্রজাতির ডিমের সাদা অংশের (Albumen) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছেন। Throckmorton (1962) ড্রসফিলার বিভিন্ন প্রজাতির অনুরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। Florkin ও Jeuniaux (1964) পতঙ্গের রক্তের এমিনোএসিড উপস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। Handler (1964), Bryson ও Vogel (1965) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা জীবের কোন একটি দেহ উপাদান যেমন হিমোগ্লোবিনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রস্তাব রেখেছেন। Harlow-et al (1969), Stephen (1974) প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও শ্রেণীবিন্যাসে এই ধরনের বিশ্লেষণের উপযোগিতা দেখিয়েছেন।

ইলেক্‌ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে দেখা যায় ভেড়া, ষাঁড় ও ঘোড়ার ইনস্থুলিন একরকম নয়। শূকরের ACTH ষাঁড় থেকে পৃথক। ষাঁড়ের ভ্যাসোপ্রেসিনে আরজিনিন থাকে কিন্তু শূকরের ভ্যাসোপ্রেসিনে থাকে লাইসিন। এই সব জীব-রাসায়নিক বিশ্লেষণ শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিজনি নির্ধারণে এমন সব তথ্য যোগাতে সক্ষম যা অন্য কোন পথে সম্ভব ছিল না। দেখা যায় প্রাণীদের প্রতিটি যন্ত্র বা তন্ত্রের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তির হার বর্তমান এবং জীব-রাসায়নিক উপাদানগত চরিত্রের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তির হার প্রযোজ্য।

চরিত্রভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসে বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী যে সব লক্ষণ বা উপাদান পাওয়া যায় তাদের ব্যবহারে অনুপরমাণু স্তর ও তন্ত্র এবং জীব-স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছানো বাঞ্ছনীয়।



চিত্র 6 : গো-মোষ জাতের ছ'টি প্রজাতির রক্তের এ্যান্টিজেনের (Antigen) সঙ্গে তিনটি প্রজাতির এ্যান্টিসেরার (Antisera) বিক্রিয়া (Moody, 1958 থেকে)।

জিন বন্ধ্যাত্ব নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গোষ্ঠী নিরূপণে সহায়ক চরিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে, বিশেষত অন্যান্য চরিত্র যে সব ক্ষেত্রে প্রজাতি নির্ধারণে যথেষ্ট মনে হয় না।

বাস্তব্য চরিত্র। বাস্তুসংস্থানিক বিষয়কে ঐতিহাসিকভাবে প্রথম বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেন দার্শনিক প্লেটো। তিনিই প্রাণীদের জলীয়, ভৌম ও বায়বীয় বসবাসের গুরুত্ব আরোপ করেন। এরিস্টটল এই ধরনের চরিত্রের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসও করেছেন। বাস্তব্য চরিত্র অনেক সময়ই শ্রেণীবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগায়। প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রজাতি এক একটি বাস্তব্য স্তরে অধিষ্ঠিত থাকে এবং খাদ্য পছন্দে, জননঋতু, খাদ্য প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা, ক্ষতিকারক জীবাণু ইত্যাদির বাধাসৃষ্টি পদ্ধতি, বিভিন্ন ভৌত উপাদান সহ্য করার ক্ষমতা ইত্যাদি পার্থক্যের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যবর্তী সম্ভাব্য চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। খাদ্য পছন্দের তারতম্য বা পোষক নির্দিষ্টতার কারণে বেশ কিছু সমাকার প্রজাতিকে সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। জীবনচক্রের বিভিন্ন দশার দৈর্ঘ্য, সন্তান সৃষ্টির হার, জনন ঋতুর সময় বা স্থায়িত্বের পার্থক্য সমাকার ও নিকটাত্মীয় প্রজাতিদের সনাক্তকরণ সম্ভব করেছে। উদাহরণস্বরূপ *Anopheles maculipennis* জাতীয় সমাকার প্রজাতিদের বাস্তব্য পার্থক্য উল্লেখ্য।

Anopheles maculipennis জাতীয় সমাকার প্রজাতি কূলের বাস্তু-সংস্থানিক পার্থক্যের সারণী (1) :

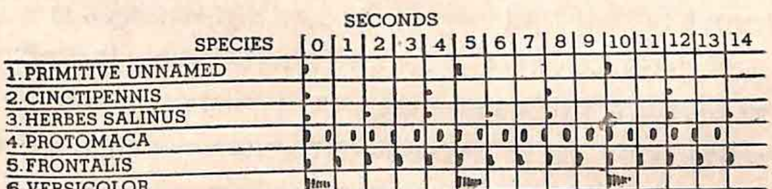
প্রজাতি	আবাস	জলের প্রকার	শীত ঘুম	ম্যালেরিয়ার বাহক
মেলানুন (melanoon)	ধানের ক্ষেত	পরিষ্কার জল	অবর্তমান	নয়
মেসাক (messac)	ঠাণ্ডা স্থির জল	পরিষ্কার জল	অবর্তমান	প্রায়শই নয়
এট্রোপারভাস (atroparvus)	ঠাণ্ডা জল	ময়লা জল	অবর্তমান	সামান্য রকমের
মেকুলীপেনিস (maculipennis	ঠাণ্ডা স্থির জল	পরিষ্কার জল	বর্তমান	নয়
লাব্রাঙ্কি (llabranchiae)	প্রায়শ উষ্ণ জল	ময়লা জল	অবর্তমান	খুব সাঙ্ঘাতিক
শাকারোভি (sacharovi)	অগভীর স্থির জল	প্রায়শই ময়লা জল	অবর্তমান	খুব সাঙ্ঘাতিক

বেশ কিছু পরজীবী প্রাণিপ্রজাতি, বিশেষত পতঙ্গ ভিন্ন পোষক উদ্ভিদে অবস্থিত একই প্রজাতি হিসেবে গণ্য হওয়া প্রাণীদের মধ্যেও নতুন প্রজাতির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এই প্রবণতার মাত্রাধিক্য হলে শ্রেণীবিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। পরজীবীদের ন্যায় অন্যোন্যজীবী

(Symbionts)-দের ক্ষেত্রেও এই ধরনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

ঋতুভিত্তিক জীবনচক্র বা জনন পরিপূর্ণতার বিভিন্নতা জনিত চরিত্র নিকটাত্মীয় ও সমাকার প্রজাতিদের পৃথকীকরণে সহায়ক হতে পারে।

আচরণগত চরিত্র অনেক সময় শ্রেণীবিন্যাসের উপাদেয় উপাদান হিসেবে কাজ করে। পক্ষী, পতঙ্গ, ব্যাঙ, কিছু মাছ ইত্যাদির কিছু কিছু আচরণগত বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ শ্রেণীবিন্যাসের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। দেখা গেছে এই চরিত্রগুলি জিনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং বংশানুক্রমিকভাবে চলে। Thickel (1964), Smith (1966) ও অন্যান্যরা নিকটাত্মীয় পাখীদের ডাকের শব্দ রেকর্ড করে আলাদা করেছেন। Alexandar (1962) চল্লিশটির মত উত্তর আমেরিকার ঝিঁঝিঁ পোকার (Cricket) প্রজাতি নির্ধারণ করেছেন শব্দের ভিত্তিতে। Barber (1951) উত্তর আমেরিকার ফটুরিস (*Photuris*) গণের জুনিপোকার আলো বিচ্ছুরণের উজ্জ্বলতা ও বিস্তৃতির ভিত্তিতে প্রজাতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হন (চিত্র-7)।



চিত্র 7 : *Photuris* গণের জোনাকি পোকার কিছু প্রজাতির আলো বিচ্ছুরণের প্রকাশ (**Barber, 1951** অনুসারে)।

মাকড়সার জালের গঠন শ্রেণীবিন্যাসে সহায়ক চরিত্র হিসেবে অনেকে গণ্য করেছেন। বাসা তৈরীর মাল মশলার ভিত্তিতে *Anthidium* ও *Dianthidium* গণকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। একই ভাবে *Apicotermis* গণের বিভিন্ন প্রজাতিকে বাসার গঠনের ভিত্তিতে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে।

কিছু কিছু পোকার শুককীট বা মূককীট গঠনে বাইরের সে সব জিনিস ব্যবহার করে থাকে বা শামুক জাতের বিশেষত *Xenophora* গণের প্রাণীদের খোলসের বাইরে লেগে থাকা উপাদান শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু প্রাণিপ্রজাতিকে যৌন লীলা বা অন্য কিছু কিছু লীলা ভঙ্গির সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। পাখীর বাসাবোনা পদ্ধতি বা গঠন শ্রেণীবিন্যাসে অনেক সময় সহায়ক হয়েছে।

ভৌগোলিক চরিত্র প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাসে বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাসে অস্বচ্ছতা থাকে সে সব ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিস্তারণ ও অভিন্নস্থলী-ভিন্নস্থলী (Sympatric-allopatric) সম্পর্ক স্বচ্ছতা লাভে সহায়ক হয়। শ্রেণীবিন্যাস অভিব্যক্তি ও জাতিজনি চিন্তার ফলস্বরূপ এবং জীব-ভৌগোলিক বিস্তারণের ব্যাখ্যা অভিব্যক্তিমূলক। প্রাণিবিজ্ঞানীরা পৃথিবীময় প্রাণিবিস্তারণকে কয়েকটি দেশ, মণ্ডল ও প্রদেশ (Realms, Zones and Provinces) ইত্যাদিতে ভাগ করেছেন। এই ভাগকে সুন্দর-ভাবে অভিব্যক্তিমূলক ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। বিস্তারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাণিগোষ্ঠী (প্রজাতি, উপ-প্রজাতি বা প্রজাতি উচ্চতর স্তর) একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত থাকে এবং নিকটাত্মীয়রা সাধারণত কাছাকাছি অঞ্চলেই অবস্থিত থাকে। আবার কোন একটি অঞ্চলে অবস্থিত হয়েও দূরবর্তী এলাকায়ও থাকতে পারে। এর ব্যাখ্যা ও জীব-ভৌগোলিক ইতিহাসের পথে পাওয়া সম্ভব। জীব-ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজনকে তুলনা করা যেতে পারে এবং সেদিক থেকে ভৌগোলিক বিস্তার বা চরিত্রকে শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র হিসেবে কাজে লাগিয়ে অনেক সময় সঠিক শ্রেণীবিন্যাসে পৌছতে পারা যায়। তবে আচরণগত চরিত্র সংরক্ষিত প্রাণীদের ক্ষেত্রে পাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব নয়।

শ্রেণীবিন্যাসে বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রের গুরুত্বের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও সম্ভাব্য সর্বাধিক উপযোগী চরিত্রের মূল্যায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষত সংগৃহীত প্রাণীদের ক্ষেত্রে আকারগত চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। আবার কোন্ প্রকার চরিত্র কোন্ পর্যায় বা গোষ্ঠী নির্ধারণে উপযোগী ইত্যাদি বিষয়ে কোন সাধারণ তালিকা দেওয়া পুরোপুরি বাস্তবানুগ না হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এ সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট

বিষয়ক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত চিন্তা সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হয়।

চারিত্রিক ভেদের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন

চারিত্রিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই সাধারণত বস্তুর শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শুধুমাত্র চারিত্রিক তুল্যতার ভিত্তিতে জড় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হলেও জীবের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। জীব তথা প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে চারিত্রিক সাদৃশ্য এবং চারিত্রিক ভেদের মূল্যায়নে শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর পর্যায় বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ভেদ বৈষম্যের রূপ নেয়। এই ভেদের প্রকার ও মাত্রা বিভিন্ন হতে পারে। ফলে ভেদের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াই স্বাভাবিক।

এক প্রজনের মধ্যে ভেদের প্রধান প্রধান প্রকার নীচে উল্লেখ করা হল (মায়ার অনুসারে)—

I. জিন অ-সম্পর্কিত ভেদ (Nongenetic Variation)।
- A. সময় নির্ভর ব্যক্তিগত ভেদ (Individual variation in time)।
  - (i) বয়স নির্ভর ভেদ।
  - (ii) ঋতু নির্ভর ভেদ।
  - (iii) প্রজন্মের ঋতুভিত্তিক ভেদ।
- B. সমাজবদ্ধ প্রাণীদের ভেদ।
- C. বাস্তুসংস্থানিক ভেদ।
  1. বাসস্থান ভিত্তিক ভেদ।
  2. সাময়িক আবহাওয়া জনিত ভেদ।
  3. পোষক নির্দিষ্ট ভেদ।
  4. প্রজন ঘনত্ব নির্ভর ভেদ।
  5. অসম বৃদ্ধি জনিত ভেদ।
  6. স্নায়বিক বর্ণ ভেদ।
- D. অস্বাভাবিক ধরনের ভেদ।
  1. পরজীবী ঘটিত ভেদ।
  2. দুর্ঘটনা জনিত ভেদ।

II. জিন সম্পর্কিত ভেদ।

A. লিঙ্গ সম্পর্কিত ভেদ।
   1. প্রাথমিক লিঙ্গ ভেদ।
   2. বাহ্যিক (মাধ্যমিক) লিঙ্গ ভেদ।
   3, জনিচক্র।
   4. উভলিঙ্গধর ও নপুংসক।
B. লিঙ্গ সম্পর্ক বহির্ভূত ভেদ।
   1. ধারাবাহিক।
   2. বিরতিপূর্ণ।

ভেদ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু কিছু ব্যাখ্যা—জিন সম্পর্কিত ভেদের তুলনায় জিন অসম্পর্কিত ভেদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা স্বচ্ছ। সাধারণভাবে বলা হয় জিন সম্পর্কিত ভেদ অভিযোজিত হয় প্রজন ও প্রজাতিতে আর জিন অসম্পর্কিত ভেদ অভিযোজিত হয় ব্যক্তিতে।

বয়স নির্ভর ভেদ সম্পর্কে, বিশেষত জীবনচক্রের দশা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে অনেক সময়ই একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীকে পৃথক প্রজাতি, গণ এমনকি শ্রেণীভুক্তও করা হয়েছে।

ঋতুনির্ভর ভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় কিছু পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের শীত ও গ্রীষ্মের পালক ও পশমে। সুমেরু অঞ্চলের *Lagopus* এবং *Mustela* শীতকালে সাদা ছদ্মবেশ নিতে পারে, গরমের সময় আবার স্বাভাবিক রং ফিরে পায়। অনেক পাখির পালক ছাড়ার (Moulting) সঙ্গে ভেদ দেখা যায়। বেশ কিছু পাখি প্রজনন কালে উজ্জ্বল পোষাকে শোভিত হয়, প্রজনন কাল শেষে মলিন পালক যুক্ত থাকে। কিছু কিছু স্বল্পজীবী প্রাণীদের বিভিন্ন ঋতুর প্রজন্মের মধ্যে আকারগত ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য ডানার জালিকা বিস্তার এমনকি জননাঙ্গেও দেখা যায়। কিছু কিছু রটিফার ও ক্লাডোসেরা জাতের প্রাণিপ্রজাতির জলের তাপমাত্রা, অস্থিরতা ইত্যাদির পরিবর্তনে নিয়মিতভাবে অঙ্গসংস্থানগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

সমাজবদ্ধ প্রাণীদের একাধিক জাতি বা রূপগত ভেদ অনেক সময়ই যথাযথ ধারণার অভাবে ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত হয়েছে।

বাসস্থান ভিত্তিক ভেদঃ কিছু কিছু প্রজাতির প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থানের অধিবাসী হবার ফলে পার্থক্যযুক্ত হতে পারে। তাদের

বাসস্থানভিত্তিক বা বাস্তুসংস্থানিক বর্ণ (Ecological race) হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাসস্থানভিত্তিক ভেদ শামুক ঝিনুক ইত্যাদির মধ্যে সুস্পষ্ট।

পোষকভিত্তিক ভেদ শ্রেণীবিন্যাসে লক্ষণীয়। Gerould লক্ষ্য করেন *Apantales flaviconchae* সবুজ রং-এর শূঁয়োপোকার উপর বেড়ে উঠলে সাদা রং-এর মূককীটের আবরণী তৈরি করে। কিন্তু হরিদ্রাভ-সবুজ রং-এর শূঁয়ো থেকে বেড়ে উঠলে সোনালী গোলাপ রং-এর মূককীটের আবরণী গঠন করে। Salt (1941) দেখান যে *Trichogramma Semblidis* ভ্রমর *Sialis lutaria*-এর ডিমে বেড়ে উঠলে পুরুষরা ডানাহীন হয় এবং অন্যান্য পরিবর্তনও দেখা যায়। কিন্তু মথ ও প্রজাপতি জাতের পোষকে বেড়ে উঠলে সে রকম হয় না। H. S. Smith (1942) জানান যে *Habrolepsis rouxi* লেবু জাতের (Citrus) গাছে বসা Red Scale Insect-এ পরজীবী হতে পারে। কিন্তু সাইকাস (Cycas) জাতের গাছে বেড়ে উঠতে পারে না। কিছু *Macrotermes malaccensis* প্রজাতির সৈন্য জাতের উঁই-পোকাকে আকারগত সুস্পষ্ট পার্থক্যের কারণে ভিন্ন গণ ও প্রজাতিভুক্ত করা হয়েছিল। পরে দেখা যায় এই পার্থক্য পরজীবী প্রভাবিত এবং পৃথক প্রজাতি বা গণ প্রতিষ্ঠা ভ্রান্ত।

প্রজন ঘনত্বের ভিত্তিতেও চারিত্রিক ভেদ দেখা দিতে পারে। সম্ভবত খাদ্যের পরিমাণগত পার্থক্য একটি কারণ। প্রজন ঘনত্বের পার্থক্যে স্বভাবগত পার্থক্যও অস্বাভাবিক নয়। Uverov, Kennedy, Albrecht প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দলবদ্ধ পঙ্গপালের (Gregarious locust) একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীদের আকার, বর্ণ ও স্বভাবের পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রজাতি প্রতিষ্ঠার ভ্রান্তি উল্লেখ করেন। দেখা যায় নতুন বাচ্চারা একসঙ্গে অনেকে ঘন বসতিতে বেড়ে উঠলে দলবদ্ধ স্বভাব পায়, পৃথকভাবে বেড়ে উঠলে পৃথক থাকার স্বভাব লাভ করে এবং মাঝারি ঘনত্বে বেড়ে উঠলে মাঝামাঝি স্বভাবের হয়।

পরিপার্শ্বের প্রভাবে স্নায়বিক বর্ণভেদ কিছু কিছু প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। এই ভেদ প্রধানত স্নায়বিক বিক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে। সাধারণত রঞ্জক দানার একত্রিত ও বিক্ষিপ্ত হবার ফলে বর্ণভেদ ঘটে থাকে।

আকস্মিক ঘটনা জনিত ভেদের বিষয়টি শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র মূল্যায়নে

লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ভ্রূণাবস্থায় কোন ব্যাঘাত, রূপান্তরের কোন দশার বিপর্যয় ইত্যাদি কারণ জনিত ভেদের দিকগুলি নজর রাখা দরকার।

লিঙ্গ সম্পর্কিত ভেদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বাহ্যিক এবং জন্মচক্র সম্পর্কিত ভেদের বিষয় শ্রেণীবিন্যাসে লক্ষ্য করতে হয়। বহু প্রজাতির ক্ষেত্রেই লিঙ্গ ভেদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। *Cynips* গণের অযৌন প্রজন্ম ও যৌন প্রজন্ম আকারগত দিকে এত পৃথক যে তাদের পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। Aphid-এর অপুংযোনি সম্ভূত ডানাহীন স্ত্রীরা যৌন প্রজন্মের ডানাযুক্ত স্ত্রীদের থেকে আকারগত দিকে যথেষ্ট পার্থক্যযুক্ত। এ ছাড়াও পার্থক্য দেখা যায় উভলিঙ্গধর ও নপুংসকদের ক্ষেত্রে।

লিঙ্গ সম্পর্কিত **ধারাবাহিক ভেদ** বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে হয় ব্যক্তিগত ভেদের পরিবর্তে প্রজনের ভেদের ভিত্তিতে। Melanea গণের শামুকের খোলসের কাঁটা ও আড়াআড়ি ভাঁজের ভিত্তিতে 114টি স্থাপিত প্রজাতির পুনর্মূল্যায়নে দেখা যায় এদের অনেকেই বহুনামিক (Synonymous) মাত্র, আসলে একটি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত।

বিরতিযুক্ত ভেদ অনেক সময় প্রকাশিত হয় বহুরূপতাযুক্ত প্রাণি-প্রজাতিতে। পাখি, গুবরেপোকা, প্রজাপতি, একনালীদেহী প্রভৃতির মধ্যে বহুরূপতার উদাহরণ অসংখ্য। এ বিষয়ে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী সচেতন না থাকলে বিভ্রাটের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

বিভিন্ন ভেদ সম্পর্কে যথার্থ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। প্রশ্ন দেখা দেয় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভেদের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে।

বিনিশ্চয় (প্রভেদক) গ্রিড (Discrimination Grid) ঃ

গুণগত ও পরিমাণগত ভেদের (Variation) ভিত্তিতে একাধিক রূপগোষ্ঠী (Phena) সম্পর্কে শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক সিদ্ধান্তে পৌঁছে সঠিক প্রজাতি বা উপ-প্রজাতিতে স্থাপন করতে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানিকে বিভিন্ন দিকে বিবেচনা করতে হয়। রূপগোষ্ঠী সম্পর্কে যত বেশী তথ্য জানা যায় কাজটি তত সহজ-সাধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। অধিকাংশ জীবের ক্ষেত্রে জীবনচক্র ও বাস্তু-সংস্থানিক কিছু বিষয় প্রজাতি নির্দিষ্ট থাকে। অনেক সময় একই প্রজাতি-ভুক্ত প্রাণীরা ভৌগোলিক বিস্তারণ, বসতি, লিঙ্গ, ঋতু প্রভৃতি জিন সম্পর্কিত ও জিন অসম্পর্কিত (Genetic & non-genetic) কারণ জনিত বহিরাকৃতি-

গত (Phenetic) ভেদের ফলে একাধিক রূপগোষ্ঠীর চেহারা নেয়। ভেদ প্রজাতি পর্যায়ের বা আন্তঃপ্রজাতি (Intraspecific) পর্যায়ের হতে পারে। রূপগোষ্ঠী একই অঞ্চলের বা বসতির হলে ভেদ একই প্রজাতির স্বতন্ত্র-অথবা পৃথক প্রজাতি পর্যায়ের গণ্য হবার যোগ্য কিনা তা ভেবে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জনন অন্তরণ (Reproductive isolation) বিষয়ক তথ্য পাবার কথাও ভাবতে হয়। এইসব বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীণ হয়ে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা বিনিশ্চয় গ্রিডের (Discrimination grid) সাহায্যে সমাধান খুঁজে পেতে চেয়েছেন।

আকারগতভাবে অনুরূপ ও পৃথক রূপগোষ্ঠীকে অভিন্নক্ষেত্রিক ও ভিন্ন-ক্ষেত্রিক (Sympatric & allopatric) ক্রমে এবং জননসূত্রে অন্তরিত নয় এবং অন্তরিত ভাগে সাজিয়ে নিতে পারলে রূপগোষ্ঠীর সঠিক স্থান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। Mayr (1969) অনুসারে বিনিশ্চয় গ্রিডের একটি নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

সারণী (2) বিনিশ্চয় গ্রিড (Discrimination grid)

	জননসূত্রে অন্তরিত নয় (Reproductively not isolated)	জননসূত্রে অন্তরিত (Reproductively isolated)
অনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট		
অভিন্নক্ষেত্রিক (Sympatric)	(1) একই প্রজন	(5) সিবলিং প্রজাতি
ভিন্নক্ষেত্রিক (Allopatric)	(2) একই উপ-প্রজাতি	(6) সিবলিং প্রজাতি
ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট		
অভিন্নক্ষেত্রিক (Sympatric)	(3) একই প্রজনের রূপগোষ্ঠী	(7) পৃথক প্রজাতি
ভিন্নক্ষেত্রিক (Allopatric)	(4) পৃথক উপ-প্রজাতি	(8) পৃথক প্রজাতি

রূপগোষ্ঠীর আকারগত পার্থক্য বা ভৌগোলিক সম্পর্কবিষয়ক তথ্য পাওয়া অসুবিধা জনক নয়। কিন্তু জনন অন্তরণ বিষয়ক তথ্য পাওয়া সম্বন্ধে অনেক সময়ই সমস্যা দেখা দেয়। জীবাশ্মসহ বেশ কিছু জীবের ক্ষেত্রে জনন অন্তরণ বিষয়ক তথ্য যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সে অবস্থায় উল্লিখিত গ্রিডের (1) অথবা (5), (2) অথবা (6), (3) অথবা (7) এবং (4) অথবা (8) এই প্রত্যেক জোড়ার কোন একটি বেছে নিতে সমস্যা দেখা দয়। এ অবস্থায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী অসহায় বোধ না করে ভেদের বিভিন্ন দিকের বিচারে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

চারিত্রিক ভেদের রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও উপযোগিতা

জীব জগতের অসীম বৈচিত্র্য ও ভেদের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে জীবদের শ্রেণীবিভাগ, ফলে স্থাপিত হয়েছে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান। শ্রেণীবিভাগে চারিত্রিক গুণগত দিকটাই প্রধানত বিবেচিত হয়েছে। চরিত্রের পরিমাণগত দিকটার মূল্যায়ন প্রায় হয়নি। কিন্তু চরিত্রের পরিমাণগত মূল্যায়নে ভেদ বিষয়ক অনেকটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয়। 'দাঁতযুক্ত চোয়াল' এবং 'পাঁচটি দাঁতযুক্ত চোয়াল' এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে পরবর্তী বক্তব্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত ভেদের পরিমাণগত মূল্যায়নের সুযোগ অনেক বেশী। ভেদের পরিমাণগত মূল্যায়নের মাধ্যমে যথাসম্ভব সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবার ঝোঁক বর্তমানে যথেষ্ট বেড়েছে। ভেদের পরিমাণগত বিশ্লেষণ সাধারণত রাশিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সাধারণত বিবরণের সঠিক পর্যায়ে পৌছতে সাহায্য করে এবং অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বিবরণের পরিবর্তে স্বল্প পরিসরে চরিত্রের যথার্থ প্রতিফলন করতে পারে। তবে শ্রেণীবিন্যাসে রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোন ক্ষেত্রে সহায়ক না হয়ে অপ্রয়োজনীয় হলে বোঝা না বাড়ানোই শ্রেয়। রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সব প্রশ্নের জবাব যোগাবে এতটা ভাবা ঠিক হবে না। তবে এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য বেরিয়ে আসা স্বাভাবিক।

যে কোন রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষে নমুনা (Sample) পরীক্ষা পদ্ধতিই অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়। প্রজনের বা প্রজনের ভেদের রাশি-

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নমুনা ভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে এগুতে হয়। সুতরাং নমুনা নিরূপণ সমজাতীক, সমধর্মী এবং পক্ষপাতশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে অসমধর্মী নমুনাকে বয়স, লিঙ্গ, বাসস্থান ইত্যাদি ভিত্তিতে কতগুলি সমধর্মী ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। নমুনার সংশ্লিষ্ট চারিত্রিক ভেদ ও প্রজনের চারিত্রিক ভেদের পরিসংখ্যা একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। নমুনা প্রজনের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া দরকার এবং অস্বাভাবিক ধরনের না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নমুনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বিভিন্ন ভেদযুক্ত উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়, তবে সবক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য না হতে পারে, যেমন উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের বেলায় একটি নমুনাও যথেষ্ট মনে হতে পারে যদি তাতেই সন্দেহাতীত হওয়া যায়। আবার শুধু সংখ্যাই নয়, যদি কোন লিঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক প্রতিফলন না থাকে সেই লিঙ্গের যথেষ্ট সংখ্যাও পর্যাপ্ত মনে হবে না। এইসব কারণে নমুনা সংগ্রহ বিভিন্ন পন্থায়, ঋতুতে ও অবস্থায় করলে অনেকটা ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব। বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ করার পক্ষে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত চরিত্রের বা চারিত্রিক ভেদের রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সহায়ক হয়। তবে সহায়ক নয় এ রকম ক্ষেত্রে অকারণ পরিসংখ্যার বোঝা না বাড়ানোই শ্রেয়। অনেক সময় আপেক্ষিক পরিমাণ (Relative measurement) অনেকটা সঠিক তথ্য পরিবেশনে সমর্থ। দৈর্ঘ্য প্রস্থের কতগুণ বা কোন উপাঙ্গের কোন অংশ সেই উপাঙ্গের বা দেহের বা মস্তকের কত ভগ্নাংশ বা কত গুণ ইত্যাদি শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ উল্লেখের তুলনায় অনেক বেশী অর্থবহ।

প্রাণিপ্রজনের রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একটি মাত্র চারিত্রিক ভেদ (univariable) বিবেচ্য হলে মধ্যক (Mean) M, মোট ভেদমাত্রা (Total variance) V অথবা চলের বর্গমূল বা প্রামাণ্য চ্যুতি (Standard deviation) SD এই মূল্যগুলো জানা থাকলে অধিকাংশ বিশ্লেষণ সম্ভব।

কোন প্রজনের প্রাণীদের অধিকাংশ চারিত্রিক দিকগুলো বহুসংখ্যক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বেশ কিছু সংখ্যক জিন কোন চরিত্রকে (যথা দৈর্ঘ্য) একদিকে পরিচালিত করে এবং প্রায় সমসংখ্যক জিন তার বিপরীত দিকে পরিচালিত করে। ফলে প্রজনের অধিকাংশ প্রাণীই চারিত্রিক দিক থেকে মধ্যম মানের (Mean Value) কাছাকাছি থাকে। এই কারণেই প্রজনের বেশীর ভাগ নমুনার চারিত্রিক মান সারণীতে বসালে প্রায়শই অভিলম্ব বক্র-

রেখার (Normal curve) আকার নেয়।

প্রামাণ্য চ্যুতি (Srandard deviation) ভেদ পরিমাপের একটি সহায়ক উপায়। ভেদের পরিমাণ যত বেশী হবে প্রামাণ্য চ্যুতিও তত বেশী হবে। প্রামাণ্য চ্যুতির ধারণার মাধ্যমে ভেদের ধারণা পাওয়া সম্ভব। রাশিতত্ত্বের সাহায্যে সহজেই প্রামাণ্য চ্যুতি নির্ণয় সম্ভব। প্রামাণ্য চ্যুতি বাড়লে বা কমলে প্রজন শতাংশও লক্ষণীয় ভাবে বাড়ে বা কমে। যথা—

$M \pm 1$ SD. প্রজনের 68·27% অন্তর্ভুক্ত হয়।

$M \pm 2$ SD. „ 95·45% „ „ ।

$M \pm 3$ SD. „ 99·35% „ „ ।

চলের সহগ/গুণক (Co-efficient of variability) ঃ

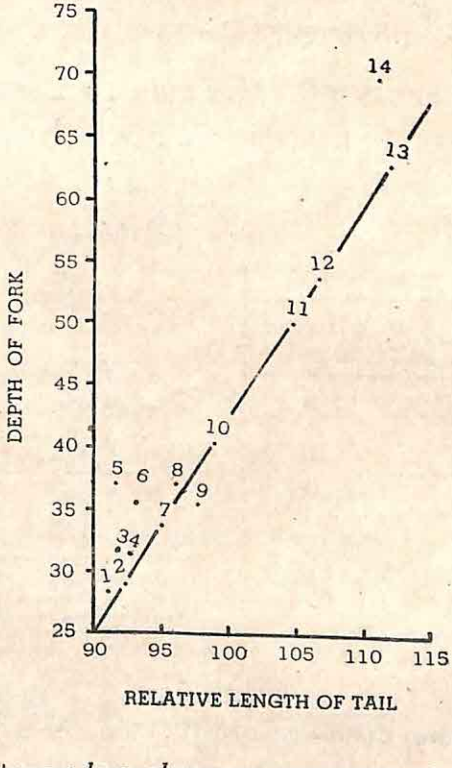
প্রামাণ্য চ্যুতির আঙ্কিক মান অর্থবহ হয় একই নমুনার মাধ্যমিক মানের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে। কোন নমুনার মাধ্যমিক মান 120 এবং প্রামাণ্য চ্যুতি 2 হলে চলের মূল্য নিতান্তই কম। কিন্তু একই প্রামাণ্য চ্যুতিযুক্ত প্রজনের মধ্যক 8 হলে চলের মান হবে যথেষ্ট বেশী। এই কারণে বিভিন্ন প্রজাতি বা প্রজনের চলের মাত্রার তুলনার উদ্দেশ্যে চলের সহগ CV নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। চলের সহগ পাওয়া যায় মধ্যক মানের শতাংশ হিসেবে ঃ

$$CV = \frac{SD \times 100}{M} \text{ অর্থাৎ চলের সহগ} = \frac{\text{প্রামাণ্য চ্যুতি} \times 100}{\text{মধ্যক}} ।$$

কোন ট্যাক্সার (গোষ্ঠীর) বা প্রজনের পরিমাপযোগ্য চারিত্রিক দিকের বিশ্লেষণে CV সহায়ক। CV-এর মান সংখ্যা, রৈখিক মান, অনুপাত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে পৃথক হয়। কোন নমুনার সমসত্ত্বতা (Homogeneity) নির্ধারণে CV একটি সূক্ষ্ম নির্দেশকের কাজ করে। ধরা যাক কোন নমুনাগুচ্ছের CV-র মান 4·5 কিন্তু সেই নমুনাগুচ্ছের কোন একটি নমুনার মান 9·2 ; এ অবস্থায় নমুনা বাছাই জনিত বয়স, লিঙ্গ, সমাকার প্রজাতি প্রভৃতি ত্রুটির কথা পুনরায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হবে। CV'র ব্যবহারের অনেক সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন CV মূল্যের তুলনামূলক রাশি-তাত্ত্বিক পদ্ধতি না থাকায় অনেকের ন্যায় Leontin (1966) পরিমাপের CV'-র পরিবর্তে ভেদমানের (Variance) বা প্রামাণ্য চ্যুতির লগ (log) মূল্যের ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। যে সব ক্ষেত্রে CV-র মূল্য 30-এর কম থাকে (শ্রেণীবিন্যাসে ব্যবহৃত অধিকাংশ স্থলেই CV-র মূল্য 30-এর

কম থাকে) সেখানে CV-র বর্গ সাধারণ লগের (Normal logarithms) ভেদমানের সমান হয় এবং রাশিতাত্ত্বিক এই সহজতর পদ্ধতিটির ব্যবহার অনেকে পছন্দ করেন। একই প্রজাতির বিভিন্ন আঞ্চলিক তুল্য নমুনার বা একই নমুনার বিভিন্ন রকমের (Varieties) চলের পর্যালোচনায় CV মূল্যায়ন যথেষ্ট উপযোগী।

যে সব প্রাণিদলে প্রাপ্ত বয়সের পরে আর বৃদ্ধি ঘটে না (স্তন্যপায়ী, পক্ষী, পতঙ্গ ইত্যাদি অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়) তাদের দেহের বা দেহাংশের রৈখিক পরিমাপের CV-র মূল্য সাধারণত খুব কম হয়। কোন ক্ষেত্রেই 1 থেকে 10-এর বেশী হয় না। ফলে রৈখিক পরিমাপের



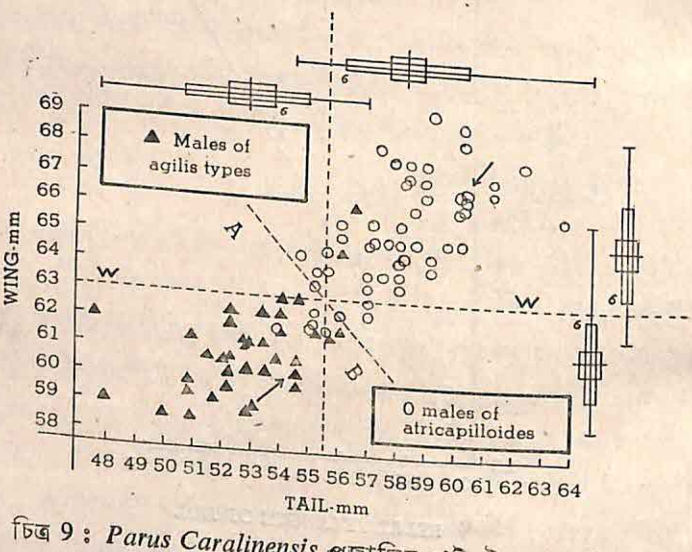
চিত্র: 8 : *Dicrurus leucophaeus*-এর লেজের খাঁজ বৃদ্ধি ও লেজের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের সম্পর্ক ; 14টি উপ-প্রজাতির প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নমুনা দেখান হয়েছে (Mayr and Vaurie, 1948 অনুসারে)।

CV-র মূল্য কার্যকরী হয়। কিন্তু কিছু কিছু প্রাণী (সাপ ও মাছ) যাদের দেহের বৃদ্ধি সারাজীবন ধরে ঘটে তাদের ক্ষেত্রে রৈখিক পরিমাপের CV-র মূল্য অর্থহীন। এক্ষেত্রে বহুমুখী চলের (Multivariant) বিশ্লেষণ কার্যকরী। প্রাণীদের কিছু কিছু সাংখ্যিক চরিত্র ভেদহীন থাকে আবার কোথাও ভেদ-যুক্তও হতে পারে যেমন আঁশের সংখ্যা ইত্যাদি।

শ্রেণীবিন্যাসে প্রাণিউপাদানের কোন একটি চারিত্রিক দিকের রৈখিক পরিমাপের তুলনায় চেহারার ধারণা বেশী প্রয়োজনীয়। সেই কারণে বিভিন্ন অংশের অনুপাত অধিক তথ্যবহ। এই অনুপাত সাধারণত বৃহত্তর মূল্যের শতাংশ হিসেবে ক্ষুদ্রতর মূল্যে প্রকাশ করা হয়ঃ

$$R = \frac{S \times 100}{L}$$, R = অনুপাত, S = ক্ষুদ্রতর মান, L = বৃহত্তর মান।

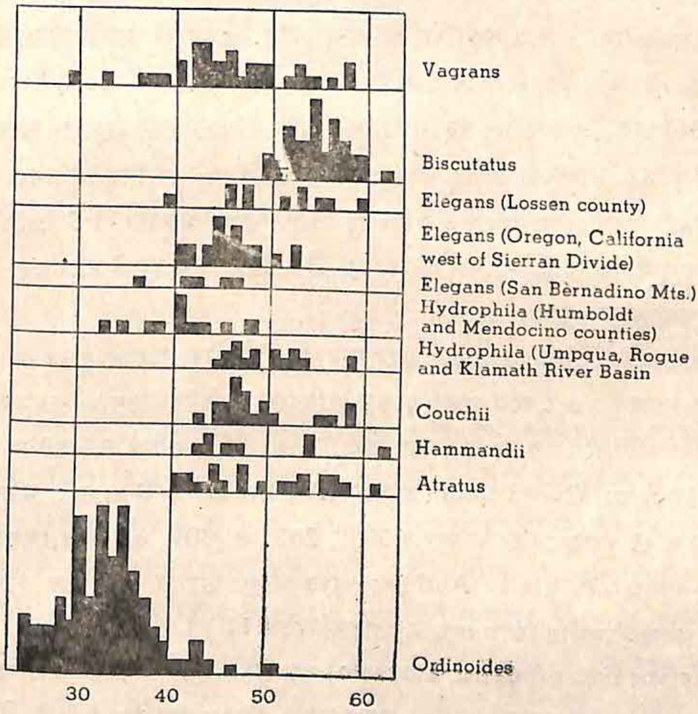
কদাচিৎ R 100-এর কাছাকাছি বা বেশী হলেও S ও L-এর স্থান পরিবর্তিত হবে না। যেমন S : L মাথার দৈর্ঘ্য : দেহের দৈর্ঘ্য, লেজের দৈর্ঘ্য



চিত্র 9 : *Parus Caralinensis* প্রজাতির দু'টি উপ-প্রজাতি ডানা ও লেজের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে পৃথক করা দেখান হয়েছে। A = agilis, O = articapilloides ; A B পৃথকীকরণের রেখা (Lurk, 1952 থেকে)।

ইত্যাদি অনুপাতকে বিভিন্ন ধরনের চিত্রে প্রকাশ করার পদ্ধতি প্রচলিত

হয়েছে। সহজ একটি পদ্ধতিতে অনুপাত প্রকাশ করা হয়—একটি পরিমাপ ভুজ ও অন্যটি কোটি মানে বসিয়ে। তবে যে চরিত্রের পরিমাপের অনুপাত নিরূপণ করা হবে তার কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা এবং কোন চরিত্র অসম বৃদ্ধি জনিত (Allometric growth) কিনা লক্ষ্য করা দরকার। সে সব অবস্থায় অনুপাত বিশেষ উপযোগী হয় না। এ অবস্থায় বরং প্রত্যাবৃত্তি বিশ্লেষণ (Regressive analysis) সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে একাধিক চলের মূল্যায়নে বহুমুখী বিশ্লেষণ উপযোগী। সাংখ্যিক তথ্যচিত্রে প্রকাশ করার প্রধান উপযোগিতা এক নজরে অনেক বেশী সঠিক তথ্য বোঝা ও বোঝানর সম্ভাবনা। চিত্র 8 এবং 9এ যথাক্রমে আনুপাতিক হার ও একাধিক চরিত্র প্রকাশের তথ্যচিত্রের নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে।



চিত্র 10 : *Thamnophis Ordinoides*-এর মাথা ও দেহের দৈর্ঘ্যের আয়তচিত্র। প্রতিটি চতুষ্কোণ এক একটি প্রাণি-উপাদানের প্রতিফলন (Fitch, 1940 অনুসারে)।

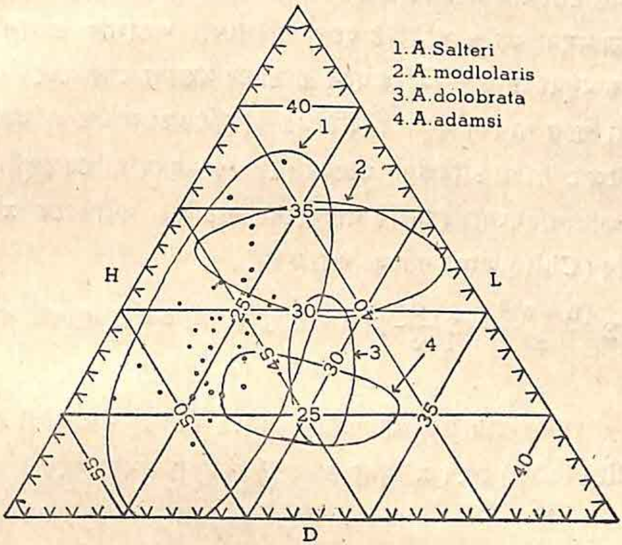
লেখাচিত্রে পরিমাণগত চারিত্রিক বা অন্যান্য বিষয়কে প্রকাশের অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য **আয়তচিত্র** (Histogram)। নমুনার সাংখ্যিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে এই চিত্রে প্রকাশ করা যায়। এই চিত্রে শ্রেণী অন্তর (Class intervals) কোটি মানে এবং শ্রেণী পরিসংখ্যা (Class frequency) ভুজ মানে সাজান হয়। এই চিত্রের প্রধান উপযোগিতা নমুনার সংখ্যার পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা যায়। সাংখ্যিক অপরিবর্তনীয়তার ফলে পরবর্তী গবেষকরা সহজেই অন্য যে কোন রাশিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চালাতে পারেন। এ ছাড়াও একাধিক প্রজনের একাধিক আয়ত চিত্র পাশাপাশি বসিয়ে তুলনা সম্ভব (চিত্র 10)।

প্রজন রাশিতাত্ত্বিক চিত্রের সাহায্যে স্বল্প পরিসরে প্রজনের বিস্তৃতি, সাধারণ মধ্যক, এক বা একাধিক প্রামাণ্য চ্যুতি, প্রামাণ্য ভ্রান্তি ইত্যাদির উপস্থাপন করে অনেক বেশী তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব। Dice ও Leraas (1936) প্রবর্তিত পদ্ধতির বহু সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানে নমুনার আকার একটি দণ্ডের সাহায্যে প্রকাশ করে প্রামাণ্য ভ্রান্তিকে মধ্যকের বিশ্বাসযোগ্য সীমার 95% দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয় এবং তুল্য নমুনার 1·5 প্রামাণ্য চ্যুতির অনধিক্রমণ উপ-প্রজাতি স্তরে পৃথকীকরণের পক্ষে যথেষ্ট মাত্রারপার্থক্য বলে গণ্য হতে পারে।

প্রজনের তিনটি চরিত্র পর্যালোচনায় ত্রিভুজীয় চিত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তে চারিত্রিক গুণাগুণের সমষ্টির শতকরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক চরিত্র A = 80 m.m, B = 32 m.m, C = 48 m.m ; সুতরাং A + B + C = 160 m.m ; অতএব A, B ও C যথাক্রমে যোগ ফলের 50%, 20% ও 30% এই শতাংশগুলো চিত্রে স্থাপন করা যায়। Anthracomys গণের চারটি প্রজাতির তিনটি করে চরিত্র ত্রিভুজীয় চিত্রে দেখান হয়েছে (চিত্র 11)।

বিক্ষিপ্ত চিত্রের (Scatter diagram) সাহায্যে দুটি চরিত্রের প্রেক্ষিতে দুই বা ততোধিক প্রজনের পার্থক্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই চিত্রে একটি চরিত্র ভুজ ও অন্যটি কোটি মানে সাজালে উভয় চরিত্রের একটি ছেদ বিন্দু পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রজনে এই চিত্রে পৃথক সংকেত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিক্ষিপ্ত চিত্রের অনেক সুবিধার মধ্যে বিষম সম্পর্ক

(Allometric relationship) বোঝা ও প্রত্যাবৃত্তি রেখা স্থাপন এবং কখনো কখনো পরিমাপ বা লিঙ্গ বিষয়ক ভ্রান্তি স্পষ্ট হওয়া সম্ভব, যেগুলো অন্যত্র নজরে আসে না।



চিত্র 11 : *Anthracomys* গণের চারটি প্রজাতির দৈর্ঘ্য (L), উচ্চতা (H) ও সর্বোচ্চ নিম্ন খাঁজের দূরত্বের (D) ত্রিভূজীয় চিত্র (Burma, 1948 অনুসারে)।

পরিমাণগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ভিত্তিক প্রজনের ভৌগোলিক সম্পর্ক চিত্রে প্রকাশ করা যায়। আকার ইত্যাদি ধারাবাহিক চরিত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজনের মধ্যক সাধারণত চিত্রের ভুজ রেখায় প্রকাশ পদ্ধতি প্রচলিত এবং নিয়মিত থাকলে সমচারিত্রিক রেখা (Isophenis) পাওয়া সম্ভব, যে রেখায় চরিত্রের সমান প্রকাশ বিন্দুগুলো থাকে। ধরা যাক একসারি প্রজনের মধ্যক 142 থেকে 187-এর মধ্যে থাকে সে অবস্থায় 140, 150, 160, 170, 180, 190-এর সমচারিত্রিক রেখা স্থাপন সহজ হয়। যেখানে এই সমচারিত্রিক রেখা গভীর খাঁজযুক্ত হয় সেই সীমাকে উপপ্রজাতির সীমারেখা হিসেবে অনেক সময় ধরা হয়। বহুজাতিরূপী প্রাণিপ্রজাতি পরিসংখ্যা চিত্রে প্রকাশ করার পক্ষে পাই-চিত্র (pie-graph) সর্বাপেক্ষা সহায়ক ভাবা হয়।

রাশি শাস্ত্রে দুটি নমুনার ভেদ **গুরুত্বপূর্ণ** (significant) কিনা তা বোঝার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিকে **t-**পরীক্ষা (t-test) বলা হয়।

বহুচলযুক্ত অনুরূপ পরীক্ষাকে t^2-পরীক্ষা (t^2-test) বলা হয়। দুটি চরিত্র বা অন্য ভেদমান পরিসংখ্যা দুই বা ততোধিক প্রজনে একই কিনা ঠিক করার ক্ষেত্রে নমুনা বড় ও অনির্দিষ্ট হলে পরিসংখ্যা শতাংশে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু নমুনা ছোট ও নির্দিষ্ট হলে প্রান্তভেদ সম্ভাব্য ভেদ থেকে পৃথক কিনা অথবা প্রান্ত পার্থক্য নমুনা নির্বাচনের আঞ্চলিকতা জনিত বা কদাচিত ইত্যাদি খুঁজে দেখা স্বাভাবিক। ভেদের পরিমাণ অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ কিনা নমুনা পরীক্ষার পরিসংখ্যা ইত্যাদি পরিমাপের প্রচলিত পরীক্ষাকে x^2 বা কাইস্কোয়ার (Chisquare) পরীক্ষা বলা হয়।

$x^2 = \Sigma \frac{(n-e)^2}{e} = \Sigma \frac{d^2}{e}$; n = প্রাপ্ত সংখ্যা, e = প্রত্যাশিত সংখ্যা, d = চ্যুতি।

রাশি শাস্ত্রের প্রারম্ভিক যে কোন বইয়ে দেওয়া সম্ভাব্যতা সারণী (Probability table) দেখে x^2 মূল্য গুরুত্বপূর্ণ কিনা ঠিক করা সহজ।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক সংগ্রহ ও সনাক্তকরণ

প্রাণী শ্রেণীবিভাগ মূলত প্রাণিপ্রজন ও প্রজাতি প্রতিফলিত করে। প্রাণীদের চরিত্র বিশেষত প্রজাতির বিশিষ্ট চরিত্র নির্ধারণ করা হয় প্রধানত নিকটবর্তী এবং সম্ভাব্যস্থলে নিকটাত্মীয় প্রজাতির চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই কারণেই শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সংগ্রহ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর পক্ষে প্রয়োজন। সংগ্রহ পাবার প্রধান দুটি উপায় —নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ গড়ে তোলা কিংবা সংগ্রহশালা থেকে সাময়িক ভিত্তিতে ধার নেওয়া বা সংগ্রহশালার প্রাণিসম্ভারের সাহায্য নেওয়া। যেহেতু বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহশালার প্রাণিউপাদান যথেষ্টভাবে যোগাতে অসমর্থ সেই দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত প্রাণি-উপাদানের সংগ্রহ অনেক বেশী তথ্য যোগাতে সমর্থ। এছাড়া বহুকাল ও স্থানব্যাপী সংগৃহীত প্রাণিসম্ভার কোন একজনের পক্ষে আয়ত্তে আনা বেশ সময় সাপেক্ষ।

প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগৃহীত উপাদান বেশী তথ্যবহ হলেও সংগ্রহ-শালার গুরুত্ব বিভিন্ন দিক থেকে অপরিসীম। সংগ্রহশালার সংগ্রহই বিভিন্ন স্থান ও কালের প্রাণিপ্রজনের সাক্ষ্য বহন করে। কোন কোন স্থানের প্রাণি-প্রজাতি হয়তো লোপ পেয়ে গেছে কিন্তু সংগ্রহশালা বহন করে সেই প্রজনের অবস্থিতি। কোন কোন প্রজাতি কালের স্রোতে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে অথবা মানবসভ্যতা ও জনবৃদ্ধির চাপে এবং অন্যান্য কারণে লোপ পেয়ে থাকতে পারে সে সব ক্ষেত্রেও সংগ্রহশালা কালের ও স্থানের লোপ পাওয়া প্রাণীদের সাক্ষ্য বহন করে। সংগ্রহশালার সংগ্রহ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের বাইরেও প্রাণীদের আবির্ভাব, পার্থিব অবস্থিতি, পরিবেশ বিষয়ক সিদ্ধান্ত ও প্রাণিবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় সাহায্য করে। সংগ্রহশালার সংগ্রহকে আপাতদৃষ্টিতে সুপ্ত বা মূল্যহীন মনে হলেও যে কোন সময় এরা অমূল্য রতন হয়ে উঠতে পারে।

সংগ্রহের ক্ষেত্র ঃ সংগ্রহের ক্ষেত্র কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সাধারণত সংগ্রহের উদ্দেশ্য বা গবেষণার বিষয়ের উপর। যদি কোন অঞ্চলের প্রাণিকূল সমীক্ষা (Faunal Survey) করার উদ্দেশ্য থাকে সে ক্ষেত্রে অঞ্চলের রাজনৈতিক সীমারেখার পরিবর্তে ভৌগোলিক সীমারেখাই সংগ্রহের ক্ষেত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার যদি ভৌগোলিক কারণজনিত প্রাণি প্রজাতির ভেদ পর্যালোচনা বা গবেষণার প্রধান বিষয় হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রজাতির বিস্তৃতির প্রান্তসীমার দিকেই প্রধানত জোর দেওয়া দরকার, কারণ এই জায়গাগুলোতেই ভৌগোলিক অন্তরিত (Geographical isolate) এবং উপক্রান্ত (Incipient) নতুন প্রজাতি থাকার সম্ভাবনা বেশী। গবেষণার বিষয় ঋতুজনিত পার্থক্য বিশেষত আচরণগত বিষয় হলে সে ক্ষেত্রে সংগ্রহের ক্ষেত্রের সঙ্গে ঋতু বা সময় বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

সংগ্রহক্ষেত্র বিষয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংগ্রহ অভিযান স্বরু করার আগেই জেনে নেওয়া আবশ্যক ; যেমন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, উদ্ভিদসম্ভারের গঠন, ঋতুবিষয়ক তথ্য, যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলের পূর্বে সংগৃহীত প্রাণিসম্ভারের ভিত্তিতে সংগ্রহের নমুনা প্রাণীর সংগ্রহ স্থল (Type locality) সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলে সেই ভিত্তিতে তাৎপর্য্যপূর্ণ সংগ্রহের শূন্যস্থল (Crucial gap)-গুলোও ঠিক করে নেওয়া সম্ভব।

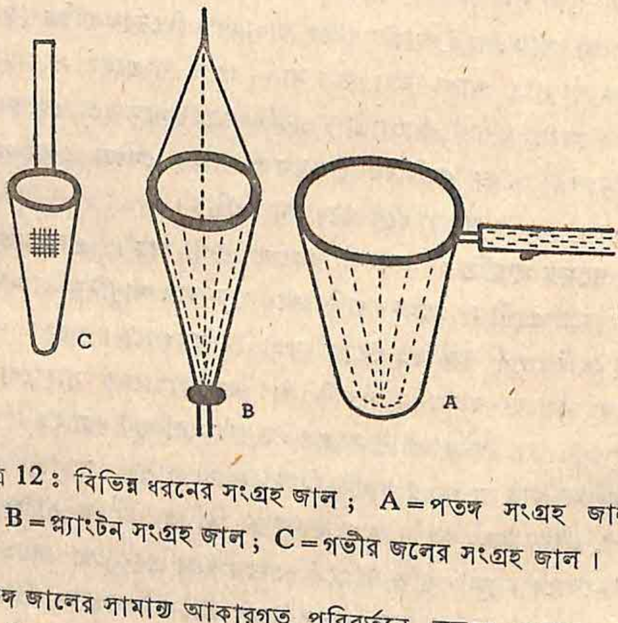
সংগ্রহের ধরন ও পদ্ধতি ঃ সংগ্রহের ধরন কি হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বর্তমান। পুরোনো একটি মতানুযায়ী সংগ্রহ হবে নমুনা বা জাতিরূপ ভিত্তিক (Typological)। এই মতে সংগ্রহের মূল্যায়ন হয় কেবলমাত্র সনাক্তকরণের দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টিতে সনাক্ত প্রজাতির একটি জাতিরূপ প্রাণিউপাদান (Type specimen) সংগৃহীত থাকাই যথেষ্ট। নমুনা প্রাণীর অতিরিক্ত প্রাণিউপাদান (Specimen) সংগ্রহে থাকলেও তাদের গুরুত্বহীন ভাবা হয় এবং প্রায়শই অতিরিক্ত হিসাবে বিনিময়ের কাজে ব্যবহার করা হয় অথবা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র জাতিরূপ প্রাণীটিই সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংগ্রহটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। তবে একই ধরনের অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় প্রাণীর গুদাম

গড়ে তোলাও বাঞ্ছনীয় নয়। আদর্শ সংগ্রহ প্রজনকে প্রতিফলিত করবে। প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণিউপাদানে বর্তমান সুস্পষ্ট পার্থক্যের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রাণিউপাদানের সংগ্রহ থাকা কাম্য। প্রজাতির ভৌগোলিক ভেদজনিত উপপ্রজাতি পর্যায়ে গণ্য হবার উপযোগী পার্থক্যযুক্ত প্রাণী অথবা বহুরূপতা (Polymorphism) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যেসব পার্থক্য দেখা যায় সেগুলো সংগ্রহে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আদর্শস্থানীয় সংগ্রহে প্রাণিউপাদানের সংখ্যা কি হবে তা প্রধানত নির্ভর করবে কোন্ প্রাণীর কোন্ ধরনের চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ তারই উপর। সাধারণভাবে মনে করা হয় উচ্চতর প্রাণীদের নির্দেশক চরিত্রের পরিস্ফুটন সম্পূর্ণ এবং সেই চরিত্রের উপাদান প্রাণীটিতে অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়, যেমন পাখির পালক। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রাণী যেমন পতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদির দেহে সাধারণত নির্দেশক চরিত্র (জননঅঙ্গ) একাধিক সংখ্যায় আশা করা যায় না। ফলে সংগ্রহের সংখ্যা উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে (পক্ষী স্তন্যপায়ী) একটিও যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। কিন্তু নিম্নতর স্তরের প্রাণীদের (পতঙ্গ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে একাধিক হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সংখ্যা হবে প্রয়োজন ভিত্তিক।

সংগ্রহের পদ্ধতি : অসংখ্য রকমের দেখা যায়। প্রাচীনতম হাতে ধরে বা ঘিরে প্রাণী সংগ্রহের পদ্ধতি থেকে সুরু করে আধুনিক কালের বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব পদ্ধতিতে জাহাজে মাছধরা বা খনন পদ্ধতি বা উড়োজাহাজের সাহায্যে বিশেষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন উচ্চতর প্রাণী সংগ্রহ ইত্যাদি সবকিছুই ধরা হয়। সহজেই অনুমান করা যায় সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ভর করবে প্রাণীর আকার, বাসস্থান, পরিবেশ, জীবনচক্র, আচরণগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রয়োজনবোধে নতুন পদ্ধতি সংগ্রহে সহায়ক হলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে বহুতর সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রাণিজগতে সন্ধিপদ, বিশেষত পতঙ্গের জাতিরূপের ও একই জাতিরূপে সংখ্যাধিক্য, স্বভাব, বসতি, জীবনচক্র ইত্যাদির বৈচিত্র্য সংগ্রহ পদ্ধতির বৈচিত্র্য সমানভাবে বাড়িয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সংগ্রহ সুরু করার আগেই ঐ প্রাণিদল বিষয়ক তথ্য জানা দরকার। একথা পতঙ্গের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। কোন ক্ষেত্রে হাতে বা আঙ্গুলের সাহায্যে কয়েকটি প্রাণী সংগ্রহ যথেষ্ট হতে পারে। সংগ্রহের অন্যান্য

পদ্ধতির মধ্যে পতঙ্গ জাল ঝেড়ে সংগ্রহ, নিচে কাপড় বা ছাতা ধরে ঝোপ বা গাছের ডাল ঝাড়া, বিষ-বোতল ব্যবহার করা, বিভিন্ন টোপ বা ফাঁদের ব্যবহার ইত্যাদি করা হয়ে থাকে।

পতঙ্গ জাল ঃ সাধারণতঃ হাতলযুক্ত গোলাকার বলয়ের সঙ্গে ব্যবহার-যোগ্য বিভিন্ন আকারের ছিদ্রযুক্ত জাল লাগান হয়। জালের আকার ও প্রকৃতি ভেদে বায়ুচর, ভূপৃষ্ঠস্থ বা জলচর পতঙ্গ বা অন্যকিছু প্রাণীকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পতঙ্গ জালে ঝেড়ে তোলার (Sweeping) পদ্ধতিতে মাঝে মাঝেই সংগ্রহ তুলে নিতে হয়, অন্যথায় সংগৃহীত প্রাণীদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে (চিত্র 12-A)।



চিত্র 12 ঃ বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহ জাল ; A = পতঙ্গ সংগ্রহ জাল ; B = প্ল্যাংটন সংগ্রহ জাল ; C = গভীর জলের সংগ্রহ জাল।

পতঙ্গ জালের সামান্য আকারগত পরিবর্তনে জলচর পতঙ্গ ও অন্যান্য কিছু প্রাণী সংগ্রহ বা প্ল্যাংটন সংগ্রহের উপযোগী জাল তৈরী হয়ে থাকে (চিত্র12-B)।

গভীর জলে সংগ্রহ করার জালও কিছুটা পরিবর্তিত চেহারায় পাওয়া যায় (চিত্র 12-C)।

বিষ-বোতল (Poison/Killing bottles) ঃ প্রধানত পতঙ্গ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খুব কম সময়ে পতঙ্গের বর্ণ,

আকার, আঁশ ইত্যাদির ক্ষতি না ঘটিয়ে বা কম ঘটিয়ে পতঙ্গকে তৎক্ষণাৎ বা খুব কম সময়ে মেরে ফেলতে পারার মত রাসায়নিক উপাদানকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিষ-বোতল বলতে প্রথমেই **সায়ানাইড বোতলের** (Cyanide Bottle) কথা মনে আসে। একটি প্রশস্ত মুখযুক্ত মোটা কাঁচের ঢাকনাসহ বড় বোতলের তলায় প্রায় 10 mm. পুরু পটাসিয়াম সায়া-নাইডের গুঁড়ো নিয়ে তার উপর 1.5 থেকে 2 cm. পুরু প্লাষ্টার অব পেরিসের গুঁড়ো নিয়ে তাতে চার বা পাঁচ ফোঁটা জল দেওয়া হয়। এর উপরে জলমেশান প্লাষ্টার অব পেরিসের একটি 10 mm. পুরু স্তর জমানো হয়। 20 থেকে 30 ঘণ্টা বোতলের মুখ খোলা রাখা হয় যাতে প্লাষ্টার পুরোপুরি শুকনো হতে পারে। এই স্তরের উপর ব্লটিং কাগজ দেওয়া হয় সায়ানাইড নিঃসৃত বাষ্প শোষণ ও পতঙ্গের মরণ উপাদানের সঙ্গে সরাসরি স্পর্শ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

অন্যান্য মারণ বোতল বা টিউব : সায়ানাইডের তুলনায় কম মারাত্মক যে উপাদানগুলো সাধারণত পতঙ্গ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের মধ্যে ইথাইল এসিটেট (Ethyl Acetate), টেট্রাক্লারো ইথেন (Tetrachloro ethane), কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon tetrachloride), ইথার (Ether), ক্লোরোফর্ম (Chloroform), বেনজিন (Bengene), ইথাইল ডাইক্লোরাইড (Ethyl dichloride) প্রভৃতি উল্লেখ্য। এই সব রাসায়নিক মারণ উপাদান বোতলে বা টিউবে ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ উপাদানকে তুলোয় ভিজিয়ে বোতল বা টিউবের তলায় নিয়ে তার উপর ব্লটিং কাগজ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে সংগ্রহের প্রাণিউপাদান রাসায়নিক উপাদানের সরাসরি সংযোগে না আসে। এদের মধ্যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা ইথার প্রাণিউপাদানকে সায়ানাইডের মতই শক্ত ও ভঙ্গুর করে তোলে। ইথাইল ডাইক্লোরাইড অনেক সময়ই প্রাণীর রং নষ্ট করে। এসব দিক থেকে টেট্রাক্লোরো ইথেন অনেকটা সুবিধাজনক।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিনের শেষে বিষের বোতল বা টিউবের প্রাণি-সংগ্রহকে বোতল থেকে তুলে নিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিষের বোতলের কার্যকারিতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় কয়েক ফোঁটা ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ বোতলের ব্লটিং কাগজের উপর যোগ করা যেতে পারে। বোতলে অল্পসংখ্যক প্রাণী থাকলে এবং তাদের বিস্তারের প্রয়োজন না

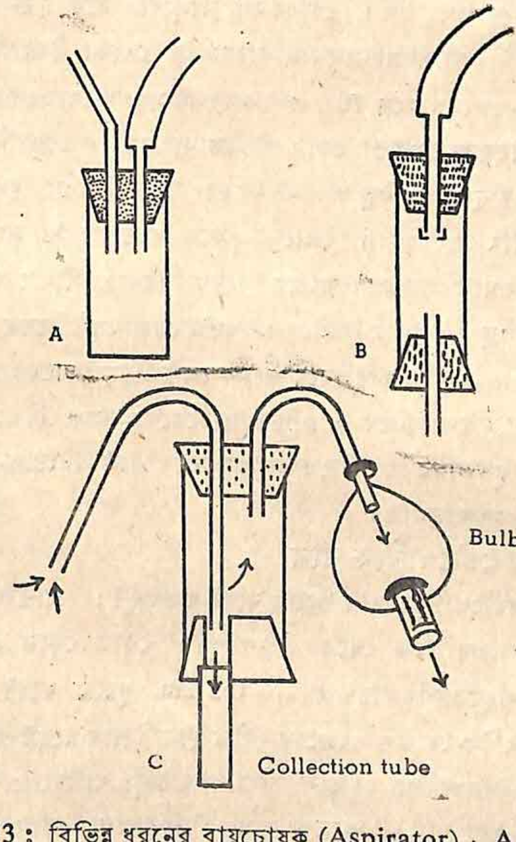
থাকলে কয়েকদিন বোতলে রেখে তারপর পিন করা যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন অনেকগুলো এবং বিভিন্ন রকমের প্রাণী একই বোতলে খুব বেশী সময় থাকার কিছু অসুবিধাও আছে। বড় প্রাণী ছোট প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে। কোন কোন পোকা কিছু কিছু নিঃস্রাবণ ছাড়ে যাতে অন্যের ক্ষতি হতে পারে। মথ-প্রজাপতি অন্যের সঙ্গে থাকলে আঁশ বা লোমে অন্য সংগ্রহের ক্ষতি করতে পারে।

আলোক-ফাঁদ (Light trap) : পতঙ্গ সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য উপায়। তবে এই পদ্ধতি আলোর দিকে আকর্ষিত হয় না এমন ধরনের পতঙ্গের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। আকর্ষিত পতঙ্গকে বিভিন্ন পন্থায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বার্লেস ফানেল (Berlese Funnel) : মাটি, পাতাপচা ও অন্যান্য আবর্জনা প্রভৃতি জৈব বস্তু থেকে পতঙ্গ বা অন্যান্য সন্ধিপদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বার্লেস ফানেল ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ধাতব বা কাঁচের চোঙে কিছুটা নীচে জৈব বস্তু রাখার উপযোগী তারের জাল দেওয়া হয়। চোঙের উপরটায় একটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব লাগাবার ও ঢাকা দেবার ব্যবস্থা থাকে। চোঙের তলায় একটি বিকার বা অন্য পাত্রে 70% এলকোহলের উপরে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে রাখা হয়। বাল্‌বটি জেলে দিলে জৈব বস্তু মধ্যস্থিত সন্ধিপদরা উত্তাপে ক্রমশ নিচের দিকে যেতে যেতে জালের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিচের পাত্রের 70% এলকোহলে জমা হয়। আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে মাটি, পচা সবজি ইত্যাদি জৈব বস্তুকে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (Magnesium sulphate) ও জলের (1 : 3 হারে) মিশ্রণের মধ্যে মিশিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ জৈব বস্তুতে অবস্থিত পোকা বা অন্যান্য সন্ধিপদ এবং তাদের ডিম বা প্যুপা জলে ভেসে উঠলে তাদের সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বায়ুচোষকের (Aspirator) সাহায্যে ছোট আকারের পোকা ও এ্যারেক্‌নিডা সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের বায়ুচোষক দেখা যায়। তবে সাধারণত দু-তিন ধরনের বায়ুচোষকই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম ধরনে (চিত্র-13A) একদিকে মুখ খোলা একটি কাঁচের বা স্বচ্ছ প্ল্যাষ্টিকের বোতলের খোলা মুখটিতে একটি রবারের কর্ক থাকে। কর্কের মধ্য দিয়ে দুটি কাঁচের সরু নল ঢোকান থাকে। এর একটি নলের বাইরের

মুখের সঙ্গে একটি রবার নল যুক্ত থাকে এবং এই নল দিয়ে মুখের সাহায্যে বায়ু টানা যায়। এই কাঁচের নলটির ভেতরের প্রান্ত একটুকরো মসলিন কাপড়ে মোড়া হয় যাতে পোকা বা এ্যারেকনিডরা নলে না ঢুকে যেতে পারে। দ্বিতীয় নলটি দুদিকেই খোলা থাকে। দ্বিতীয় ধরনে (চিত্র 13B) দুদিক খোলা থাকে এবং দুটি মুখ রবার কর্কের সাহায্যে বন্ধ করা হয়। প্রত্যেক দিকের কর্কের মধ্য দিয়ে এক একটি নল ঢোকান থাকে। পোকা বা



চিত্র 13 : বিভিন্ন ধরনের বায়ুচোষক (Aspirator) ; A=একমুখ যুক্ত, B – দু'মুখ যুক্ত, C=বাল্ব বায়ুচোষক

এ্যারেকনিডের নিচে সংগ্রহ নলটি ধরে অন্য নলের সঙ্গে যুক্ত রবার নলে মুখ দিয়ে বায়ু টানলে বোতলের মধ্যে যে আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় তার ফলে প্রাণিউপাদান ঢুকে যায়। মুখ দিয়ে টানার কিছু বিপদের দিকও থাকে।

ক্ষতিকারক জীবাণু মুখে ঢুকে যেতে পারে। সেজন্য যান্ত্রিক চোষক ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য এক ধরনের চোষক যন্ত্রকে বাল্‌ব বায়ুচোষক (Bulb Aspirator) বলা হয় (চিত্র 13C)। এতে চোষকনলটি একটি বাল্‌বের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং একই দিকে অবস্থিত সংগ্রহ নলের ভেতরের দিক বিপরীত দিকের কর্কের মধ্যে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটি ছিদ্রে ঢোকান থাকে। এর তলায় ঐ ছিদ্রের তুলনায় চওড়া সংগ্রহ বোতল 70% এলকোহল সহ রাখা হয়। চোষকনল বাল্‌বের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এর সাহায্যে বায়ু টানলে সংগ্রহনলের সাহায্যে যে পোকা ইত্যাদি সংগৃহীত হয় তারা দেহ-ওজনের ফলে 70% এলকোহলের সংগ্রহ-বোতলে জমা হয়।

সংগ্রহ বিষয়ক তথ্য ঃ কোন জীবিত বা সংরক্ষিত প্রাণিউপাদানের সংগ্রহের বিষয়ে ন্যূনতম কিছু তথ্য না পাওয়া গেলে সংগ্রহ মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংগ্রহের ও সংগ্রহ বিষয়ক তথ্যের প্রায় সমান গুরুত্ব। সংগ্রহ বিষয়ক তথ্যের সীমারেখার বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানের শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ বিষয়ক তথ্য আগের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃতভাবে জানতে চান। কারণ তাঁরা প্রাণিউপাদানকে প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ হিসাবে দেখতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে সংগ্রহের সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

1. সংগ্রহের ভৌগোলিক স্থান

সংগ্রহের ভৌগোলিক স্থান উল্লেখ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীদের বিস্তারণ বিষয়ক তথ্য বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কোন কোন প্রাণিদলের, যেমন ভূপৃষ্ঠস্থ শামুকের বিস্তারণ এমনকি 0·5 km. দূরত্বে যথেষ্ট পার্থক্যযুক্ত হতে পারে। এদিক থেকেও সংগ্রহের সঠিক স্থান উল্লেখ যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। সংগ্রহের স্থান উল্লেখযোগ্য না হলে জেলা বা রাজ্যের বা দেশের নাম উল্লেখ করার প্রচলন দেখা যায়। অনেক সময় উল্লেখযোগ্য কোন স্থান থেকে কোন দিকে কতদূরে সংগ্রহের স্থান তাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে, সংগ্রহের স্থানটি সম্পর্কে ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে। পাহাড় পর্বতে সংগ্রহ করা হলে উচ্চতার পরিমাপ দেবার রীতি এবং সমুদ্রে বা অন্য কোন গভীর জলাশয়ে প্রাণী সংগৃহীত হলে গভীরতা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। অশ্মিভূত (Fossil) প্রাণিউপাদানের ক্ষেত্রে শিলাস্তরের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

2. **সংগ্রহের তারিখ উল্লেখ যথেষ্ট প্রয়োজনীয়**

সংগ্রহের তারিখ থেকেই বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে লাভ করা সম্ভব।

3. সংগ্রহে কতগুলো পূর্ণাঙ্গ পুরুষ প্রাণী, কতগুলি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী প্রাণী ও কতগুলি অপ্রাপ্ত বয়সের প্রাণী ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ থাকতে পারে।

4. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোষক বৃক্ষের বা প্রাণীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

5. এছাড়াও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বভাব বা আচরণগত বা অন্য কোন বিষয় থাকলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়।

6. সংগ্রাহকের নামের উল্লেখ সংগ্রহে থাকা বাঞ্ছনীয়। সংগ্রাহক গবেষক নিজে নাও হতে পারেন।

সংগ্রহ বিষয়ক তথ্য অতি সংক্ষেপে হলেও সংগ্রহ স্থলেই লিখে নেওয়া কাম্য। অন্তত দিনের সংগ্রহ অভিযান শেষে বীক্ষণাগারে বা বাসস্থানে ফিরে সংগ্রহ বিষয়ক তথ্য লিখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় অন্যান্য সংগ্রহের সঙ্গে মিশে তথ্যহীনভাবে থেকে মূল্যহীন আবর্জনায় পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। সংগ্রহ বিষয়ক তথ্যের গুরুত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্যে রসিকতা করে বলা হয়েছে—সংগ্রহের প্রাণিউপাদানের তুলনায় সংগ্রহের তথ্য সম্বলিত চিরকুট (Label) বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সংগ্রহের সংরক্ষণ : সংগ্রহ সংরক্ষণের গুরুত্ব সংগ্রহের তুলনায় বেশি ছাড়া কম নয়। সংগ্রহ ঠিকমত সংরক্ষিত না হলে সংগ্রহ করা অর্থহীন। সংগ্রহ সংরক্ষণের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমেই দেখতে হয় সংগ্রহের কোন রকম বিকৃতি যাতে না ঘটে। সংরক্ষণ পদ্ধতি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সংগ্রহ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় বহুকাল থাকে। সংগ্রহ যেন কীট, পতঙ্গ, ছত্রাক, ভাইরাস ইত্যাদি দ্বারা বিনষ্ট না হয়।

বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর সংরক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ও সংরক্ষক মাধ্যমের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। নমুনা হিসেবে কয়েকটি সাধারণ সংরক্ষণ পদ্ধতির উল্লেখ করা যায় :—

সংরক্ষণশীল প্রাণিউপাদান প্রস্তুত এমন হওয়া আবশ্যক যাতে প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের সমস্ত প্রয়োজনীয় বা ব্যবহার্য চরিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর পক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। পক্ষী, স্তন্যপায়ী এবং কিছু কিছু সরীসৃপের ক্ষেত্রে চামড়া এবং চামড়ার সঙ্গে পালক শিং ইত্যাদি সংরক্ষিত হয় মূল প্রাণীটির স্বাভাবিক আকৃতিগত

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
কেঁচো	মাটি, বিভিন্ন পরিমাপের আবর্জনা, ক্ষেত, বাগান প্রভৃতি জায়গায়।	হাতে বা চিমটের সাহায্যে ধরা।	প্রথমে জলে ধুয়ে 5% ফরমালিন বা এলকোহলের সঙ্গে 9:1 হিসাবে গ্লিসারিণ মিশিয়ে সংরক্ষক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অথবা 5% ফরমালিন প্রথমে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ একই মাধ্যমে বা 70% এলকোহলে সংরক্ষণ করা হয়।
জোঁক	জলে ও ডাঙ্গায় মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বহিঃ পরজীবী হিসেবে।	গভীর জলের জাল ও চিমটের সাহায্যে।	5% ফরমালিন প্রথমে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ একই মাধ্যমে বা 70% এলকোহলে সংরক্ষণ করা হয়।
কম্বোজ (Mollusca)	জলে, ডাঙ্গায়, উদ্ভিদে।	হাতে, বিভিন্ন ধরনের জালে।	40°C তাপমাত্রার জলে পুরোপুরি বিস্তারের সময় পর্যন্ত রেখে পরে 70% এলকোহল বা ফরমালিন

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
			এলকোহলের মিশ্রণে (1 ভাগ 40% ফরমালিন + 4 ভাগ 70% এলকোহলের + 1 ভাগ জল) সংরক্ষণ করা হয়।
একাইনোডামাটা (Echinodermata)	সামুদ্রিক	হাতে বা জলে	5% ফরমালিন ইনজেকশন করে ঐ একই মাধ্যমে বা 70% এলকোহলে।
ক্রাস্টাসিয়ান (Crustaceans)	প্রধানত জলচর, কিছু কিছু মাছের পরজীবী হিসাবে, সামান্য কয়েকটি ডাঙ্গায়।	হাতে, বিভিন্ন ধরনের জল বা বার্লেস ফানেলের সাহায্যে।	7% এলকোহলের সঙ্গে 9:1 অনুপাতে গ্লিসারিণ মেশানো মাধ্যমে।
মাকড়সা (Arannaea)	ঝোপঝাড়ে, ঘাসে, ঘরবাড়িতে, বাগানে, গাছে, ছোটখাটো দেওয়াল বা মাটির গর্তে, সামান্য কিছু জলে।	হাতে বা চিমটের সাহায্যে, অনেক সময়ই ঝোপঝাড়ের তলায় কাপড় বা ছাতা উলটে ধরে ঝোপঝাড় ঝেড়ে ছাতা বা কাপড় থেকে হাত বা চিমটের সাহায্যে, কোন	অনুরূপ

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
		কোন সময় বায়ুচোষক (Aspirator) বা বার্লেস ফানেলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।	
Ticks ও Mites (Acarineaea)	ডাঙ্গায় জলে, মাটিতে, সবজিতে, আবর্জনায়, সন্ধিপদ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর বহিঃ-পরজীবী হিসেবে, নোনা জল ও মিষ্টি জল উভয়েই, অনেক সময় পোষকের আবাস বা যাতায়াত পথে এদের পাওয়া যায়।	ব্রাস বা চিমটের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। পোষক প্রাণীর দেহ থেকে বা বাসা থেকে। বায়ু-চোষক বা বার্লেস ফানেলের সাহায্যে ও নেওয়া হয়।	পরজীবীদের নরম ও শোষিত রক্ত মুক্ত করার :উদ্দেশ্যে প্রথমে জলে 2% ক্লোরাল হাইড্রেটের দ্রবণে ডোবান হয় পরে গ্লিসারিণ মিশ্রিত 70% এলকোহলে সংরক্ষণ করা হয়।
পতঙ্গ Thysanura, Protura,	মাটিতে গাছের পাতা ছাল আবর্জনা ইত্যাদির পচা অব	প্রধানত এলকোহলে ভিজিয়ে তুলির সাহায্যে, বা চোষক বা বার্লেস ফানেলের সাহায্য কখন	70% এলকোহলে। (অনেকে 70%-এর বদলে 90% ব্যবহার বেশী পছন্দ করেন)।

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
Diplura, collembola	নীচে ছত্রাক ইত্যাদি পরিবৃত স্থানে দেখা যায়। কখন কখন Collembola ফসল বা মাছ বা শস্য-ভাণ্ডারে দেখা যায়।	কখন নেওয়া হয়।	
Orthoptera	গাছে, ঝোপেঝাড়ে, ঘাসে, পাথর বা গাছের গুঁড়ির তলায় আবর্জনা প্রভৃতি স্থানে।	জাল দিয়ে ঘাস ঝেড়ে বা ঝোপ-ঝাড় ঝেড়ে আঙ্গুল বা চিমটের সাহায্যে।	পিন ফুটিয়ে পোকার বাক্সে। খুব ছোট পোকাদের 70% এল-কোহলে।
Dermoptera	সাধারণত ভিজে বা আর্দ্র আবহাওয়ায়, নরম মাটিতে, পাথরে বা গাছের গুঁড়ির তলায় আবর্জনার সঙ্গে থাকে। ইঁদুর ও বাদুরের ব ী হিসেবেও	চিমটের সাহায্যে, আলোকে, ঝোপঝাড় ঝেড়ে বা মাটি ঘাস ঝেড়ে।	পিন ফুটিয়ে পোকার বাক্সে। বহিঃ-পরজীবীদের 70% এলকোহলে।

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
	দেখা গেছে। তবে বেশ-কিছু আলো সচেতন।		
Pleeoptera	নদী, হ্রদ বা খালের ধারে ধারে পাথর, গাছের গুঁড়ি, ঝোপঝাড় বা ঘাসের উপর দেখা যায়।	অনুরূপ।	70% এলকোহলে।
Ephemero-ptera	অপ্রাপ্তবয়স্করা জলে থাকে, প্রাপ্ত বয়স্করা ডাঙায়।	আঙ্গুলের বা চিমটের সাহায্যে গাছের পাতা বা ঝোপঝাড় ঝেড়ে, এমনকি আলোর সাহায্যেও সংগ্রহ করা হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জল থেকে ছেকে তোলা যায়।	অধিকাংশই 70% এলকোহলে। কিছু কিছু পিন ফুটিয়েও রাখা যায়।
Odonata	অপূর্ণাঙ্গ জলে। পূর্ণাঙ্গরা জলের কাছাকাছি উড়ে বেড়ায় প্রধানত গোধূলি লগ্নে।	অপূর্ণাঙ্গদের ছেঁকে তুলতে হয়। পূর্ণাঙ্গদের জালে ধরতে হয়।	অপূর্ণাঙ্গদের 70% এলকোহলে। পূর্ণাঙ্গদের পিন ফুটিয়ে।

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
Isoptera	মাটির খাঁজে বা ঢিবিতে সবজি ও অন্যান্য শস্যে, কাঠে, জমে থাকা বই ইত্যাদিতে সমাজবদ্ধভাবে বাস করে।	চিমটের সাহায্যে বা বার্লেস ফানেলের সাহায্যে। তবে ডানাযুক্তরা বৃষ্টির আগে ও পরে সন্ধ্যার দিকে আলোর দিকে ছোটে।	প্রায়শই 70% এলকোহলে।
Embioptera	মাটির ফোকরে, গাছের ছাল বা পাথরের নিচে, গাছ, Mosser Lichenis-এর সঙ্গে।	চিমটের সাহায্যে।	70% এলকোহলে।
Psocoptera	ঝোপে, গাছের ছালের তলায়, 'পাখির, ইঁদুরের পিঁপড়ের বাসায়, আবর্জনায় এবং অব্যহৃত বই বা কাগজে।	ঝেড়ে চিমটের সাহায্যে, বার্লেস ফানেলে বা এসপিরেটরের সাহায্যে।	প্রায়শই 70% এলকোহলে।
Hemiptera	ঝোপে, গাছের আলগা	ঝেড়ে বার করা, চিমটের সাহায্যে,	অধিকাংশই পিন ফুটিয়ে রাখা

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
	ছালের তলায়, ঘাসে, আবর্জনায়। পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর পরজীবী হিসেবে বা আলোর মুখে।	এসপিরেটরের সাহায্যে বা আলো ফাঁদে।	হয়। কিছু 70% এলকোহলে।
Thysanoptera	ঝোপঝাড়, ফুল, ফল, পাতা, গাছের ছালে, পঁচনশীল আবর্জনা ও ছত্রাক ইত্যাদি গাছপালায় ও ঘাসে।	ঝোপঝেড়ে, এলকোহলে ভেজা তুলির সাহায্যে, এসপিরেটর ও বার্লেস ফানেলের সাহায্যে।	70% এলকোহলে। তবে AGA দ্রবণ (8 ভাগ এলকোহলে 5 ভাগ জল + 1 ভাগ গ্লিসারিণ + 1 ভাগ এসিটিক এসিড) শ্রেয়।
Neuroptera	গাছ পালায় ও ঘাসে।	আলো ফাঁদ পেতে, হাতে বা চিমটের সাহায্যে।	পূর্ণাঙ্গ পিন ফুটিয়ে বাক্সে। অপূর্ণাঙ্গ 70% এলকোহলে।
Mecoptera	ভিজা বা পচনশীল কাঠে, বরফেও দেখা যায়।	চিমটের সাহায্যে।	70% এলকোহলে, পিন ফুটিয়ে।
Lepidoptera	বনজঙ্গল, বাগান, শস্য-	উড়ন্ত পূর্ণাঙ্গদের প্রধানত জালের	পূর্ণাঙ্গদের পিন ফুটিয়ে পোকার

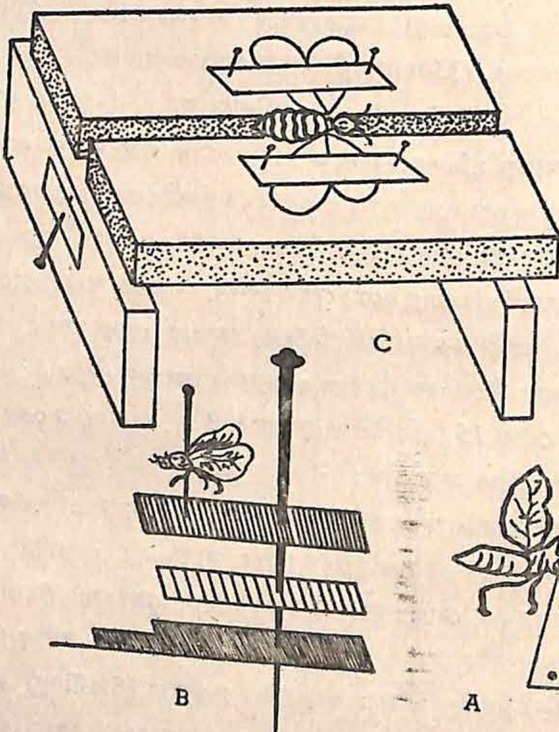
প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
	ক্ষেত, শস্যভাণ্ডার, যে কোন জায়গায় পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গদের দেখা যায়। Moth আলোর দিকে আকর্ষিত হয়।	সাহায্যে, অপূর্ণাঙ্গদের চিমটের সাহায্যে।	বাক্সে রাখা হয়। অপূর্ণাঙ্গদের 70% এলকোহলে।
Coleoptera	সর্বত্র বিস্তারি, গাছের পাতায়, কাণ্ডে, শিকড়ে, মাঠে, আবর্জনায়, গোবরে শস্যভাণ্ডারে, জলে ইত্যাদি স্থানে।	হাতে বা চিমটের সাহায্যে বা ঘাস ঝেড়ে।	পূর্ণাঙ্গ পিন ফুটিয়ে বা কার্ডে লাগিয়ে, অপূর্ণাঙ্গদশায় 70% এলকোহলে।
Strepsiptera	Hemiptera, Hymenoptera Orthoptera এর পরজীবী।	পোষককে ব্যবচ্ছেদ করে বা পরজীবী বেরোনো পর্যন্ত পোষককে লালন করে।	70% এলকোহলে।
Hymenoptera	বনেজঙ্গলে, বাগানে, শস্য-	উড়ন্তদের জালের সাহায্যে, পর-	পিন ফুটিয়ে, ছোট এবং অপূর্ণাঙ্গ

প্রাণিগোষ্ঠী	বাসস্থান	সংগ্রহের উপায়	সংরক্ষণ মাধ্যম
	ক্ষেতে, শস্যের মজুত ভাণ্ডারে, কিছু পোকার পরজীবী রূপে, অনেকে সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। বেশ কিছু উড়ে বেড়ায়।	জীবীদের পোষকের দেহ থেকে, স্বাধীন ডাঙ্গায় বসবাসকারীদের চিমটের সাহায্যে। এসপিরেটরও ব্যবহার করা যায়।	দশায় 70% এলকোহলে। এল-কোহলে দেবার আগে 5 মিনিট 1% ফরমালিন জলের দ্রবণে রাখলে ভাল হয়।
Diptera	জলে, ডাঙায়, নালা-নর্দমায়, ময়লা আবর্জনায়, বনেজঙ্গলে, খাদ্যে, পানীয়ে সবজিতে, শস্যে, পক্ষী, স্তন্যপায়ী ইত্যাদির পরজীবী রূপে।	প্রয়োজন অনুযায়ী জাল, চিমটে, এসপিরেটর, এলকোহলে ভিজানো তুলি, বার্লেস চোঙ ইত্যাদির সাহায্যে।	অধিকাংশ পিন ফুটিয়ে, ছোট আকারের বা অপূর্ণাঙ্গ দশায় 70% এলকোহলে।

বৈশিষ্ট্য রেখে এবং তাতেই চারিত্রিক দিকের কিছু প্রতিফলন ঘটে। অনেক সময় প্রাণীর দেহাংশ সংগ্রহও সংরক্ষণ করা হতে পারে। যেমন স্তন্যপায়ীর করোটি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত সন্ধিপদের যৌনাঙ্গ (Genitalia)। এক্ষেত্রে যৌনাঙ্গ গ্লিসারিণে পরীক্ষা করে মূল প্রাণীটির সঙ্গে একই সংরক্ষণ মাধ্যমে খুব ছোট পাত্রে (Microvial) রাখা যেতে পারে। মাইক্রোসকোপে ব্যবহৃত স্লাইডেও রাখা যেতে পারে। সংরক্ষণশীল প্রাণিউপাদানের যথাযথ স্থাপনের (Mounting) পূর্বে প্রাণীকে পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক শিথিল অবস্থায় (Relaxed) পাওয়া প্রয়োজন। বিশেষত শক্ত দেহযুক্ত পতঙ্গ বা অন্যান্য সন্ধিপদদের পক্ষে এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিথিল অবস্থায় না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণীটিকে যথাযথ বিন্যাস করা সম্ভব নয়। শুকনো কঠিন অবস্থার প্রাণিউপাদানকে শিথিল অবস্থায় আনার জন্য ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বাক্সে (Relaxing box) রেখে শিথিল অবস্থায় আনা যেতে পারে। অধিকাংশ পতঙ্গই এক রাত্রেই শিথিল অবস্থায় এসে যায়। শিথিলকরণ বাক্সের তলার দিকে এক পরত স্পঞ্জ জলে ভেজানো থাকে। বাক্সের এক কোণে 10 থেকে 15 মিলিলিটার ফেনল বা ইথাইল এসিটেট ভেজানো তুলো থাকে যাতে ছত্রাক না জন্মায়।

যে সব প্রাণিউপাদান ফরমালিন বা এলকোহলে সংরক্ষিত হয় তাদের সাধারণত সংগ্রহের পরই সংরক্ষণ মাধ্যমে রাখা হয়। প্রাণীটি একটু বড় হলে অনেক সময়ই দেহের মধ্যে সংরক্ষণ মাধ্যম ঢুকাবার ব্যবস্থা করা হয় ইনজেকশানের সাহায্যে। পক্ষী, স্তন্যপায়ী বা বিরাট সরীসৃপ সংরক্ষণে ত্বককে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাভাবিক চেহারায় (Staffing) রাখা হয়। কিন্তু অধিকাংশ পতঙ্গকে শুকনো অবস্থায় রাখা হয় পতঙ্গের বাক্সে পিন ফুটিয়ে বা পতঙ্গকে কোন কাগজ বা বোর্ডে রেখে বিন্যস্ত করে। এই বিশেষ ধরনের পিন (Entomological pins) বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসার্ধের এবং এক দিক বা উভয় দিক সুচলো হতে পারে এবং মরচে ধরবে না, পতঙ্গের দেহে সরাসরি পিন ফুটানো যেতে পারে বা খুব ছোট পতঙ্গকে কোন ত্রিকোণাকৃতি কাগজের বোর্ডের সরু দিকে আঠা দিয়ে লাগানো হয় এবং ঐ বোর্ডটিকে পিন ফুটিয়ে নেওয়া হয় (চিত্র 14A)। পিন ফোটানো পোকাকে সরাসরি পোকার বাক্সে রাখা যেতে পারে বা স্টেজের সাহায্যে রাখা যেতে পারে। (চিত্র 14B)। সব সময়ই বিন্যাসের উদ্দেশ্য হবে যতদূর সম্ভব বেশী চারিত্রিক

দিক দৃষ্টিগোচর হওয়া। পিনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্যও থাকা বাঞ্ছনীয়। ভালভাবে চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য কিছু কিছু পোকাকে মারার পরেই বিস্তারি বোর্ডে (spreading board) ডানা ছড়িয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাগজ এঁটে কয়েকদিন রাখা হয় (চিত্র 14C)। দেহে পিন



চিত্র 14 : শুষ্ক সংগ্রহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ; A = আঠার সাহায্যে, B = স্টেজের সাহায্যে, C = বিস্তারি বোর্ডের ব্যবহার

ফুটানোর বিষয়ে কিছু পার্থক্য বিভিন্ন পতঙ্গের ক্ষেত্রে মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ গোষ্ঠীতে মেটাথোরাক্সের মাঝ বরাবর বা একটু ডানদিকে পিন ফুটান হয় আর শক্ত অগ্র ডানাযুক্ত পতঙ্গে (Hemiptera, Coleoptera ইত্যাদি) ডানদিকের অগ্রডানার সামনের দিকে পিন ফুটান হয়। পিন সব সময়ই লম্বালম্বিভাবে ফুটান হয়ে থাকে।

সংগ্রহ সংরক্ষণে কতগুলো **সতর্কতামূলক ব্যবস্থা** নেওয়া একান্ত আবশ্যক। সংগ্রহকে আগুন, ধুলোবালি, বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ, ফাঙ্গাস ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচানোর সব রকম ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। সেইদিক থেকে সম্ভব হলে বাতানুকূল কক্ষই আদর্শ স্থান, বিশেষত পোকার সংরক্ষণে। জাতিরূপ প্রাণী (Type) শ্রেণীবিন্যাসে অনন্য এবং বস্তুত অপরিবর্তনীয়। সেই কারণে জাতিরূপ প্রাণীটির সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। জাতিরূপ প্রাণীই নামিক প্রাণীর সনাক্তকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে একমাত্র প্রমাণ। এই কারণে জাতিরূপ প্রাণী উচ্চমান সম্পন্ন সংগ্রহশালায় সযত্নে সংরক্ষিত হওয়া বিধেয়। জাতিরূপ সমপ্রাণী (Lectotype) ও নব জাতিরূপ প্রাণী (Neotype)-দের সংরক্ষণেও একই ধরনের সতর্কতা থাকা দরকার। এই কারণে গবেষকদের কাজ শেষ হলেই জাতিরূপ প্রাণী উপাদানকে কোন উচ্চমানের সংগ্রহশালায় জমা করা উচিত।

সংরক্ষণের তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতির কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালিকায় সংগ্রহশালার ক্রমিক সংখ্যা, মূল সংগ্রহ ক্ষেত্রের সংখ্যা, বিজ্ঞানসম্মত নাম, সংগ্রহ স্থল, সংগ্রহের তারিখ, সংগ্রাহকের নাম, বিশেষ কোন মন্তব্য ইত্যাদি থাকে। প্রত্যেকটি সংগৃহীত প্রাণীর পৃথক সংখ্যা না দিয়ে প্রত্যেকটি সংগ্রহের একটি সংখ্যা দেওয়ার প্রচলনই বেশী, বিশেষত যেখানে প্রজাতি ও প্রাণিউপাদানের সংখ্যা খুব বেশী যেমন পতঙ্গ। সাধারণত সংগ্রহের তালিকা অঞ্চলভিত্তিক করা হয়ে থাকে। আবার অভিযানভিত্তিক তালিকা করার প্রচলনও দেখা যায়। সংগ্রহের অন্তত গণ স্তর পর্যন্ত সনাক্তকরণ হলেই তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে। সাধারণত জাতিরূপ প্রাণিউপাদানই প্রাধান্য পায়।

সংগ্রহশালার প্রাণিউপাদান সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত কার্ডের প্রচলন অধিকাংশ সংগ্রহশালায় দেখা যায়। প্রখ্যাত কিছু সংগ্রহশালায় যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগ্রহশালায় প্রত্যেকটি প্রাণিউপাদান সম্পর্কিত তথ্য পৃথক IBM কার্ডে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

সংগ্রহকে গ্রাহ্য শ্রেণীবিভাগের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়ে থাকে এবং যে সব প্রাণিউপাদানের সনাক্তকরণ হয়নি তাদের পৃথকভাবে শ্রেণী, গণ ইত্যাদি অনুসারে রাখা হয়।

সংগ্রহ আদানপ্রদানের দুটি পদ্ধতি দেখা যায়। একটি পদ্ধতিতে গবেষক তার একান্ত প্রয়োজনীয় সংগ্রহ সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে ধার নিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে যিনি ধার নেবেন তাকে অনেকখানি দায়িত্বশীল হতে হবে। তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত সামান্য সময়ও সংগ্রহ আটকে রাখবেন না। ধার নেবার আবেদনপত্রেই প্রয়োজনীয় সময়ের কথা উল্লেখ থাকা দরকার। অতিরিক্ত সময় ধার নেয়া সংগ্রহকে রাখতে হলে পূর্বেই তত্ত্বাবধায়ককে জানাতে হবে। ধার নেয়া সংগ্রহ সম্পর্কে সাবধানতা কোন উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। অন্যদিকে যে কোন বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ যেহেতু কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত সম্পদ নয় বিজ্ঞানের সম্পদ সেই কারণে গবেষকদের একান্ত প্রয়োজনীয় সংগ্রহ ধার দেয়া তত্ত্বাবধায়কের সাধারণ কর্তব্য এবং দিয়ে থাকেন। তবে নতুন গবেষকদের ধার নিতে হলে সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক বা উপদেষ্টা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিতে হয়। বিজ্ঞানের স্বার্থেই গবেষকদের উচিত যথাসম্ভব সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে গবেষণা বিষয়ক প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে ধার নেয়া এড়িয়ে যাওয়া।

আদানপ্রদানের অন্য পদ্ধতি সংগ্রহশালা বা গবেষকের সংগ্রহভাণ্ডার বাড়াবার অন্যতম একটি উপায়। সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়কের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবেই এমন হওয়া উচিত যে তার সংগ্রহশালার সংগ্রহ যথেষ্টভাবে অঞ্চল বা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক হবে। এই উদ্দেশ্যে যেমন কোন অজানা সংগ্রহ পেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সেই সংগ্রহের সনাক্তকরণ ও নামকরণ করিয়ে নেওয়া, একইভাবে যেসব সংগ্রহ অন্য কোন সংগ্রহশালা বা গবেষকের কাছে অতিরিক্ত সংখ্যায় পাবার সম্ভাবনা থাকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় প্রাণিউপাদান তাদের অতিরিক্ত সংগ্রহ থেকে নেয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত সংগ্রহ বা জাতিরূপ প্রাণিউপাদানসহ গবেষণাবিষয়ক সংগ্রহ অধিকাংশ গবেষকই গবেষণা শেষে প্রামাণ্য সংগ্রহশালায় দিতে আগ্রহী। তারা শুধু আশ্বস্ত হতে চান যে তাদের সংগ্রহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে।

সংগ্রহ আদানপ্রদান প্রায়শই ডাকযোগে করতে হয়। সংগ্রহ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেকথা মনে রেখে উপযুক্তভাবে মোড়ক করা দরকার। মোড়ক বা প্যাকিং করার সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতি,

ভাঙচুর অন্য কোন কীটপতঙ্গ বা ফাঙ্গাসের আক্রমণের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় ভাবতে হয়।

সনাক্তকরণঃ সনাক্তকরণের মূল উদ্দেশ্য প্রাণিউপাদানটি কোন্ জাতের তা নির্ধারণ করা। যে কোন প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালায় পৌছানো যে কোন প্রাণিউপাদানেরই সনাক্ত হওয়া প্রয়োজন। সে স্থলচর, জলচর বা খেচর যাই হোক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ খুব সহজ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তত সহজ নাও হতে পারে। প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত প্রাণিউপাদান গোষ্ঠীগতভাবে বাছাই করে নেওয়া যেতে পারে। এই বাছাই শ্রেণী বা বর্গ অথবা গণ যে কোন পর্যায়েরই হতে পারে। তবে সনাক্তকরণ কি ধরনের হবে তা কিছুটা নির্ভর করবে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যের উপর। শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী সনাক্তকরণে প্রজাতি নির্ধারণ ও শ্রেণী-বিভাগের দিকেই বেশী আগ্রহশীল, কিন্তু ব্যবহারিক জীববিজ্ঞানীরা নামটি সম্পর্কেই বেশী আগ্রহশীল। প্রাণিউপাদান সনাক্তকরণে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মাবলী ও পদ্ধতি, শ্রেণীবিন্যাসের চরিত্র, ব্যবহৃত পদ বা শব্দের পরিচয়, সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা সম্পর্কিত ধারণা থাকা দরকার, অবশ্য সবগুলো বিষয়ই অনুশীলন সাপেক্ষ।

সনাক্তকরণের পদ্ধতি একাধিক দেখা যায়। তবে সব পদ্ধতিরই মূল বিষয় তুলনা। সংগৃহীত প্রাণিউপাদান প্রাথমিকভাবে বাছাই হবার পরে সনাক্তকরণের পথে আরও এগুতে প্রধানত নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকেঃ

1. পুঁথিপুস্তিকার সাহায্যে।
2. নির্দেশিকার সাহায্যে (Key)।
3. চিত্রের সাহায্যে।
4. সরাসরি তুলনার মাধ্যমে।

1. সংগ্রহ সনাক্তকরণে প্রাথমিক বাছাই হবার পরেই সনাক্তকারককে পুঁথিপুস্তিকার সাহায্য নিতে হয়। প্রাণীটি কোন্ শ্রেণী, বর্গ বা গণভুক্ত তা নির্ধারণ হয়তো সহজেই হয়ে যেতে পারে। কোন কোন সময় গণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও পুঁথিপুস্তিকার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে প্রাথমিক বাছাইয়ের পরে সবথেকে বেশী নির্ভর করতে হয় পুঁথিপুস্তিকা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞের উপর। প্রাণীটি কোন্

গোষ্ঠীভুক্ত অথবা ঐ প্রাণীটির নিকটতম গোষ্ঠী কোনটি পুঁথিপুস্তিকাই তার ইঙ্গিত দিতে পারে। তবে এই সিদ্ধান্ত খুব সহজ নয়, কারণ এই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ পুঁথিপুস্তিকার জ্ঞান লাভ করা বেশ সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। বিশেষত শিক্ষানবীশদের পক্ষে পুঁথিপত্র সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্যাসঙ্কুল।

প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান জগতের পুঁথিপত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে Guide to the literature of Zoological Sciences ধরনের পুঁথির আধুনিক সংস্করণের সাহায্য নেওয়া যায়। গবেষকের বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকাশিত পুঁথিপত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার পক্ষে The Zoological Record হচ্ছে অমূল্য সম্পদ। এ ছাড়াও রয়েছে Catalogue of scientific papers published by Royal Society, Neave's Nomenclator Zoologicum ইত্যাদি। তবে The Zoological Record প্রায় দু'বছর পিছিয়ে থাকে। সেদিক থেকে অসম্পূর্ণ হলেও সর্বাধুনিক তথ্য যোগায় Biological Abstracts। The Zoological Recordটি Zoological Society of London, British Museum (Natiural History) ও Commonwealth Institute of Entomology-র সহযোগিতায় 1864 খ্রীঃ থেকে প্রতিবছর কুড়িটি বিভাগে প্রকাশ করে আসছে যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু প্রকাশ-বিভ্রাট ঘটে। পুঁথিপত্রের সঙ্গে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকার সাহায্য নিতে পারলে অনেকটা সুবিধা হয়।

2. নির্দেশিকার (Key) ব্যবহার সনাক্তকরণে বহুল প্রচলিত। নির্দেশিকা বাস্তবে তথ্যবিচারের পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রাণিউপাদানটির কোন্ পর্যায়ের তা' সনাক্তকরণ সম্ভব। বড় বড় প্রাণিগোষ্ঠীতে অর্থাৎ যে সব উচ্চতর গোষ্ঠীতে বিরাট সংখ্যার নিম্নতর গোষ্ঠী বর্তমান থাকে সে সব ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রাণিগোষ্ঠীর বা প্রজাতির বিবরণ জেনে সনাক্তকরণে এগোনো খুব সময় ও ধৈর্য সাপেক্ষ। এসব ক্ষেত্রে নির্দেশিকার সাহায্যে এগোনো অনেকটা সহজ হয়। নির্দেশিকার প্রধান উদ্দেশ্য সনাক্তকরণে সাহায্য করা। এই কারণে অনেক সময়ই সনাক্তকরণের নির্দেশিকা (Identification key) বলা হয়ে থাকে। সেইদিক থেকে নির্দেশিকা তৈরি করা শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর একটি অন্যতম কাজ। অধিকাংশ সময়ই বিপরীতমুখী চরিত্রের হিসেবে দ্বিশাখা নির্দেশিকা (Dichotomous key) তৈরি করা হয়ে

থাকে এবং এই দ্বিশাখা বিভাজন বিভিন্ন ভাবে ও স্তরে পৌছানো সম্ভব।

নির্দেশিকা হচ্ছে প্রাণী শ্রেণীবিভাগের প্রতি স্তরের অনুক্রমিক একটি রীতিবদ্ধ কাঠামো, যার অধীনস্ত সীমাবদ্ধ শ্রেণীগুলো দুই বা ততোধিক শ্রেণীর অধিক্রমণে সৃষ্টি হয়। ভাল নির্দেশিকা দ্বিশাখাই হয়; যে কোন বিন্দুতেই দুইটির বেশী বিকল্প থাকে না। নির্দেশিকা ব্যবহার ও উদ্দেশ্যের অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হয়। তবে নির্দেশিকা ব্যবহারেরও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। পূর্ণাঙ্গ দশার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী নির্দেশিকা প্রাণীদের অপরিণত দশার পক্ষে অচল অনুরূপভাবে স্ত্রীপ্রাণীদের পক্ষে ব্যবহার্য নির্দেশিকা পুরুষদের পক্ষে কোথাও কোথাও অব্যবহার্য। এমনকি বৃদ্ধিজনিত অস্বাভাবিকতা যুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রেও নির্দেশিকা অচল। নির্দেশিকা প্রায়শই নগণ্য বা মূল্যহীন চরিত্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, সেসব চরিত্রের ভিত্তিতে খুব বেশীদূর এগোনো সম্ভব হয় না। এইসব কারণে সনাক্তকরণের নির্দেশিকা গঠনে বিস্তৃত চারিত্রিক গুণাগুণের আলোচনার ভিত্তিতে ন্যূনতম ভেদযুক্ত দুটি বিকল্প চরিত্রকেই ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। দ্বিশাখা নির্দেশিকার চরিত্র নির্ধারণে অনেকে কম্প্যুটারের সাহায্য নেবার পক্ষপাতী।

নির্দেশিকার প্রকার ঃ

নির্দেশিকা গঠনের বিভিন্ন প্রকার বা পদ্ধতি দেখা যায়। তবে সবগুলোই দ্বিশাখা অর্থাৎ যে কোন বিন্দুতে বিকল্প জোড়া চরিত্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। নির্দেশিকার প্রধান প্রধান প্রকারগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

(i) সরল বন্ধনীহীন নির্দেশিকা (Simple non-bracket key)।
(ii) সরল বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকা (Simple bracket key)।
(iii) খাঁজযুক্ত নির্দেশিকা (Indented key)।
(iv) পুঞ্জিভুক্ত নির্দেশিকা (Group type key)।
(v) সম্মিলিত নির্দেশিকা (Combination key)।
(vi) চিত্রে নির্দেশিকা (Pictorial key)।
(vii) শাখাবিস্তারি নির্দেশিকা (Branching key)।
(viii) বৃত্তিয় নির্দেশিকা (Circular key)।
(ix) বাক্স আকারের নির্দেশিকা (Box type key)।

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথিপত্রে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরাই সরল

বন্ধনীহীন নির্দেশিকা ব্যবহার করে থাকেন। আবার কেউ কেউ খাঁজযুক্ত নির্দেশিকাও ব্যবহার করেন। চিত্রে নির্দেশিকা, শাখাবিস্তারি নির্দেশিকা, বৃত্তিয় কিংবা বাক্সাকারের নির্দেশিকা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহৃত হয় না।

(i) **সরল বন্ধনীহীন নির্দেশিকায়** ব্যবহৃত বিকল্প চরিত্রযুগল সহজেই তুলনা করা যায় এবং প্রাণিউপাদানের সনাক্তকরণে স্বচ্ছন্দে সামনের দিকে অর্থাৎ নিম্নতর স্তরে পৌঁছান যায়। পেছনের দিকে চলাও সম্ভব তবে কিছুটা অসুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ Thomisidae গোত্রের Philodromus গণের (মাকড়সা) প্রজাতি নির্দেশিকার খানিকটা উল্লেখ করা যায়ঃ

1. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণ (Chevrons) যুক্ত 2
   —উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণ বিহীন 4
2. শিরবক্ষে (Cephalothorax) একটি হাতুড়ি আকৃতির সাদা দাগযুক্ত ......*P. domesticus.*
   —শিরবক্ষ হাতুড়ি আকৃতির দাগবিহীন 3
3. উদর উন্নত এবং পার্শ্বিয় বাদামী ছোপযুক্ত ......*P. assamensis.*
   —উদর চ্যাপ্টা এবং উভয় পার্শ্বে সাদা ত্রিকোণাকার ছোপযুক্ত ......*P. betrabatai.*
4. দেহ পিঠ-পেটে চাপা, পাতার মত 5
   —দেহ ততটা চাপা নয় 6

অনেকে এ ধরনের নির্দেশিকা ব্যবহারে প্রতি যুগল চরিত্র প্রকাশে a ও b ব্যবহার করেন। যেমন—

1. a. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণসহ.........
2. b. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণহীন.........

(ii) **সরল বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকা** সরল বন্ধনীহীন নির্দেশিকার মতই কেবলমাত্র বিকল্প যুগলের সংখ্যার ধারবাহিকতা, মূল সংখ্যার পরেই বন্ধনীর মধ্যে দেখানোর পার্থক্য থাকে। যেমন—

1. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণসহ ......2.
   উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণবিহীন ......4.
2. (1) শিরবক্ষ একটি হাতুড়ি আকৃতির সাদা দাগসহ ...P. domesticus.

শিরবক্ষ হাতুড়ি আকৃতির দাগবিহীন ......3.

3. (2) উদর উন্নত এবং পার্শ্বিয় বাদামী ছোপসহ ...P. assamensis.

উদর চ্যাপটা এবং উভয় পার্শ্বে ত্রিকোণাকার ছোপ ...P. betrabatai.

4. (1) দেহ পিঠ-পেটে চাপা, পাতার মত 5

....................................ইত্যাদি।

সরল বন্ধনীহীন ও সরল বন্ধনীযুক্ত এই দুই ধারার নির্দেশিকাই যথেষ্ট ব্যবহৃত। সুগঠিত হলে এই নির্দেশিকায় সহজেই সামনে পেছনে চলাচল করা সম্ভব এবং উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। তবে এই দু'ধরনের নির্দেশিকার প্রধান অপূর্ণতা, এগুলি বিভিন্ন বিভাগের সম্পর্ক বোঝাতে অসমর্থ যে সম্পর্ক খাঁজযুক্ত নির্দেশিকায় সহজেই বোঝা যায়।

(iii) **খাঁজযুক্ত নির্দেশিকায়** কাগজের বাঁ দিকের ব্যবহারের সীমারেখা থেকে গুরুত্ব অনুসারে খাঁজ শুরু হয়। ফলে প্রাথমিক বিকল্প যুগল বাঁ দিক থেকে শুরু হলে মাধ্যমিক যুগল 4 বা 5টি স্থান ছেড়ে দিয়ে শুরু হয় এবং তার পরে যুগল আরও সম পরিমাণ স্থান ছেড়ে সুরু হয়। এই ধরনের নির্দেশিকায় বিভিন্ন বিভাগের সম্পর্ক খুব সহজেই নজরে পড়ে। এই নির্দেশিকা ছোট হলে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু খুব দীর্ঘ হলে বেশী ছড়িয়ে পড়ে এবং জায়গাও বেশী নিয়ে নেয়। উচ্চতর পর্যায়ে বা তুলনামূলক ক্ষেত্রে এই রকমের নির্দেশিকা বেশী উপযোগী। এই ধারার নির্দেশিকা প্রয়োগের উদাহরণ নিচে দেওয়া হল :

A. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণযুক্ত

B. শিরবক্ষ হাতুড়ি আকৃতির সাদা দাগসহ ......P. dometicus

BB. শিরবক্ষ হাতুড়ি আকৃতির দাগবিহীন

C. উদর উন্নত এবং পার্শ্বীয় বাদামী ছোপসহ ......P. assamensis

CC. উদর চ্যাপ্টা এবং উভয়পার্শ্বে সাদা ত্রিকোণ আকারের ছোপসহ ......P. betrabatai

AA. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণবিহীন

B. দেহ পিঠ-পেটে চাপা, পাতার মত

C. শিরবক্ষের পার্শ্বসীমায় রঙের ছোপযুক্ত ...P. shillongensis.

CC. শিরবক্ষের পার্শ্বসীমায় রঙের ছোপবিহীন......P. kendrabatai.

(iv) **পুঞ্জিভুক্ত নির্দেশিকা** অনেকটা সরল বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকার কাছাকাছি। এই ধরনের নির্দেশিকায় প্রাথমিক বিকল্প যুগলের প্রথমটিকে বসিয়ে তার তলায় ক্রমাগত মাধ্যমিক ও পরবর্তী প্রশাখায় 2, 3, 4 ইত্যাদি মানে সাজান হয়। প্রাথমিক যুগলের দ্বিতীয়টিকে পরবর্তী সংখ্যায় সাজান হয় এবং আগের মত পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে সাজান হয়। প্রথম সংখ্যাটির সঙ্গে প্রাথমিক যুগলের দ্বিতীয়টির সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয় এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত পরবর্তী সংখ্যাগুলোকে বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক।

1. (6). উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণযুক্ত।
2. শিরবক্ষ একটি হাতুড়ি আকৃতির সাদা দাগযুক্ত ...P. domesticus
3. (4,5). শিরবক্ষ হাতুড়ি আকৃতির দাগবিহীন।
4. উদর উন্নত ও পার্শ্বীয় বাদামী ছোপসহ ...P. assamensis
5. উদর চ্যাপ্টা ও উভয় পার্শ্বে সাদা ত্রিকোণাকারের ছোপসহ ...P. betrabatai
6. (7), উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণবিহীন।
7. (9, 10). দেহ পিঠ-পেটে চাপা, পাতার মত।
8. (11, 12). দেহ ততটা চাপা নয়।

...........ইত্যাদি।

(v) **সম্মিলিত নির্দেশিকায়** সরল বন্ধনীহীন, খাঁজযুক্ত ও পুঞ্জিভুক্ত নির্দেশিকার ভাল দিকগুলোকে কাজে লাগানো হয়। সম্মিলিত নির্দেশিকা বড় হলে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও তার পরবর্তী বিকল্প যুগলকে খাঁজ হিসাবে সাজানো হয়। A এবং AA-কে বাঁদিকে বসানো হয়। A-এর নীচে B ও BBকে খাঁজে সাজানো হয়। প্রয়োজনমত B-এর নিচে C ও CC-কে সাজানো হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তার পরের প্রশাখাকে সুস্পষ্ট করা যায়। ফলে তাদের খুব সহজেই তুলনা করা সম্ভব। যেমন—

A. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণযুক্ত।
B. শিরবক্ষ সাদা হাতুড়ি আকৃতির দাগযুক্ত ......P. domesticus.
BB. শিরবক্ষ হাতুড়ি আকৃতির দাগবিহীন।
I. উদর উন্নত ও পার্শীয় বাদামী ছোপসহ ......P. assamensis

I′. উদর চ্যাপ্টা ও উভয়পার্শ্বে সাদা ত্রিকোণ আকৃতির ছোপযুক্ত ......P. betrabatai.

AA. উদরের পশ্চাদার্ধ সেভ্রণবিহীন।

B. দেহ পেট-পিঠে চাপা, পাতার মত।

I. শিরবক্ষের পার্শ্বসীমা রঙের ছোপযুক্ত ......P. Shillongensis

I′. শিরবক্ষের পার্শ্বসীমা রঙের ছোপবিহীন ...P. kendrabatai

BB. দেহ ততটা চ্যাপ্টা নয়।

C. উদর লম্বালম্বিকাল দাগ বা ছোপযুক্ত।

I. উদর লম্বালম্বি অবিচ্ছিন্ন কাল পট্টিযুক্ত ......P. debatai

I′. উদর লম্বালম্বি বিচ্ছিন্ন কাল পট্টি বা রেখাযুক্ত ...P. manikae

CC. উদর লম্বালম্বি কাল দাগ বিহীন।

I. উদর অনিয়মিত চকখড়ির মত সাদা ছোপযুক্ত ...P. decoratus

2. (3,4). উদর চকখড়ির মত সাদা ছোপবিহীন।

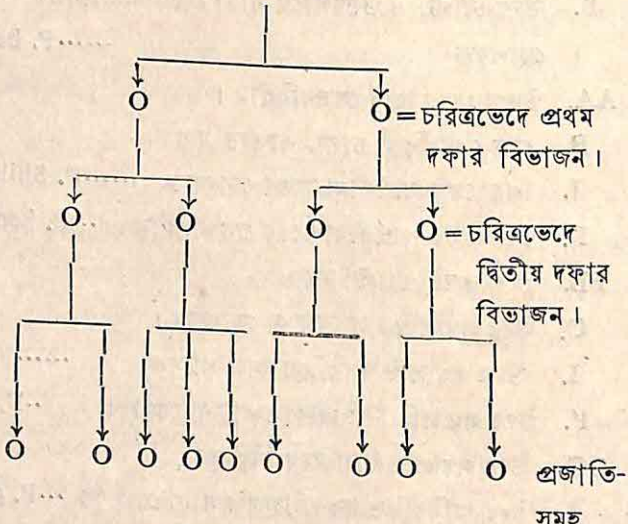
3. উদর অনিয়মিত গাঢ় বাদামী বিন্দুযুক্ত ...P. bhagirathae.

4. উদর অনিয়মিত গাঢ় বাদামী ছোপযুক্ত ...P. maliniae

(vi) **চিত্রে নির্দেশিকা** বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রধানত মাঠে-ময়দানে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী নন এমন লোকদের দ্বারা সনাক্তকরণেও এই প্রকারের নির্দেশিকা উপযোগী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ম্যালেরিয়া দমনে চিত্রের মাধ্যমে নির্দেশিকা দ্বারা এনোফেলিস মশার শূককীট সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া বিশেষজ্ঞ ছাড়াও সম্ভব হয়েছিল। নির্দেশিকা গঠনে প্রয়োজনের কথা এবং সেই প্রয়োজন অনুযায়ী চরিত্রের কথা খেয়াল রাখা দরকার। চরিত্র নির্ধারণই সনাক্তকরণের প্রধান নিয়ামক।

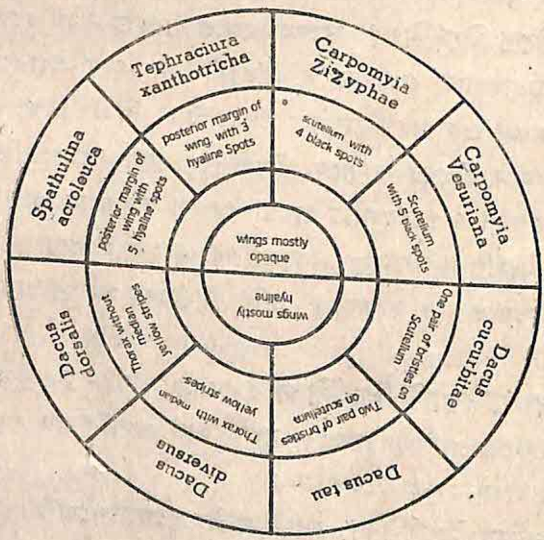
(vii) **শাখাবিস্তারি নির্দেশিকা** কোন কোন সময় খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে সংগ্রহক্ষেত্রে প্রাণিউপাদানকে সম্ভব হলে প্রজাতি স্তর পর্যন্ত পৃথক করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঃ

(viii) **বৃত্তিয় নির্দেশিকা** ছোট গোষ্ঠীর পক্ষে উপযোগী। বিশেষজ্ঞ নয় এমন লোকের। বিশেষত সংগ্রহ বা পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে প্রায়শই পেয়ে থাকেন, অথচ গুরুত্বপূর্ণ এমন সব প্রাণিউপাদানকে খুব তাড়াতাড়ি সনাক্তকরণের পক্ষে এই প্রকার নির্দেশিকা যথেষ্ট সহায়ক।



শাখাবিস্তার নির্দেশিকার ছক

বৃত্তিয় নির্দেশিকার একটি ছকের উদাহরণ (পতঙ্গ) নিম্নরূপ ঃ



সনাক্তকরণের বৃত্তিয় নির্দেশিকার (Circular type key) ছক। পতঙ্গের ছোট একটি গোষ্ঠীকে নমুনা হিসাবে দেখানো হয়েছে (V. C. Kapoor, 1983 অনুসারে)।

(ix) **বাক্স আকৃতির নির্দেশিকা ঃ** পূর্বের দুই ধরনের নির্দেশিকার মতই সাধারণ প্রজাতির খুব দ্রুত সনাক্তকরণে উপযোগী। উদাহরণ ব্যাখ্যার তুলনায় বেশী কার্যকরী হয়। ব্যবহৃত প্রজাতির নামগুলো কল্পিত, চরিত্রগুলো পতঙ্গে সাধারণত পাওয়া যায়।

completeta কম্প্লিটা	emerginata ইমার্জিনাটা	rufipes রুফিপেস্	nigripes নাইগ্রিপেস্
চোখ গোটা	চোখ নির্গত	পা-লাল	পা-কাল
শুঁঙ্গ ক্রকচ		শুঁঙ্গ সূত্রাকার	
ডানা অস্বচ্ছ			

californica কেলিফোরনিকা	flavicornis ফ্ল্যাভিকর্নিস	smithi স্মিথি	ruficornis রুফিকরনিস্
শুঁঙ্গ কাল	শুঁঙ্গ হলুদ	শুঁঙ্গ কাল	শুঁঙ্গ লাল
টারলাস টুকরোগুলো দ্বিপিণ্ড যুক্ত		টারলাস টুকরোগুলো রেখাকার	
ডানা স্বচ্ছ			

3. **চিত্রের সাহায্যে** প্রাণি উপাদান সনাক্তকরণ অনেক সময়ই হয়ে থাকে বিশেষত যেসব প্রাণিগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। চিত্র প্রাণীর প্রাকৃতিক রঙের হলে খুবই ভাল হয়। তবে সাদাকালো বা রেখাচিত্রেও চলতে পারে। যেসব গোষ্ঠীতে রঙের বিশেষ কোন ধারা বর্তমান সেক্ষেত্রে চিত্রের সাহায্যে সনাক্তকরণ যথেষ্ট সহায়ক হয়। কিছু স্তন্যপায়ী, পক্ষী, প্রজাপতি ইত্যাদি বিভাগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙের ধারা বর্তমান থাকায় রঙিন চিত্রের সাহায্যে বিন্যাস বিজ্ঞানী ব্যতিরেকেও প্রাথমিক সনাক্তকরণ সম্ভব। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় চিত্র সনাক্তকরণের পক্ষে অনেক সময় যথেষ্ট না হতে পারে। কিন্তু প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসে বিশেষত সনাক্তকরণে চিত্রের উপযোগিতা অদ্বিতীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সঠিক চিত্র সনাক্তকরণে যতটা সাহায্য করতে পারে অনেক সময় ব্যাখ্যা বা নির্দেশিকা

হয়তো তা পারে না।

4. সনাক্তকরণের অন্য উপায় **সরাসরি তুলনার** সাহায্যে। তবে সরাসরি তুলনার সাহায্যে প্রাণিউপাদান সনাক্ত করার কিছু পূর্বশর্ত থাকে। সরাসরি তুলনা করে সনাক্তকরণ যিনি করবেন তার কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কিছুটা পূর্ব প্রস্তুতি থাকা দরকার। কোন প্রাণি-উপাদানকে যে কোন পর্যায়ে সনাক্তকরণে সরাসরি পরিচিত প্রাণিউপাদানের সঙ্গে তুলনা করতে পারলে ভাল এবং সেক্ষেত্রে জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের (Type specimen) সঙ্গে তুলনাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু জাতিরূপ প্রাণি-উপাদানটির গুরুত্ব ও মূল্য এত বেশী যে নিয়মমাফিক সবরকম সনাক্তকরণে জাতিরূপ প্রাণিউপাদানটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা না করাই বিধেয়। এই সব বিচারে মনে করা হয়ে থাকে সরাসরি তুলনার মাধ্যমে সনাক্তকরণ অভিজ্ঞ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর পক্ষে সুবিধাজনক হলেও সবার পক্ষে এ পদ্ধতি সহায়ক না হওয়াই স্বাভাবিক। মূল বিবরণের পুঁথিপত্র কিংবা মূল বিবরণ যথেষ্ট না হলে পরবর্তী পুনর্মূল্যায়নের পুঁথিপত্র যথেষ্ট সহায়ক হয়।

সনাক্তকরণের যেসব পদ্ধতির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন একটিই সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট বা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, সেই কারণে সনাক্ত-করণে সাধারণত বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় বা ব্যবহার্য দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। যাকে বলা যেতে পারে সনাক্তকরণের সম্মিলিত পদ্ধতি।

সনাক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নিয়েও সনাক্তকরণে কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর বিভিন্ন পদ্ধতির উপযোগী অংশকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা এবং এ বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে।

সনাক্তকরণে সাধারণত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের নিচে তালিকাভুক্ত করা হল।

1. নির্দেশিকা সনাক্তকরণ সহায়ক হলেও কোন্ প্রাণীর বা কোন্ লিঙ্গের বা কোন্ দশার বা চারিত্রিক ভেদের ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ থাকে না।

2. চিত্র যথেষ্ট সহায়ক বটে কিন্তু চিত্র সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

প্রকাশ না করলে সাহায্য না করে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

3. মূল বিবরণে অস্পষ্টতা কিংবা যথেষ্ট রকমের অসম্পূর্ণতা থাকলে তাতে সনাক্তকরণে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করে।

4. সনাক্ত প্রাণিউপাদানের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করে সংগ্রহকে সনাক্তকরণ খুব সহজ নয়, কারণ সনাক্ত প্রাণিউপাদানকে পাওয়া অনেক সময়ই সহজ হয় না। এছাড়া একই প্রজাতি এমনকি গণের সনাক্ত প্রাণি-উপাদান না থাকতেও পারে। বিশেষত জাতিরূপ প্রাণিউপাদান পাওয়া তো অধিকাংশ সময়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার।

5. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়া অনেক সময়ই খুব সহজসাধ্য না হতে পারে। কোন কোন বিষয়ে যথার্থ বিশেষজ্ঞ জীবিত না থাকতে পারেন কিংবা বিশেষজ্ঞ দূরপ্রান্তে বসবাসকারী হতে পারেন। সাধারণত দেখা যায় বিশেষজ্ঞদের ব্যস্ততা ও অন্যান্য কারণে কোন মতামত পেতে অনেক সময় অতিক্রান্ত হয় কিংবা শেষ পর্যন্ত পাওয়াই যায় না। কোন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বা সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞের পক্ষে মতামত বা সাহায্য দেওয়া সহজ তবে প্রায়শই তারা অনেক বেশী সময় নিয়ে থাকেন।

সনাক্তকরণের প্রধান উদ্দেশ্য সেই প্রাণিগোষ্ঠীর নামকরণের মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসে ঐ গোষ্ঠীর যথাযথ স্থান নির্ধারণ করা এবং এই স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে অন্যান্য কাছাকাছির প্রাণিদলের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করা এবং ভবিষ্যৎ সনাক্তকরণ ও নামকরণে সহায়তা করা। এইসব উদ্দেশ্য সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন বোধ করা হয় সনাক্ত প্রাণিদলের বিবরণ বা বর্ণনা প্রকাশ করার।

বর্ণনার সাধারণত দুটি ধারা দেখা যায়। স্বাভাবিক চরিত্রের বিবরণ এবং নির্দেশক চরিত্রের উল্লেখ। দুটি ধারা কাছাকাছির হলেও কিন্তু এক নয়। নির্দেশক চরিত্রের উল্লেখে কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত পরিচিত প্রাণিদলের পার্থক্য স্পষ্ট হয় কিন্তু স্বাভাবিক চরিত্রের বিবরণে নির্দেশক চরিত্র ছাড়াও অন্যান্য তথ্যের যোগান দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পরিচিত গোষ্ঠী ছাড়াও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক বা চারিত্রিক তুলনা এবং শ্রেণীবিন্যাসের বাইরের বিভিন্ন দিকের তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

লিনিয়াস এবং অন্যান্য অনেক শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর মতে বর্ণনা

সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং নির্দেশক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ণনা যতই সবিস্তার এবং সতর্কতাপূর্ণ হোক জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের স্থলাভিষিক্ত হবার ক্ষমতা অর্জন করে না। সেই কারণেই বর্ণনার সঙ্গে অনেক সময়ই চিত্রের প্রয়োজন বোধ করা যায়। নতুন কোন প্রজাতির বিবরণে সাধারণত নিকটবর্তী প্রজাতিদের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং এই তারতম্যজনিত নির্দেশক চরিত্র নিরূপণকে ইংরাজীতে Differential diagnosis বলা হয়। কোন নতুন প্রজাতি, গণ বা অন্য কোন গোষ্ঠীর নামকরণ প্রথম যেটি প্রকাশিত হয়েছে তাকে **আদি বর্ণনা** হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে একে দুটি উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হতে হয়—পরবর্তী সময়ে গোষ্ঠীর পরিচয় ও সনাক্তকরণ সম্ভব হবে এবং নামকরণ সংহিতার 11 থেকে 16নং ধারার শর্তানুযায়ী নামটি প্রাপ্তি-যোগ্য হতে হবে।

একটি ভাল বর্ণনা দিতে হলে গবেষকের সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা, নামকরণ ও আকার সম্পর্কিত শব্দের জ্ঞান, তুলনাবিষয়ক জ্ঞান, শব্দ ও ভাষার সঠিক প্রয়োগ এবং ভবিষ্যৎ গবেষকের কথা মনে রাখা দরকার।

বিবরণের ভাষা সংক্ষিপ্ত এবং চরিত্র যথাযথ প্রতিভাত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবরণে চারিত্রিক গুরুত্বের কথা মনে রেখেও পারম্পর্য থাকা দরকার। বিবরণ শুধুমাত্র জাতিরূপ প্রাণিউপাদান ভিত্তিক হবার ঝোঁকটা বেশী থাকলেও গোষ্ঠীর অন্যান্য উপাদানকে অগ্রাহ্য করা অনেকেই অপছন্দ করতে সুরু করেছেন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রজন সম্পর্কে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

অষ্টম অধ্যায়
প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক প্রকাশন

প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক প্রকাশন শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক প্রকাশনের গুরুত্ব শিক্ষানবীশ বা বিশেষজ্ঞ সবার পক্ষেই যথেষ্ট। এ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে যেমন গবেষণার যথেষ্ট উপাদান বা সংগ্রহ থাকা সত্বেও গবেষণায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি প্রকাশনার জ্ঞানের অভাবে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু বা দৃষ্টিকোণ কি হবে তা ঠিক করাও কষ্টকর হয়। এইসব কারণে প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক প্রধান প্রধান কিছু প্রকাশন ও প্রকাশনার প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রধান প্রধান প্রকাশন:

সংগ্রহের সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে প্রধান দু-তিনটি প্রকাশনার নাম উল্লেখ যদিও করা হয়েছে কিন্তু প্রধান প্রধান প্রকাশন সম্পর্কে আরও কিছু উল্লেখ প্রয়োজন।

1. Zoological Record (প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক নথি): Gunther প্রমুখ কিছু শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় 1864 খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাৎসরিক সংখ্যা হিসেবে 'The Record of Zoological Literature' নামে প্রকাশ হতে থাকে। 1870 খ্রীষ্টাব্দে British Association of Advancement of Science-এর আনুকূল্যে 'The Zoological Record' নতুন নামে প্রকাশিত হয় এবং 1871 খ্রীঃ থেকে 1885 খ্রীঃ পর্যন্ত 'Zoological Record Association' নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা এর প্রকাশের দায়িত্ব বহন করে। 1886 খ্রীঃ 'Zoological Society of London' দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন 1906 খ্রীঃ থেকে 1914 খ্রীঃ 'Zoological Record'-এর প্রকাশ বন্ধ ছিল। তবে এই সময়ে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক প্রকাশনার অনুক্রমণ 'International Catalogue of Scientific Literature' এর মধ্যে চলেছে। 1915 খ্রীঃ থেকে 'Zoological Society of London' 'Zoological Record' প্রকাশের দায়িত্ব আবার গ্রহণ করে

এবং British Museum (Natiural History) এবং Commonwealth Institute of Entomology, London এর সহযোগিতায় 1980 খ্রীঃ পর্যন্ত 114টি সংখ্যা প্রকাশ করে। 1980 খ্রীঃ 12 মার্চ Zoological Society ফিলাডেলফিয়ার Biosciences Information Service-এর সঙ্গে Zoological Record-এর 115নং সংখ্যা থেকে প্রকাশ করার বিষয়ে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে।

Zoological Record-এর প্রতি সংখ্যা প্রাণীদের বিভাগ অনুযায়ী কতগুলি বিভাগে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সময়ের ধারণা অনুসারে এই সংখ্যার কম বেশী হয়েছে। বর্তমানে Zoological Record-এর কুড়িটি বিভাগ আছে। এতে যত বেশী সম্ভব প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার অনুক্রমণী থাকে। তবে জনপ্রিয় প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অনুক্রমণীর সংখ্যা বেড়ে বেড়ে বর্তমানে ছ'হাজারেরও বেশী পত্র-পত্রিকার প্রায় 45,000-এর মত দাঁড়িয়েছে। Zoological Record-এর প্রকাশ এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেছে।

Zoological Record পাঠ ও আলোচনায় শ্রেষ্ঠ উপায় আধুনিকতম সংখ্যা থেকে সুরু করে পিছনের দিকে যাওয়া। এই পথে আধুনিক কোন সংশোধন (Revision) বা তালিকা (Catalogue) পেলে আর পিছনে যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। গোত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীর নাম ইংরাজী বর্ণানুক্রমিক থাকে, তবে গোত্রকে সাজানো হয় শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতিতে। এতে নতুন নাম, বহুনাম, বিস্তারণ এবং কোথাও কোথাও জৈবিক উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণা প্রবন্ধের পুরো নাম বিভাগের গোড়ার দিকে গবেষকের নামের বর্ণনাক্রমিক ভাবে সাজানো থাকে।

Zoological Record সম্পূর্ণ সংখ্যা বা বিভাগ হিসাবে Zoological Society, London, Regent's Park, London, N.W.I, 4 Ry, England এই ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করা যায়, তবে পতঙ্গ (insect) বিভাগ Commonwealth Institute of Entomology, 56, Queen's gate, London, S.W. 7 ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। 103-এর পূর্ববর্তী 65-71 এবং 85-102 সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করার ঠিকানা Academic Press, 24-28 Oval Road, London NWI 7 DX, England, 115 ও পরবর্তী সংখ্যা Biosis, Philadelphia, U.S.A. 191003 থেকেও সংগ্রহ করা

যায়।

2. Biological Abstracts : Zoological Record যেহেতু কয়েক বছর পিছিয়ে থাকে, আধুনিকতম পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা পাবার পক্ষে Biological Abstracts অনেকটা সহায়ক। 1926 খ্রীঃ থেকে Biosciences Information Service, 2100 Arch Street, Pennsylvania নিয়মিত দ্বৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক তথ্য জীব শ্রেণী-বিন্যাস পদ্ধতি (Systematic Biology) অংশে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার থাকে। 1970 খ্রীঃ থেকে Abstracts of Entomology নামে পৃথকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে Biological Abstracts-এর Arachnids সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং Bioresearch Index-কে সংকলিত করা হচ্ছে। এর প্রতি প্রকাশনে Biological Abstracts-এর দুই সংখ্যা ও Bioresearch Index-এর এক সংখ্যার বিষয় সংকলিত থাকছে।

3. Entomology Abstracts : এই প্রকাশনটি 1969 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি সংখ্যায় 3000 পত্রিকার 8000-এর মত অনুক্রমণী অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এতে উল্লিখিত পতঙ্গের গোত্র পর্যায় পর্যন্ত শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করা হয় এবং গ্রন্থপঞ্জীসহ গবেষণাপত্র বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ থাকায় বিশেষ সহায়ক হয়। এটি প্রকাশিত হয় Information Retrieval Limited, 1 Falconberg Court London, WIV 5 FG, England থেকে।

4. Helminthology Abstracts : এটি 1932 খ্রীঃ থেকে Commonwealth Institute of Helminthology, The White House, 103 Peter's Street, St. Albans, Herts, A.L.I.O.K দ্বারা নিয়মিত মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

5. Nomenclator Zoologicus : এটি প্রকাশিত হয় Zoological Society of London দ্বারা। এতে Systema Naturae-এর দশম সংস্করণের সময় অর্থাৎ 1758 খ্রীঃ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জিসহ সব গণ ও উপ-গণের নামের ধারাবাহিক তালিকা থাকে। Neave সংকলিত Nomenclator Zoologicus-এর প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যায় 1758 খ্রীঃ থেকে 1935 খ্রীঃ পর্যন্ত প্রকাশিত নাম আছে, পঞ্চম সংখ্যায় 1936 খ্রীঃ থেকে 1945 খ্রীঃ পর্যন্ত প্রকাশিত নাম, ষষ্ঠ সংখ্যায় 1946 খ্রীঃ থেকে 1955 খ্রীঃ

পর্যন্ত প্রকাশিত নাম এবং সপ্তম সংখ্যায় 1956 খ্রীঃ থেকে 1965 খ্রীঃ পর্যন্ত প্রকাশিত নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই নামের তালিকা জানা খুবই প্রয়োজনীয়।

6. International Code of Zoological Nomenclature : নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হবে।

7. Bulletin of Zoological Nomenclature : 1907 খ্রীঃ থেকে 1956 খ্রীঃ পর্যন্ত 568টি মতামত প্রকাশ করা হয়। Francis Hemming International Commission of Zoological Nomenclature-এর মতামত ও ঘোষণা 27টি সংখ্যায় সংকলিত করেন। নামকরণ সম্পর্কিত সমস্যাবিষয়ক বিতর্ক প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 1943 খ্রীঃ Bulletin of Zoological Nomenclature নামে একটি বিশেষ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও আছে Lists and indexes containing the Rejected and Approved Names।

8. The Century of Dictionary : Century Company, New York ছটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এটি জীববিজ্ঞানের নাম সম্পর্কে সব-থেকে ভাল নির্দেশক।

9. Bibliography of Agriculture with Subject Index : এটি মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয় Oryx Press, 3930 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85018, U.S.A. দ্বারা। এটি প্রকাশের প্রয়োজনীয় তথ্য যোগান দেয় National Agricultural Library, U.S., Department of Agriculture, Taxonomic Entomology বিভাগে পতঙ্গ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য এবং আধুনিক পত্র-পত্রিকার উল্লেখ থাকে।

10. Systematic Zoology : 1951 খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সেই থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে প্রজাতি ও উচ্চতর টেক্সার বিস্তারণ পদ্ধতি, আচরণ, টেক্সোমেট্রিক্স, ভেদাভেদ, অবলুপ্তি, রক্তমস্তবিদ্যা, প্রজাতি উদ্ভব, বিবর্তনের হার ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণা প্রবন্ধ থাকে। প্রকাশনটি শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী।

11. অন্যান্য অসংখ্য বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, যাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে

অপরিসীম।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত গবেষণা সম্পূর্ণ হয় না। ফলে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশিত করার প্রচেষ্টা গবেষককে রাখতেই হয়। প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক গবেষণাভিত্তিক প্রকাশন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। প্রধান প্রধান প্রকার নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রকাশনার প্রকার ঃ

1. **নতুন টেক্সার বিবরণ** (Description of Newtaxa) ঃ এই প্রকার প্রকাশনায় নতুন উপ-প্রজাতি, প্রজাতি বা গণের বিবরণ থাকে। তবে এই আলোচনা যদি সংশোধন বা পুনরালোচনামূলক বিবরণ বা জৈব ভৌগোলিক সম্পর্ক বা অর্থনৈতিক কিংবা অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী না হয়, শুধুমাত্র বিবরণ প্রকাশ যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক হয় না।

2. **সংক্ষিপ্তসার ও পুনর্বীক্ষণ** (Synopsis and Review) ঃ সমকালীন জ্ঞানের ভিত্তিতে কোন প্রাণিদল সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থানের বিক্ষিপ্ত তথ্য সংক্ষেপে একত্রিতভাবে প্রকাশ করা হয় এই ধারার প্রকাশনায়। এতে নতুন প্রাণি-উপাদান বা ব্যাখ্যা নাও সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সংশোধন বা মনোগ্রাফ প্রণয়নে এরা খুব সহায়ক।

3. **সংশোধন** (Revision) ঃ সংশোধন বা পুনরালোচনায় পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে নতুন উপাদান সংযোজিত অথবা নতুন ব্যাখ্যা সম্বলিত হয়। সংশোধনের উপস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনটা মনোগ্রাফধর্মী, কোনটা প্রাণিপুঞ্জের নতুন বিন্যাসধর্মী। যে সব গোষ্ঠীতে ক্রমাগত নতুন নতুন প্রজাতি সংযোজিত হচ্ছে সে সব প্রাণিদলে সংশোধন গুরুত্বপূর্ণ। এই সংশোধন বা পুনরালোচনা আকার অনুযায়ী সম্পূর্ণ কোন গোত্রের বা উপ-গোত্রের অথবা গণের এমনকি গণাংশেরও হতে পারে। কেউ কেউ গণ উচ্চতর বিভাগের সংশোধন এবং চরিত্র ও জাতিজনি সম্পর্কভিত্তিক পর্যায় নির্ধারণও করেন।

4. **মনোগ্রাফ ঃ** মনোগ্রাফকে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রকাশন ভাবা হয়। এতে শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত সম্পূর্ণ আলোচনা ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত গণ, প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির অভিব্যক্তি, তুলনামূলক ভ্রূণবিদ্যা ইত্যাদি

বিষয়ক এবং অর্থনৈতিক দিকের আলোচনা উল্লিখিত থাকে অর্থাৎ মনোগ্রাফ অন্তর্ভুক্ত প্রাণীর বা প্রাণিগোষ্ঠীর আলোচনা বিভিন্ন দিক বা প্রয়োজনীয় সব দিকের দৃষ্টিতে করা হয় বলেই একে সম্পূর্ণ মনে করা হয়। অন্যান্য যে কোন প্রকার প্রকাশনের তুলনায় মনোগ্রাফের অসুবিধা অনেক বেশী। কারণ এতে অনেক সংখ্যার ও রকমের তথ্য প্রয়োজন হয়। তবে আধুনিক ক্রমবর্ধমান তথ্য ও সংগ্রহের যোগানের ফলে কিছুটা সুবিধা দেখা যাচ্ছে।

5. **মানচিত্র** (Atlases)ঃ কোন কোন শ্রেণীবিন্যাসগত বিভাগে প্রজাতিদের সম্পর্কিত মানসিক চিত্র কথায় বা বিবরণে প্রকাশের অসম্পূর্ণতার বোধ থেকে মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। অনেক সময় মানচিত্রের সমগোত্রীয় চিত্রেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

6. **প্রাণিকূল সংক্রান্ত গবেষণা** (Faunal Works) **বিষয়ক প্রকাশন**ঃ কোন প্রাণিকূল সংক্রান্ত গবেষণার পরিধি নির্ভর করে প্রাণি-গোষ্ঠীর তুলনায় ভৌগোলিক পরিসীমার উপর। এই বাস্তবানুগ সীমা যত বেশী প্রসারিত হয় তত বেশী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান বিষয়ক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। প্রাণিকূল বিষয়ক গবেষণা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ও পরিধির হতে পারে। কোন দেশের বা তাৎপর্যপূর্ণ কোন অঞ্চলের হতে পারে। অঞ্চলের পরিধি নির্ধারণে স্থলভাগের উচ্চতা, পরিবেশ অর্থাৎ উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, উদ্ভিদ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিচারে করা হয়ে থাকে। জলভাগের পরিধি নির্ধারণ হয়ে থাকে জলের তাপমাত্রা, গভীরতা, লবণত্ব, স্রোত, উদ্ভিদকূল ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি করে।

প্রাণিকূল বিষয়ক গবেষণায় জীব ভৌগোলিক বিষয়, বাস্তব্য বিষয় অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের প্রাণিকূলের শুধু পরিচিতিই যথেষ্ট নয় ঐ প্রাণিকূলের পরিবেশগত সম্পর্ক, বিবরণ ও বিভিন্ন জৈবিক বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক নির্ধারণ করাও আধুনিক ধারার বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই প্রাণিকূল পর্যালোচনার সহসা সংশোধনের সম্ভাবনা কম থাকা জনিত ত্রুটি সত্ত্বেও এই ধরনের গবেষণায় অনেক বেশী তথ্য যোগাতে সমর্থ এবং এই ধারার প্রকাশন মনো-গ্রাফের সমতুল্য না হলেও যথেষ্ট তথ্যবহ।

7. **ভৌম অনুবর্তিক, হাতে রাখার মত বই ও সারগ্রন্থ** (Field guides, Handbook and Manuals)ঃ এই ধরনের প্রকাশন প্রধানত সনাক্তকরণের চরিত্র বা নির্দেশক চরিত্র কিংবা কোন প্রাণিবিভাগের সম্পর্কে

জীববৈজ্ঞানিক ও বিস্তারণ বিষয়ক তথ্যের উল্লেখ থাকে। এ ধরনের প্রকাশনায় নতুন প্রজাতির বিবরণ না থাকাই বিধেয়। এ সব প্রকাশন সংগ্রহ ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্রের সহায়ক পুস্তক হিসেবে বেশী কার্যকরী।

8. **প্রাণিতালিকা ও নিরীক্ষিত তালিকা** (Catalogue and Checklist) ঃ প্রাণিতালিকায় প্রাণিগোষ্ঠীকে এমনভাবে সাজান হয়ে থাকে যাতে এক নজরে প্রাণিগোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রকাশিত বিষয়গুলি এবং নামকরণ সহজেই নজরে আসতে পারে। তালিকায় সাধারণত গোত্র শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সাজান হয় এবং গণ ও প্রজাতি বর্ণানুক্রমে সাজান থাকে। তালিকা প্রণয়ন ধৈর্য ও সময় সাপেক্ষ এবং পদ্ধতি ও তথ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিরীক্ষিত তালিকা বাস্তবে একটি সংক্ষিপ্তসার। এতে উল্লেখ্য প্রাণিবিভাগের শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো দেওয়া থাকে এবং সহজেই এই কাঠামোর সাহায্যে কোন প্রাণিউপাদানের নামকরণ করা যায়।

9. **অভিব্যক্তি ও জীব বৈজ্ঞানিক প্রকাশন** (Evolutionary and Biological Publications) ঃ সংশোধন ও মনোগ্রাফ জাতের প্রকাশন ছাড়াও কিছু কিছু প্রকাশন দেখা যায় যাতে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী বাস্তব্য, অভিব্যক্তিমূলক, প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তারণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের তথ্য ও আলোচনা গ্রথিত করে থাকেন।

কিছু সংশ্লিষ্ট ল্যাটিন সংক্ষেপ

শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে সচরাচর ব্যবহৃত কিছু ল্যাটিন সংক্ষেপের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক।

aff. (*affinis*)—কাছাকাছি, সম্পর্কযুক্ত।

al, alli (*alorum*)—অন্যরা, অন্যদের কিন্তু একই রকমের নয়।

ap. (*apud*)—সঙ্গে, এর কাজে,…এ দেখা।

auct. (*auctorum*)—লেখক বা গবেষকের।

auct. non. (*auctorum non*)—নয়, ভুল ব্যবহৃত নাম বোঝাতে।

ca. (*circa*)—(তারিখ) সম্পর্কে।

cf., cfr. (*confer*)—তুলনা।

cit. (*citatus*)—উল্লিখিত।

comb. nor. (*Combination nova*)—নতুন সমাবদ্ধ।

descr. (*descripto*)—বিবরণ।

e. p. (*ex parte*)—অংশত।

et. al. (*et. alia*)—এবং অন্যান্যরা।

excl. gen. (*exclususo genere*)—গণের সঙ্গে বর্জিত।

excl. spec. (*exclususo speceii*)—প্রজাতির সঙ্গে বর্জিত।

excl. spec., *excl. specim* (*exclusis speciminibus*)—প্রাণিউপাদানের সঙ্গে বর্জিত।

gen. nov. (*genus novum*)—নতুন গণ।

ib., *ibid.* (*ibidem*)—একই।

in litt. (*inlitteris*)—পত্র বিনিময়ে।

l.c., *loc. cit.* (*loco citato*)—স্থান উল্লিখিত।

nom. ambig. (*nomen ambiguum*)—অস্পষ্ট নাম।

nom. conf. (*nomen confusus*)—বিশৃঙ্খল নাম।

nom. cons, non conserve. (*nomen conservadum*)—সংরক্ষিত নাম।

nom. dub. (*nomen dobium*)—সন্দেহজনক নাম।

n. n., *nom. nud.* (*nomen nudum*)—আবরণহীন নাম।

nom. rejic. (*nomen rejiciendum*)—বর্জিত বা বর্জনযোগ্য নাম।

nom. oblit. (*nomen oblitum*)—বিস্মৃত নাম।

op. cit. (*opera citato*)—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

sched. (*seheda*)—মোড়ক (Label)।

sp. (*specie*) : প্রজাতি (একবচনে)।

specie indeterminata—অনির্ধারিত প্রজাতি।

spp. (*specie*)—প্রজাতি (বহুবচনে)।

ssp.—উপ প্রজাতি।

sspp.—উপপ্রজাতি (বহুবচনে)।

stat. nov. (*status novus*)—নতুন পর্যায় বা অবস্থা।

syn. (*synonymum*)—প্রতিনাম (সমার্থক ভিন্ন নাম)।

typ., cons. (*typus conservandus*)—সংরক্ষণযোগ্য জাতিরূপ।

নবম অধ্যায়

প্রাণী নামকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী

প্রাণিবিজ্ঞানীদের প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য প্রাণি-উপাদান নিয়ে কাজ করতে হয় বলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাণীদের সুবিন্যস্তভাবে রাখা, তাদের নাম দেওয়া এবং বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বাস্তব প্রাণীদের এবং তাদের বিভিন্ন স্তরের নামকরণ প্রাণীসংক্রান্ত তথ্য যোগানোর একটি পূর্বশর্ত। অন্যভাবে বলা যায় প্রাণী ও তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের নামকরণ নিজেরাই একটি যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠে।

ল্যাটিন nomen (নাম) ও clare (ডাকা) এই দুটি শব্দ সমন্বয়ে Nomenclature (নামে ডাকা বা নামকরণ) শব্দটি প্রচলিত হয়। জীব ও অজৈবিক বস্তুর নামকরণ যদিও প্রাক্ সভ্যতার যুগ থেকে স্থানীয় ভাষা ও উপ-ভাষায় হয়ে আসছে, কিন্তু জীবের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটে লিনিয়াসের সময় থেকে। বৈজ্ঞানিক নামকরণ পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমেই পৃথিবীময় সঠিক যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রাণীদের নামকরণের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু নাম সম্পর্কে অত্যুৎসাহ অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টিও করতে পারে। কেউ কেউ অনেক সময় ভুলেই যান যে নামটি প্রাণীটিকে পরিচিত করার একটি উপায়মাত্র, নামকরণই প্রাণী সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের ন্যায় প্রাণী নামকরণেও অন্তত তিনটি পূর্বশর্ত অবশ্য পালনীয়। প্রথমত নামটি **অনন্য** হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ একই নাম বিভিন্ন প্রাণিদলের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না বা একই প্রাণী বা প্রাণিদলের একাধিক নাম থাকবে না বা থাকলেও কোন্ নামটি গ্রাহ্য তাও নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত নামটি **বিশ্বজনীন** হওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন ভাষা, উপ-ভাষায় প্রচলিত নাম সমস্যাবৃদ্ধি ঘটায় বলে বিশ্বজোড়া ব্যপ্তি ও প্রচলনের স্বার্থে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীরা একটিমাত্র ভাষা ল্যাটিন বা ল্যাটিনসম কিংবা ল্যাটিনভব নামকেই বিশ্বজোড়া প্রচলন যোগ্য বলে মেনে

নিয়েছেন। তৃতীয়ত নামটির **স্থায়িত্ব** থাকা প্রয়োজন। কোন জীব বা বস্তুকে আজ এক নামে কাল অন্যনামে খেয়ালখুশীমত পরিচিত করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই পূর্বশর্তগুলির উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বিগত দুই শতকে প্রাণীদের নামের পরিবর্তন ঘটেছে অসংখ্যবার। এই তিনটি পূর্ব শর্ত বোঝাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে **নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক নামকরণের স্থায়িত্ব, অনন্যতা ও বিশ্বজনীনতা সুনিশ্চিত করা।** প্রাণী নামকরণ বিষয়ক সব শিক্ষা বা নিয়মই এই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে নজর রেখে। তবে তার অর্থ এ নয় যে শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীকে সব সময় স্থাপিত শ্রেণীবিভাগ বা ট্যাক্সা মেনে নিতে হবে। নিয়মাবলীতে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করার পক্ষেও জোর দেওয়া হয়েছে এবং শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের স্বার্থেই পরীক্ষা নিরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেও বলা হয়েছে।

প্রাণী নামকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীর (সংহিতার) আবির্ভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে নিজস্ব ভাষা, উপ-ভাষায় প্রাণীদের বিভিন্ন নামে পরিচিত করা হয় কিন্তু ভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে ঐ নাম কোন তথ্য বহন করে না। বলা যায় আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণ যোগাযোগের কোন সহায়তা করে না। ফলে আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণজনিত সমস্যা সমাধানের কথা ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রাণিবিজ্ঞানী ও প্রত্নজীব বিজ্ঞানীদের মনে দেখা দেয়।

প্রথমে লিনিয়াস 1737 খ্রীষ্টাব্দে 'ক্রিটিকা বোটানিকা' (Critica Botanica) এবং 1751 খ্রীষ্টাব্দে 'ফিলোসফিকা বোটানিকা' (Philosophica Botanica) গ্রন্থে নামকরণ সংক্রান্ত কিছু নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেন এবং এই কারণে তাঁকে 'জীব নামকরণ পদ্ধতির জনক' নামে অভিহিত করা হয়। 1778 খ্রীষ্টাব্দে Fabricius 'ফিলোসফিকা এণ্টমলজিকায়' (Philosophica Entomologica) পতঙ্গের নামকরণ করেন এবং লিনিয়াসের নামকরণ বিষয়ক নিয়মের উন্নতি ঘটান। 1801 খ্রীষ্টাব্দে Rudalphi কিছু নিয়ম উপস্থাপনা করেন। তাতে বরং অস্পষ্টতাই বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ঊনবিংশ শতকে লিনিয়াসের মণীষার স্মৃতি ক্ষীণ হতে থাকে এবং আঞ্চলিক

নামের প্রচলন বাড়তে থাকে। তবে এই শতকেও নামকরণ বিষয়ক কিছু কিছু নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়। The British Association for Advancement of Science কেন্দ্রিয়ভাবে সম্মত একটি আইনের সংহিতা প্রণয়ন করার কথা ভাবেন এবং 1843 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বিজ্ঞানী Strickland-এর সভাপতিত্বে সম্পাদিত 'স্ট্রীকল্যাণ্ডিয়ান কোড'টি গৃহীত হয় এবং ফ্রান্স ও ইতালী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এটি পরে 1863 খ্রীষ্টাব্দেও 1865 খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তনসহ প্রকাশিত হয়। 1877 খ্রীষ্টাব্দে W. H. Dall-এর সভাপতিত্বে American Association for Advancement of Science 'ডালের নিধি' (Dull's code) নামে আর একটি সংহিতা প্রণয়ন করেন। 1881 খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্রান্স কোড' এবং জীবাশ্মদের নামকরণের 'ডুভিল কোড' (Douville code), 1885 খ্রীষ্টাব্দে 'ষ্ট্রীকল্যাণ্ড কোড'-এর অবলম্বনে American Ornithologists Union-এর প্রণীত সংহিতা, 1894 খ্রীষ্টাব্দের জার্মান সংহিতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্যারিসে অনুষ্ঠিত 1 89 খ্রীষ্টাব্দের প্রথম আন্তর্জাতির প্রাণিবিদ্যা কংগ্রেসে অধ্যাপক Blanchard-এর সৃষ্ট একপ্রস্থ নিয়মাবলী উপস্থাপিত করা হয়, কিন্তু তা গৃহীত হয় মস্কোয় অনুষ্ঠিত 1892 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কংগ্রেসে। 1895 খ্রীষ্টাব্দে লিডেনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কংগ্রেসে এই নিয়মাবলীকে ফরাসী সৃষ্ট বলে বলা হয় এবং সকল প্রাণিবিজ্ঞানীদের গ্রহণযোগ্য একপ্রস্থ নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয়। প্রাণিবিজ্ঞানী ও প্রত্নজীব বিজ্ঞানীরা প্রাণী নামকরণ নিয়মাবলীর একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। এই খসড়াটি বাস্তবে বার্লিনে অনুষ্ঠিত 1901 সালের পঞ্চম আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞানীদের কংগ্রেসে গৃহীত হয়। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে 1904 সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরে 1905 সালে 'আন্তর্জাতিক প্রাণী নামকরণের নিয়মাবলী' (Regles Internationales dela Nomenclature Zoologique) নামে প্যারিসে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী অনুষ্ঠিত কংগ্রেসগুলিতে বিভিন্ন ধারার কিছু কিছু সংশোধন ঘটে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কংগ্রেসগুলিতে, বিশেষত 1948 খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যারিসের, 1953 খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কোপেন হেগেনের এবং 1958 খ্রীষ্টাবে অনুষ্ঠিত লণ্ডন কংগ্রেসে বিরাট ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রয়োজন অনুভূত হয় নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্তনের বা পুনঃ

সম্পাদনার। সঙ্গে উপস্থাপিত হয় প্রাণী নামকরণ সম্পর্কিত আইনগত বিষয়। এই পরিস্থিতিতেই Norman R. Stoll-এর সভাপতিত্বে এক সম্পাদক মণ্ডলীর গ্রন্থনায় **'প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংহিতা'** (International Code of Zoological Nomenclature) নামক প্রামাণ্য দলিলটি লিপিবদ্ধ হয় এবং সংকলনটি 1961 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞানীদের কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এই দলিলটি 1961 সালের 6 নভেম্বর প্রচারিত হওয়ার দিন থেকেই কার্যকরী হয়। ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠদশ প্রাণিবিজ্ঞানীদের কংগ্রেসে 11, 31, 39 ও 60 নং ধারাগুলোর ছোটখাট কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং এই সব পরিবর্তন 1964 সালের সংস্করণে সংশোধিত হয়।

এই দলিলটি সর্বাংশে নিখুঁত এ দাবী হয়তো যুক্তিযুক্ত নয় এবং কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন বোধ করাও অস্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও এই দলিলটি স্বচ্ছতা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার জন্য অসাধারণ দলিল হিসেবে গণ্য হবার দাবী রাখে। পূর্ববর্তী দলিলে যে সব বিষয় সম্পর্কে শুধুমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া ছিল এই নতুন সংহিতায় সে সব বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং ধারাগুলোকে ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে সুস্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংহিতার অনেক অনুচ্ছেদেই বিপরীত-মুখী মতামতের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এবং যুক্তিতর্ক ও বাস্তব বিচারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটেছে। এই দলিলে শ্রেণীবিন্যাসের ঋজুতা ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দুই শতকের চিন্তাধারার প্রতিফল ঘটেছে।

এখানে উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞানীদের কংগ্রেস একটি পরিষদীয় সংস্থা (Lagislative body) এবং এই কংগ্রেসই দলিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী রচনা করেন ও প্রাণী নামকরণ সম্পর্কিত কমিশন নিযুক্ত করে থাকেন। কমিশন কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত একটি বিচার বিভাগীয় সংস্থা (Judicial body)।

প্রাণী নামকরণ সংহিতার বিষয়বস্তু

1964 সালের সংশোধিত এই সংহিতায় একটি ভূমিকা 18টি অনুচ্ছেদ, 86টি ধারা (31 নং ধারাটি 1963 সালে বাতিল হয়ে যায়), 5টি পরিশিষ্ট

(Appendix), একটি অনুমোদিত পরিভাষার তালিকা এবং একটি বিস্তৃত সূচীপত্র স্থান পেয়েছে। সংহিতায় ল্যাটিনের পাশাপাশি ফরাসী ও ইংরেজী ভাষাও দেওয়া আছে।

প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের পাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী নামকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করা যায়। এই কারণেই সংহিতার ভূমিকা, কিছু ধারা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ধারার ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হচ্ছে। উৎসাহী পাঠক সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে এই সংহিতা পেতে পারেন বা International Trust for Zoological Nomenclature-এর অফিস (14 বেলগ্রেড স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লু 1) থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

ভূমিকা

প্রাণিজগতের নামকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংহিতা আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞান কংগ্রেসের অনুমোদিত কতগুলো ধারা ও সুপারিশের সমষ্টি। এই দলিলটির উদ্দেশ্য প্রাণীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক নামকরণের স্থায়িত্ব, অনন্যতা ও বিশ্বজনীনতা সুস্পষ্ট করা। এর সবগুলো অনুবিধিই এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত। কিন্তু কোন ধারারই উদ্দেশ্য নয় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানের চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করা।

নামকরণে পূর্বিতা মূলনীতি বিবেচিত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বহুকাল থেকে প্রচলিত অর্থের সঙ্গতিপূর্ণ কোন নামকে রক্ষা করার প্রয়োজনে ঐ ধারাকে কিছুটা পরিবর্তিত ভাবে ব্যবহার করা হতে পারে।

নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে নামের স্থায়িত্ব যদি বিপন্ন হয়ে উঠে, আন্তর্জাতিক কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ বলে ঐ ধারার আক্ষরিক প্রয়োগ সেক্ষেত্রে স্থগিত থাকতে পারে।

I. প্রাণী নামকরণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলী

ধারা—1. প্রাণী নামকরণ প্রকৃতিকে বর্তমান অথবা অবলুপ্ত প্রাণীদের বিন্যাসগত এককের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ বোঝায়। এই নিয়মাবলী প্রাণীদের গোত্র, গণ, প্রজাতির নামকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে অস্বাভাবিক কোন প্রাণী উপাদানের নাম, ধারণাপ্রসূত কোন নাম, উপ-

প্রজাতি নিম্নতর সংকর প্রাণীর নাম ইত্যাদি এই বিধির বিচার্য বিষয় নয়।

ধারা—2. প্রাণী নামকরণের স্বাধীনতা: অন্য কোন নামকরণ পদ্ধতি থেকে প্রাণী নামকরণ পদ্ধতি স্বাধীন। অন্য কোন পদ্ধতিতে কোন নাম প্রচলিত থাকলেও প্রাণী ট্যাক্সা নামকরণ পদ্ধতিতে নামটি বাতিল বলে গণ্য নয়।

(a) **ট্যাক্সার প্রাণিজগতে বদলি:** কোন ট্যাক্সা প্রাণিজগতে স্থান পেলে আদি তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম সহ ট্যাক্সার নাম বা নামগুলো প্রাণী নামকরণ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(b) **ট্যাক্সার প্রাণিজগৎ থেকে বহিষ্কার:** কোন ট্যাক্সা প্রাণিজগৎ থেকে বহিষ্কৃত হলেও এর নাম বা নামগুলো প্রাণিজগতের নামের সঙ্গে সম নাম হিসেবে চলতে থাকে।

ধারা—3. সূচনা মুহূর্ত: লিনিয়াসের Systema Naturae-এর দশম সংস্করণের প্রকাশের সময়কেই প্রাণিবিজ্ঞানে দ্বিপদ নামকরণ প্রবর্তনের মুহূর্ত বলে ধরা হয়। 1758 সালের 1 জানুয়ারীকেই Systema Naturae-এর দশম সংস্করণের প্রকাশ ও নামকরণ পদ্ধতির সূচনা মুহূর্ত বলে ধরা হয়। 1758 সালে প্রকাশিত অন্যান্য কাজকে পরবর্তী প্রকাশন বলে ধরা হয়েছে।

II. প্রাণীবিজ্ঞান সম্মত নামে শব্দের সংখ্যা

ধারা—4. প্রজাতি উচ্চতর পর্যায়ের ট্যাক্সা: প্রজাতি উচ্চতর পর্যায়ের ট্যাক্সার নাম একটি শব্দযুক্ত হয় (Uninominal)।

ধারা—5. প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি: প্রজাতির নাম দুটি শব্দযুক্ত হয় (Binomen) এবং উপ-প্রজাতির নাম তিনটি শব্দযুক্ত হয় (Trinomen)। প্রতিক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি গণের নাম, দ্বিতীয় শব্দটি প্রজাতির নাম এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তৃতীয় শব্দটি উপ-প্রজাতির নাম বোঝায়।

ধারা—6. উপ-গণ: গণ ও প্রজাতির নামের সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে উপ-গণেরও উল্লেখ থাকে সেখানে বন্ধনীর মধ্যে ঐ দুটি নামের মাঝে উপ-গণের নামটি প্রকাশ করা হয়। এটিকে প্রজাতির দ্বিপদ নাম বা উপ-প্রজাতির ত্রিপদ নামের কোন শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

III. প্রকাশনার নির্ণায়ক

ধারা—7. প্রয়োগ : এই অনুচ্ছেদের বিধানগুলো নতুন নাম এবং নামকরণ সংক্রান্ত যে কোন প্রকাশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ধারা—8. প্রকাশনে কি থাকবে : এই সংহিতার অর্থানুসারে কোন কাজ (গবেষণা) প্রকাশিত বলে গণ্য হতে হলে প্রথম প্রকাশে অবশ্যই—

(1) এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে বহু সংখ্যক অনুরূপ অনুলিপি পাওয়া সুনিশ্চি হয়।

(2) প্রচারিত হবে বিজ্ঞান, জনসাধারণ এবং স্থায়ী নথীর উদ্দেশ্যে।

(3) ক্রয়যোগ্য অথবা বিনামূল্যে বিলিযোগ্য হবে ; এবং

(4) নিষিদ্ধ কোন পন্থায় (ধারা-9) পুনরুৎপন্ন বা বিলি করা চলবে না।

ধারা—9. কি প্রকাশন বলে গণ্য হবে না : সংহিতার অর্থানুসারে নিম্নবর্তী কোন কাজই প্রকাশন বলে গণ্য হবে না—

(1) মাইক্রোফিল্ম বা মাইক্রোকার্ড বা অনুরূপভাবে বিলি করা কোন উপাদান।

(2) সহকর্মী বা ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা কোন নিদর্শনের ব্যাখ্যা, এমনকি ছাপা হলেও।

(3) প্রুফশীট বিলি।

(4) কোন বিজ্ঞানীদের বা অন্য কোন সভায় উল্লেখ।

(5) সংগ্রহের কোন প্রাণি উপাদানকে নামাঙ্কিত করা।

(6) কোন নথী কেবলমাত্র কোন গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া ; বা

(7) 1950-এর পরে কোন বেনামী প্রকাশন।

IV. প্রাপ্তি যোগ্যতার নির্ণায়ক

ধারা—11. সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় : একটি নামের প্রাপ্তি যোগ্য হতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—

(a) **প্রকাশন এবং তারিখ :** প্রকাশন তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রকাশনার নির্ণায়কের অর্থানুযায়ী এবং 1757 খ্রীষ্টাব্দের পরে হবে।

(b) **ভাষা ঃ** নামের ভাষা ল্যাটিন অথবা ল্যাটিনসম (Latinised) হবে অথবা কিছু শব্দের সন্ধি বা সমন্বয় ঘটিয়ে নাম করা হলে এমন হতে হবে যাতে এই শব্দটি (নামটি) ল্যাটিন হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

(1) J, K, W ও Y বর্ণগুলি নব-ল্যাটিনে বহু প্রচারিত এবং প্রাণীদের নামে ব্যবহার করা যায়।

(c) **দ্বিপদ নামকরণ ঃ** লেখকের (গবেষক) যে প্রকাশনে নামটি প্রকাশ পাচ্ছে তাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে নামকরণ বিধি পালন করতে হয়।

(i) বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য অনুপস্থিত থাকলে 1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রজাতির নামের উল্লেখ ব্যতিরেকেই কোন একপদী গণের নাম দ্বিপদ নামকরণের বিধিসম্মত বলে মনে করা হয়।

(ii) 1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পাওয়া কোন কাজের সূচীতে প্রকাশিত নাম যদি এই ধারার সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং 4, 5 ও 6 নং ধারার সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণ করে, সে ক্ষেত্রে লেখক কাজের দেহাংশে দ্বিপদ নামকরণ ব্যবহার না করে থাকলেও গ্রন্থপঞ্জীতে, বিবরণে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ অথবা ইঙ্গিত কিংবা প্রাণীটির কোন চিত্র অথবা নামটি গোত্র পর্যায়ের হলে এবং এটি যদি একটি অন্তর্ভুক্ত গণ হয়, সে ক্ষেত্রে নামটি প্রাপ্তিযোগ্য হবে।

(d) **প্রকাশনে প্রতিনাম** (Synonymy in publication) ঃ কোন নাম প্রথমে প্রতিনাম রূপে প্রকাশিত হলে যদি নামটি 1961 সালের পূর্বেই আদি তারিখ ও আবিষ্কারকের নামসহ প্রাপ্তিযোগ্য না হয়ে থাকে অথবা কোন ট্যাক্সার নাম হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে বা অগ্রজ প্রতিনাম হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে সে সব ক্ষেত্রে প্রাপ্তিযোগ্য হবে না।

(e) **গোত্রমণ্ডলের নাম ঃ** কোন গোত্রের প্রথম নামকরণে নামটি সেই সময়ে প্রচলিত কোন অন্তর্ভুক্ত গণভিত্তিক হতেই হবে এবং নামটি বহুবচনে কর্তাবোধক বিশেষ্য হবে।

(i) নামটি শুধুমাত্র বহুবচনে বিশেষ্য অথবা কোন গণভুক্ত সদস্যের বিশেষণ বোঝালেই হবে না, নামটিকে সুস্পষ্টভাবে গণ উচ্চতর ট্যাক্সা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হতে হবে।

(ii) গোত্রমণ্ডলের নামের শেষ বিভক্তিতে ভুল থাকলে নামটির যথাযথ সংশোধন সহকারে আদি প্রকাশনের তারিখ ও আবিষ্কারকের নাম সহ প্রাপ্তিযোগ্য হবে।

উদাহরণ : দ্বি-পক্ষযুক্ত পতঙ্গ *Tipula Linnaeus*-কে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী Latreille (1802-03) TIPULARIAE নামে একটি গোত্র উপস্থাপন করেন। এই নামটি কিন্তু সংশোধিত রূপে TIPULIDAE নামে গণ্য হবে এবং আবিষ্কারকের স্বীকৃতি Latreille-ই থাকবে (আদি তারিখ 1802-03 সহ)।

(iii) 1900 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই অনুচ্ছেদের উপরোক্ত বিধি অনুসারে কোন গোত্রের নাম প্রকাশিত থাকলে যদি নামটি পুরোপুরি ল্যাটিনসম না হয় পরবর্তী কোন গবেষক নামটিকে ল্যাটিনসম করে নিলে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাণিবিজ্ঞানীদের গ্রাহ্য হলে সংশোধিত নামটি আদি আবিষ্কারকের নাম ও প্রকাশন তারিখ সহ প্রাপ্তিযোগ্য হবে।

উদাহরণ : TETRANYCHIDAE গোত্র নামটির প্রবর্তকের কৃতিত্ব Donnadieu (1875)-কেই দেওয়া হয়েছে, যদিও তিনি নামটি Tetranycides রূপেই প্রকাশ করেছিলেন এবং Murray (1877) এই নামটিকে প্রথম ল্যাটিসম করে Tetranychidae—এই সংশোধিত রূপ দেন।

(f) **গণমণ্ডলের নাম**ঃ গণের নাম একবচনে কর্তৃকারকে বিশেষ্য হতে হবে।

(g) **প্রজাতিমণ্ডলের নাম**ঃ

(i) প্রজাতির নাম একাধিক অক্ষরযুক্ত একটি সরল শব্দ অথবা একটি মৌলিক শব্দ হতে হবে, এবং

1. একবচনে কর্তাবোধক বিশেষণ এবং গণের নামের লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে (যেমন *Felis marmorata*); অথবা

2. একবচনে কর্তাবোধক বিশেষ্য এবং গণের নামের ব্যাখ্যাস্বরূপ হবে (যেমন *Felis leo*), অথবা

3. সম্বন্ধপদে বিশেষ্য (যেমন *rosae*, *sturionis*, *galliae*) হবে, অথবা

4. সম্বন্ধপদে অস্তিত্ববোধক ব্যবহৃত বিশেষণ শব্দটি অন্য একটি সম্পর্কিত প্রাণিপ্রজাতির নাম থেকে নেওয়া হবে (যেমন *Lernaea lusci* যা *Gadus lucus* নামের Copepod-এ শোষক হিসেবে থাকে)।

(ii) একটি প্রজাতির নাম অবশ্যই গণের নামের সঙ্গে প্রকাশিত হতে হবে। তবে গণের নামটি গ্রাহ্য বা প্রাপ্তিযোগ্য নাও হতে পারে।

(iii) প্রজাতির নাম কখনই একাধিক শব্দের সংযোজনে সৃষ্ট হবে না।

এমন কোন চিহ্ন থাকবে না যা ল্যাটিনে উচ্চারিত হয় না।

ধারা—12. 1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত নাম : 1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত কোন নাম ধারা 11 পালন করা ছাড়াও নামটির সঙ্গে একটি বিবরণ, সংজ্ঞা অথবা ইঙ্গিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ধারা—13. 1930 খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত নাম :

(a) সাধারণভাবে 1930 খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত নামের ক্ষেত্রে ধারা 11-এর শর্ত পূরণ না করলেও চলে, যদি

(i) এমন বক্তব্য বহন করে যা ট্যাক্সাকে অন্য ট্যাক্সা থেকে পৃথক করার উপযোগী চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে ; অথবা

(ii) আগে থেকে প্রচলিত কোন নামের বদলের সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকে।

(b) **গণমণ্ডলের নাম :**

1930 খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত কোন গণের নাম 12 (a) উপধারার শর্ত পূরণ করা ছাড়াও কোন সুনির্দিষ্ট জাতিরূপ প্রজাতির উল্লেখসহ থাকতে হবে (ধারা 68)।

(i) এই বিভাগের শর্তাবলী কোন সমন্বিত পুঞ্জের পক্ষে প্রযোজ্য নয় (ধারা 66)।

ধারা—14. 1950 খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত নাম : 1950 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে কোন নাম আবিষ্কারকের নাম ব্যতিরেকে প্রকাশিত কোন নতুন নাম প্রাপ্তিযোগ্য নয়।

ধারা—15. 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত নাম : 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরে শর্ত সাপেক্ষে অথবা চূড়ান্তভাবে প্রকার (Variety) অথবা রকম (Form)-এর প্রকাশিত নাম প্রাপ্তিযোগ্য নয়।

ধারা—17. একটি নাম প্রাপ্তিযোগ্য হতে বাধা নেই যদিও

(1) এটি একটি অনুজ প্রতিনাম (Junior Synonym) হয়। এ ধরনের নামে প্রতিনামিতা ভ্রমাত্মক বা অগ্রজ প্রতিনাম (Senior Synonym) অচল বা দুষ্প্রাপ্য হলে নামটি পুনঃ ব্যবহৃত হতে পারে ; কিংবা

(2) প্রজাতি পর্যায়ের নামের ক্ষেত্রে আদি বিবরণ একাধিক শ্রেণীবিন্যাস একক জড়িত থাকলে অথবা একাধিক ট্যাক্সার অন্তর্ভুক্ত প্রাণীর অংশকে জড়িত করলে অথবা কোন প্রাণীকে পরে সংকর প্রাণী মনে করলে।

অথবা—

(3) প্রজাতি পর্যায়ের নামটি প্রথম যে গণের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল সেই নামটি যদি অচল বা প্রাপ্তির অযোগ্য হয় ; কিংবা—

(4) নামটি করা হয়ে থাকে একটি প্রাণীর কোন অংশের, কোন একটি লিঙ্গের, জীবনচক্রের কোন দশার, বৈসাদৃশ্যযুক্ত বহু প্রজন্মের কোন একটির বা বহুরূপতাযুক্ত প্রজাতির কোন একটি রূপের ভিত্তিতে ; অথবা

(5) আদিতে নামটি কোন জীব ভেবে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে প্রাণী হিসেবে গণ্য হলেও তখন প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়নি। কিংবা

6) সপ্তম অনুচ্ছেদের ধারামত নামটির বানানে ভুল থাকলে সংশোধিত বানানযুক্ত নামটি প্রাপ্তিযোগ্য হবে। অথবা

(7) এটি 1951 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল ; বা

(8) এটি 1961 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শর্তসাপেক্ষে উপস্থাপিত হয়েছিল ; কিংবা

(9) এটি 1961 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রকম (Variety) বা প্রকার (Form) হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

ধারা—18. বাতিল গণ্য হবার যে কারণগুলো গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

(a) **অনুপযুক্ততা** (Inappropriateness)—কোন প্রজাতি বা গণের নাম একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে অনুপযুক্ততার অজুহাতে এমনকি আবিষ্কারক নিজেও পরবর্তী সময়ে নামটি বাতিল করতে পারেন না।

উদাহরণ ঃ *Polyodon*, *Apus*, *albus*, *sinensis* প্রভৃতি নামগুলো একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার ফলে এই নামগুলো যে চরিত্র বা বিস্তারণ নির্দেশ করে সেগুলো না থাকার যুক্তিতে নাম বাতিলযোগ্য নয়।

(b) পুনঃ পুনঃ (Toutonomy) কোন প্রজাতি ও গণের নাম একই হবার যুক্তিতে নাম বাতিলযোগ্য হয় না।

উদাহরণ ঃ *Bison bison*, *Apus apus apus* ইত্যাদি।

ধারা—19. ভ্রান্তি ও সংশোধনের মর্যাদা ঃ নামকরণ অনুশাসন অনুসারে কোন সংশোধন যুক্তিযুক্ত হোক বা না হোক নামটি প্রাপ্তিযোগ্য থাকে, কিন্তু নামের বানানের ভুল আদি বিবরণে বা পরে কোন স্থান নেই এবং ভ্রান্ত বানানযুক্ত নামটি প্রাপ্তিযোগ্য নয়।

V. প্রকাশের তারিখ

ধারা—21. তারিখের ব্যাখ্যা ঃ কোন কাজের প্রকাশের তারিখ এবং অন্তর্ভুক্ত নাম অথবা নামকরণ জনিত কোন বক্তব্য এই ধারার শর্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হবে।

(a) **নির্ধারিত তারিখ ঃ** বিপরীত কোন সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কোন কাজ বিষয়ক প্রকাশের যে তারিখের উল্লেখ থাকে তাকেই নির্ভুল ধরে নিতে হয়।

(b) **অসম্পূর্ণ তারিখ ঃ** প্রকাশনে তারিখের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই পূর্বতম তারিখ নির্ধারিত হবে। কিন্তু কোন প্রমাণ না থাকলে (i) যেখানে সুনির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ না থেকে মাস ও বৎসরের উল্লেখ থাকে সে সব ক্ষেত্রে উল্লিখিত মাসের শেষ দিনটি ধার্য হবে। এবং—(ii) যদি শুধুমাত্র বছরের উল্লেখ থাকে সেক্ষত্রে বছরের শেষ দিনটি ধার্য হবে।

(c) **ভ্রান্ত তারিখ ঃ** যদি কোন কাজের প্রকাশনে তারিখের কোন ভুল পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ ভিত্তিক পূর্বতম তারিখটি গ্রাহ্য হবে।

(d) **আংশিকভাবে প্রকাশিত কাজের তারিখ ঃ** কোন কাজ যদি আংশিকভাবে বিভিন্ন তারিখে প্রকাশিত হয় সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকাশের তারিখ পৃথকভাবে নথিভুক্ত হয়।

(e) **তারিখের বিস্তার ঃ** যদি কোন কাজের প্রকাশ একাধিক তারিখে বিস্তৃত হয় সে ক্ষেত্রে শেষের তারিখটিই গ্রাহ্য বলে গণ্য হবে। তবে যদি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে এক বা একাধিক অংশ ঐ তারিখের পূর্বে বিলি করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ভিত্তিক পূর্বতম তারিখটিই গ্রাহ্য হবে।

(f) **অনুল্লিখিত তারিখ ঃ** আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে কোন কাজের সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশের তারিখ অন্য প্রকাশন প্রভৃতি বাহ্যিক সাক্ষ ভিত্তিক পূর্বতম তারিখটিই গ্রাহ্য হবে।

ধারা—22. তারিখের উল্লেখ ঃ কোন নামের তারিখ উল্লেখ করা হয় গবেষকের নামের পরে এবং গবেষকের নাম ও তারিখের মধ্যে একটি কমা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

সুপারিশ 22B. পরিবর্তিত নামের তারিখ : কোন পরিবর্তিত সমাবদ্ধ নামের প্রজাতি পর্যায়ের আদি তারিখ উল্লেখ করতে হলে তারিখ আদি গবেষকের সঙ্গে একই বন্ধনী অন্তর্ভুক্ত হবে গবেষকের নামের পরে কমা দিয়ে।

উদাহরণ : *Arion ater* (Linnaeus, 1758)।

VI. নামের বৈধতা

ধারা—23. নামের পূর্বিতা : কোন ট্যাক্সার প্রাচীনতম পাওয়া নামটিই বৈধ বলে গণ্য হয় যদি এই সংহিতার কোন ধারা বলে নামটি অবৈধ ঘোষিত না হয়ে থাকে অথবা এই সংক্রান্ত কমিশন দ্বারা চাপা পড়ে না গিয়ে থাকে।

(a) **ব্যতিরেক :** একটি নাম প্রাচীনতম না হওয়া সত্ত্বেও বৈধ নাম হিসেবে গণ্য হবে যদি—

(i) নামটি এই ধারার (b) বিভাগের শর্তানুযায়ী সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

(ii) যদি নামটি কমিশন যথার্থভাবে বৈধ মনে করে।

(b) **সীমাবদ্ধতা :** যে নাম পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে প্রাণি-বিজ্ঞানের পুঁথিপত্রে অগ্রজ প্রতিনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি সে নাম **বিস্মৃত নাম** (nomen oblitum) বলে গণ্য হয়।

(i) 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরে যদি কোন গবেষক এই ধরনের কোন নাম পান সেই নামকে সংস্থার বাতিল নামের তালিকাভুক্ত করার জন্য বা নাম-করণের স্থিতিস্থাপকতা এবং সর্বগ্রাহ্যতার স্বার্থে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

(ii) কমিশনের নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিস্মৃত নাম (nomen oblitum) ব্যবহারযোগ্য নয়।

(iii) ব্যবহারিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীদের নাম সাধারণভাবে পঞ্চাশ বছরের কম ব্যবহৃত হলেও সেই নাম সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কমিশনের কাছে আবেদন করায় কোন বাধা নেই।

(c) **পর্যায়ের পরিবর্তন :** ট্যাক্সার গোত্র, গণ বা প্রজাতিমণ্ডলের নামের পূর্বিতা মণ্ডলের মধ্যে পর্যায়ের উন্নয়ন বা অবনয়নে প্রভাবিত হয় না।

(d) **গোত্রমণ্ডলের নাম ঃ**

(i) একটি গোত্রমণ্ডলের ট্যাক্সন (গোষ্ঠী) ঐ মণ্ডলের দুই বা ততোধিক ট্যাক্সা যোগে সৃষ্ট হলে অংশের প্রাচীনতম বৈধ নামটিই প্রয়োজনে পরিবর্তন-সহ গ্রহণ করা হয়।

(ii) যদি কোন প্রাণিবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে দুই বা ততোধিক প্রতি-নামিক গোত্রমণ্ডলের নামে পূর্বিতা নিয়মের কঠোর প্রয়োগে সাধারণ ব্যবহার বিঘ্নিত হয় সেক্ষেত্রে কোন নামটি গোত্রমণ্ডলের সরকারী তালিকায় থাকবে তা ঠিক করে দেবার জন্য কমিশনের কাছে তার অনুরোধ করা উচিত।

(e) **গণ ও প্রজাতিমণ্ডলের নাম ঃ**

(i) দুই বা ততোধিক গণমণ্ডলের ট্যাক্সার সংযোগে একটি গণগোষ্ঠী সৃষ্ট হলে অংশের প্রাচীনতম বৈধ নামটি প্রাপ্তিযোগ্য হবে।

উদাহরণ ঃ গণ A-us, 1850 ও উপগণ B-us, 1800 এর সংযোগে সৃষ্ট গণের নাম B-us, 1800 হবে।

(ii) দুই বা ততোধিক প্রজাতিমণ্ডলের ট্যাক্সার সংযোগে একটি প্রজাতি গোষ্ঠী সৃষ্ট হলে অংশের প্রাচীনতম বৈধ নামটি প্রাপ্তিযোগ্য হবে।

(iii) যদি অধস্তন ট্যাক্সাযুক্ত কোন গণ বা প্রজাতির নাম অবৈধ বা প্রাপ্তির অযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে এই নাম সহযোগী ট্যাক্সা ও প্রতিনাম সহ পরবর্তী প্রাচীনতম বৈধ নামটিই প্রাপ্তিযোগ্য হয়।

উদাহরণ ঃ A-us, 1850 গণে উপগণ A-us, 1850, C-us, 1900 এবং D-us, 1860 থাকলে, যদি দেখা যায় A-us নামটি সমনাম সেক্ষেত্রে গণের নামটি D-us, 1860 দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। এই নামটি ঠিক পরবর্তী বৈধ প্রাচীন নাম।

ধারা—24. প্রাচীনতম নামের ব্যাখ্যা ঃ

(a) **সমকালীন প্রকাশিত নাম ঃ** এক বা একাধিক কাজে একাধিক ট্যাক্সাকে একই নামে কিংবা একই ট্যাক্সাকে একাধিক নামে একই সময়ে প্রকাশ করা হলে তাদের তুলনামূলক প্রাচীনত্ব নির্ধারিত হয় প্রথম সংশোধনের ভিত্তিতে।

(i) 'প্রথম সংশোধক' বিষয়টি কঠোরভাবে পালনীয়। প্রতিনামীতার ক্ষেত্রে গবেষককে দুটি বা তার বেশী প্রতিনাম উল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে

জানাতে হবে যে তাঁর বিশ্বাসমত ওরা একই ট্যাক্সাভুক্ত এবং তিনি ঐসব নামের একটা বেছে নিয়েছেন।

(b) **কোন প্রাণীর কোন অংশ বা রূপ (Form) অথবা কাজ-ভিত্তিক নাম :** এক্ষেত্রে পূর্বিতার নিয়ম প্রযোজ্য হবে, যখন—

(i) পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটির নামের পূর্বেই প্রাণীটির অংশের নামকরণ হয়। অথবা

(ii) কোন প্রজাতির দুই বা ততোধিক প্রজন্ম, রূপ, দশা বা লিঙ্গরূপকে বিভিন্ন ট্যাক্সা হিসেবে নামকরণ করা হয়, অথবা

(iii) 1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের কোন প্রাণীবিষয়ক গবেষণা ভিত্তিতে প্রাণীকে না দেখেই নামকরণ হয়ে থাকে।

VII. নামের গঠন ও সংশোধন

ধারা—26. যৌগ নাম :

(a) **বৈধ যৌগ নাম :** যদি কোন যৌগ নাম দ্বিপদ নামের শর্তানুযায়ী দুটি পৃথক শব্দে প্রকাশ হয়ে থাকে, শব্দ দুটির মাঝে সংযোজক চিহ্ন ব্যতিরেকে যুক্ত করা হয় তবে আদি প্রকাশনে এই রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে।

উদাহরণ : *Columber novae hispaniae* Gmelin—এর সংশোধিত রূপ *Columber novaehispaniae* Gmelin।

(b) **যৌগ নামে সংখ্যার ব্যবহার :** কোন সংখ্যা বা সাংখ্যিক বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণ বোধক কোন অংশ সহকারে যৌগ নাম তৈরী হলে সংখ্যা বা সাংখ্যিক চিহ্নটি পূর্ণশব্দে লিখতে হবে এবং নামের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত হবে। (যেমন 10-lineata না হয়ে Decemlineata হবে)।

(c) **যৌগ ল্যাটিন শব্দ :** যদি কোন প্রজাতি পর্যায়ের নামের প্রথম অংশ ট্যাক্সার চরিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় সেটি নামের বাকি অংশের সঙ্গে সংযোজিত চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হবে (যেমন C-album)।

ধারা—27. ছেদ বা অনুরূপ চিহ্নের ব্যবহার : কোন ছেদ বা অনুরূপ চিহ্ন প্রাণীর নামকরণে ব্যবহারযোগ্য নয়। হাইফেন (-) চিহ্নটি শুধুমাত্র 26 ধারা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধারা—28. নামের আন্তক্ষর : গোত্র ও গণের নামের আন্তক্ষর

ইংরাজী বড় অক্ষর হতেই হবে এবং প্রজাতির নামের আদ্যক্ষর ইংরাজী ছোট অক্ষর হতে হবে।

ধারা—29. গোত্রমণ্ডলের নামের গঠন ঃ গোত্রমণ্ডলের নাম গঠিত হয় জাতিরূপ গণের নামের প্রধান অংশের শেষে IDAE যুক্ত হয়ে এবং উপ-গোত্রের ক্ষেত্রে INAE যুক্ত হয়ে।

সুপারিশ 29 A. **অধি-গোত্র ও দল।** অধিগোত্র ও দলের (Tribe) নামের শেষাংশে যথাক্রমে OIDEA এবং INI যুক্ত হবে।

(a) **প্রাচীন ভাষা উদ্ভূত গণের নাম ঃ** যদি কোন জাতিরূপ গণের নাম ল্যাটিন বা গ্রীক শব্দে লেখা হয় অথবা ল্যাটিন বা গ্রীক শেষ পাদে থাকে, সেক্ষেত্রে শেষাংশকে বাদ দিয়ে গণের একবচন নাম দ্বারা যথাযথ প্রধান ভাগ স্থাপিত হয়।

(i) নামে ল্যাটিন ব্যবহৃত থাকলে সেটি প্রাচীন, মধ্যযুগীয় বা আধুনিক ল্যাটিন হতে পারে। কিন্তু গ্রীক কেবল প্রাচীন গ্রীককেই বোঝায়।

(b) **অপ্রাচীন ভাষা উদ্ভূত গণের নাম ঃ** যদি কোন গণের নাম ল্যাটিন বা গ্রীক শব্দ না হয় অথবা ল্যাটিন বা গ্রীক শেষাংশ না থাকে অথবা খেয়ালখুশীমত কিছু অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হয় এক্ষেত্রে যে গবেষক প্রথম এই নামিক (Nominal) গণের ভিত্তিতে গোত্রের নাম প্রকাশ করেন তাকেই গণের নামের মূল ভাষা ঠিক করতে হয়।

(c) **গ্রীক থেকে ল্যাটিনকৃত গণের নাম ঃ** যদি কোন জাতিরূপ গণের নাম গ্রীক শব্দ ল্যাটিনকৃত অথবা গ্রীক শব্দের শেষাংশের পরিবর্তনের মাধ্যমে ল্যাটিনকৃত, সেক্ষেত্রে ল্যাটিনকৃত নামই যথার্থ।

উদাহরণ ঃ *Leptocerus*-এর শেষাংশে *Keras*, গোত্রনাম গঠনের প্রধান অংশ Leptocer থেকে *Leptocerat* -থেকে নয়।

ধারা—30. লিঙ্গ সংক্রান্ত মতৈক্য ঃ প্রজাতিমণ্ডলের নাম যদি কর্তাবোধক একবচনে বিশেষণ হয়, প্রজাতি যে গণভুক্ত হবে সেই গণের লিঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং প্রয়োজনে শেষাংশের পরিবর্তন ঘটাতে হবে, বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে কোন প্রজাতি এক গণ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য গণভুক্ত হয়।

(a) **গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দ অথবা শেষাংশযুক্ত গণমণ্ডলের নাম ঃ**

(i) কমিশনের অন্য কোন নিয়ম নির্ধারিত না থাকলে অভিধানিকভাবে

প্রচলিত লিঙ্গই হবে।

(1) আদি গবেষকের অন্য কোন রকম ইঙ্গিত না থাকলে যে বানান আছে তাই গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দ হিসেবে গণ্য হবে।

(2) আদি গবেষকের অন্য কোন ইঙ্গিত না থাকলে বা সুনির্দিষ্ট বিশেষণের সঙ্গে ব্যবহৃত না হলে বিভিন্ন লিঙ্গবোধক বিশেষ্য পুংলিঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

উদাহরণ: শেষাংশে cota যুক্ত ল্যাটিন যৌগ বিশেষ্য (Sylvicota) পুংলিঙ্গ বোধক। -Ops অন্ত্যের নাম পুংলিঙ্গ হয়, অবশ্য গবেষকের অন্য কোন ইঙ্গিত না থাকলে। তবে অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে।

(3) গ্রীক শব্দের শেষাংশের পরিবর্তনের মাধ্যমে ল্যাটিন করে কোন গণমগুলের নাম হলে নামটি শেষাংশের যথাযোগ্য লিঙ্গ পায়।

উদাহরণ: *-us*, *-os* অন্তের স্ত্রী অথবা পুংলিঙ্গ বোধক, *-a*, *-ov* (on) অন্তের নাম পুংলিঙ্গ বোধক যথা—*echinus*, *cephalus*,—*crimus*,—stomus,—somus,—cheilus (—cheilos),—gnathus (—gnathos), —*rhamphus* (rhamphos), *rhynchus*,—stethus। আবার —*cerad* অথবা *metopa* অন্ত্যেযুক্ত নামগুলো স্ত্রীলিঙ্গ বোধক হয়।

(4) ল্যাটিন শব্দের গণের নামের শেষাংশের পরিবর্তন ঘটলে নাম নতুন শেষাংশের যথাযোগ্য লিঙ্গ পায়।

উদাহরণ: *Dendrocygna* স্ত্রীলিঙ্গাত্মক যদিও নামটি অংশত পুংলিঙ্গাত্মক *cygnus* যোগে গঠিত।

(ii) কোন গণমগুলের নাম গ্রীক বা ল্যাটিন শেষাংশ বা ঐ রকম অক্ষর সহকারে গঠিত হলে নামটি শেষাংশের যথাযথ লিঙ্গ পায়।

উদাহরণ: *-ides*, *-ites*, *-istes*, *-odes* বা oides অন্তযুক্ত নামগুলো পুংলিঙ্গ বোধক। *scatella* ও *oculina* শেষাংশযুক্ত নামগুলো স্ত্রীবোধক। যদিও শব্দদুটি যথাক্রমে গ্রীক ক্লীব ও ল্যাটিন পুংলিঙ্গাত্মক বিশেষ্য থেকে উদ্ভূত।

কোন অপ্রাচীন ভাষা ভিত্তিক অথবা খুশীমত অক্ষরের সংযোগের সঙ্গে ল্যাটিন বা গ্রীক অন্তাংশের সংযোগে সৃষ্ট নাম অন্তাংশের যোগ্যলিঙ্গ প্রাপ্ত হয় যেমন—*Buchia* (von Buch থেকে), *Cummingella* (Cumming থেকে), *Vellitia* (villet থেকে), *Dafila*, *Solubia* এ সবগুলো স্ত্রীলিঙ্গ

বোধক। কিন্তু *Daption* ক্লীবলিঙ্গাত্মক।

(b) **সম্পূর্ণরূপে অপ্রাচীন ভাষাভিত্তিক গণের নাম ঃ**

(i) কোন গণমণ্ডলের নাম ইঙ্গ-ভারতীয় আধুনিক ভাষার শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হলে নামটি সেই শব্দের লিঙ্গ লাভ করে।

(ii) কোন গণমণ্ডলের নাম ল্যাটিন, গ্রীক অথবা ইঙ্গ-ভারতীয় আধুনিক ভাষার কোন শব্দ না হয়ে খুশীমত কিছু অক্ষরের সমন্বয় হলে নামটির লিঙ্গ গবেষক যেভাবে নির্ধারণ করেছেন কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রজাতিতে যেভাবে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়েছে সেইভাবেই গণের লিঙ্গ নির্ধারিত হবে। যদি কোন লিঙ্গ নির্ধারিত না থাকে এবং নামের শেষাংশ স্ত্রীবোধক না হয় তবে পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ বোধক হবে।

* সুপারিশ 31A. **আধুনিক ব্যক্তিগত নামভিত্তিক প্রজাতি-মণ্ডলের নাম ঃ** প্রজাতির নাম বিশেষ্য এবং আধুনিক ব্যক্তিগত নাম হলে এবং ব্যক্তিগত নামটি পুরুষের নাম হলে -i, কোন স্ত্রীর হলে -ae এবং একাধিক স্ত্রীলোক বোঝালে -arum দ্বারা শেষ হবে।

ধারা—32. **আদি বানান ঃ**

(a) **শুদ্ধ আদি বানান ঃ** নামের আদি বানান শুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং রক্ষিত হবে যদি না—

(i) এটি 26 থেকে 30 ধারার নির্দেশাত্মক শর্তগুলির বিরোধী হয়।

(ii) আদি প্রকাশে অজ্ঞাত ভ্রান্তি যথা মুদ্রণ, প্রতিলিপিকরণ ইত্যাদির বিপর্যয়গত (অযথার্থ ল্যাটিনকরণ, বেঠিক সংযোজক, স্বরবর্ণ (vowel) ব্যবহার অথবা অশুদ্ধ ভাষান্তর ইত্যাদি অজ্ঞাত ভ্রান্তি বলে গণ্য হয় না) ভ্রান্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(iii) জাতিরূপ গণের নাম অনুযায়ী প্রয়োজন প্রসূত গোত্রমণ্ডলের নামের শেষাংশে পরিবর্তন বা যৌক্তিকতার স্বার্থে পরিবর্তন সাধন হয়ে থাকে।

(b) **একাধিক আদি বানান ঃ** আদি প্রকাশে নামের বানান একাধিক থাকলে প্রথম সংশোধন বা পুনর্মূল্যায়নে যে বানানটি গ্রাহ্য হয়

---

* এই সুপারিশটি ধারা 31 এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ধারা 31 1963 খ্রীষ্টাব্দের প্রাণি-বিজ্ঞানীদের কংগ্রেসে বাতিল হয়।

সেটিকেই শুদ্ধ বানান হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি না এই গ্রাহ্য বানানটি 26 থেকে 30 ধারার শর্তানুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

(c) **অশুদ্ধ আদি বানান:** আদি বানান যদি 26 থেকে 30 নং ধারার শর্তগুলো পূরণ না করে অথবা অজ্ঞাত ভ্রান্তিজনিত অথবা একাধিক বানানের একটিও প্রথম সংশোধনে গৃহীত না হয়ে থাকে এ অবস্থায় বানানটি অশুদ্ধ আদি বানান হিসেবে গণ্য হবে এবং একে সংধোধন করতে হবে, কারণ ভ্রান্ত বানানের নামকরণে কোন পৃথক মর্যাদা নেই। সুতরাং সমনামিতার অধিকার পায় না এবং স্থানান্তরিত নামের রূপে ব্যবহার করা যায় না।

(i) কোন নাম হাইফেন (-) এপষ্ট্রফি (') ইত্যাদি সহকারে প্রকাশিত হলে ঐ ধরনের চিহ্নগুলির অপসারণের মাধ্যমে অংশগুলি একত্রিত হবে। কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট স্থলেই হাইফেন ব্যবহার বহাল থাকবে। জার্মান শব্দে Umlaut চিহ্ন স্বরবর্ণ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বরবর্ণের পরে 'e' সংযোজিত হবে।

উদাহরণ: *terrae-novae* কে *terraenovae*, *d' urvillai*-কে *duri-villei* এবং *muelleri*-কে *muelleri* রূপ দেওয়া হয় এবং এটি *mulleri* সমনামিক নয়।

ধারা—33. পরবর্তী বানান:

(a) **সংশোধন:** আদি বানানের কোন লক্ষণীয় ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনকে সংশোধন (Emendation) বলা হয়।

(i) কোন আদি ভ্রান্ত নামের বানানের "ন্যায়সঙ্গত সংশোধন" হলে সেই সংশোধিত নাম আদি গবেষকের প্রকাশন ও তারিখ লাভ করে।

(ii) অন্য কোন সংশোধনকে "অযৌক্তিক সংশোধন" বলা যায় এবং এই ধরনের সংশোধিত নাম তার গবেষকের নাম ও তারিখ লাভ করে এবং নামটি একটি অনুজ প্রতিনাম হয়ে দাঁড়ায়।

(b) **পরবর্তী অশুদ্ধ বানান:** সংশোধন (Emendation) ব্যতিরেকে কোন নামের পরিবর্তন 'পরবর্তী অশুদ্ধ বানান' হিসেবে গণ্য হয় এবং নামকরণ সংহিতায় এর কোন স্থান স্বীকৃত হয় না বা নামটি সমনাম বা স্থানান্তরিত হবার যোগ্যতা লাভ করে না।

ধারা—34. সমাপ্তি :

(a) **গোত্র মণ্ডলের নাম :** কোন গোত্রের পর্যায়ের উন্নয়ন বা অবনয়ন ঘটলে নামের সমাপ্তির পরিবর্তন ঘটে।

(b) **প্রজাতি ট্যাক্সার নাম।** প্রজাতি ট্যাক্সার নামের শেষাংশ গণের লিঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়।

VIII. গোত্র পর্যায়ের ট্যাক্সা ও তাদের নাম

ধারা—37. অধীনস্থ ট্যাক্সা : বিভাজিত কোন গোত্রমণ্ডলের অধীনস্থ কোন ট্যাক্সাতে যদি জাতিরূপ গণ থাকে, সে ক্ষেত্রে গোত্র এবং অধীনস্থ পর্যায়ের শেষাংশ ব্যতিরেকে একই নাম পায় এবং এদের বলা হয় মনোনীত অধীনস্থ ট্যাক্সা। যথা মনোনীত উপ-গোত্র, মনোনীত দল ইত্যাদি।

উদাহরণ : TIPULIDAE নামিক গোত্র (জাতিরূপ গণ *Tipula Linnaeus*. 1758) কতগুলি উপ-গোত্রে বিভক্ত এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব জাতিরূপ গণের অনুসারে নামাঙ্কিত হয়। উপ-গোত্র TIPULINAE-তে *Tipula* থাকায় TIPULINAE হচ্ছে TIPULIDAE গোত্রের মনোনীত উপগোত্র।

ধারা—39. জাতিরূপ গণের সমনামিতা : কোন গোত্রের জাতিরূপ গণের নাম গোত্রের নামের অনুজ সমনাম হলে গোত্রের নাম বাতিল হবে।

ধারা—40. জাতিরূপ গণের প্রতিনামিতা : 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন জাতিরূপ গণের নাম অনুজ প্রতিনাম হিসেবে বাতিল হলেও ঐ গণের ভিত্তিতে স্থাপিত গোত্রের নাম বাতিল হবে না যদি অগ্রজ ও অনুজগণ ঐ গোত্রভুক্ত থাকে।

(a) **কিছু কিছু নামের সংরক্ষণ :** কোন গোত্রের নাম এই ধরনের প্রতিনামিতার জন্য 1961 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সাধারণভাবে গ্রাহ্য হলে স্থিতিশীলতার স্বার্থে রক্ষিত হবে।

(i) সাধারণভাবে গ্রাহ্য বিষয়টিতে মতবিরোধ থাকলে বিষয়টি কমিশনের গোচরে আনতে হবে।

(b) **সংরক্ষিত নামের তারিখ :** (a) বিভাগের শর্তানুযায়ী কোন নাম গৃহীত হলে সেই নামটি বাতিল নামের তারিখ লাভ করে এবং নামটি

অগ্রজ প্রতিনাম হিসেবে গণ্য হয়।

উদাহরণঃ আদি জাতিরূপ গণ *A-us B-us* এর অনুজ প্রতিনাম হলে—

(i) 1961 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে A-IDAE ও B-IDAE দ্বারা স্থানান্তরিত না হয়ে থাকলে অথবা B-IDAE সাধারণ গ্রাহ্যতা লাভ না করে থাকলে A-IDAE গোত্র নাম হিসেবে প্রচলিত থাকবে।

(ii) কিন্তু A-IDAE নামটি ইতিমধ্যে B-IDAE দ্বারা স্থানান্তরিত এবং সাধারণ গ্রাহ্যতা লাভ করে থাকলে B-IDAE শুদ্ধ নাম হিসেবে এবং অগ্রজ প্রতিনাম হিসেবে গণ্য হবে এবং A-IDAE-এর তারিখই লাভ করবে।

ধারা—41. জাতিরূপ গণের ভ্রান্ত সনাক্তকরণঃ যদি কোন গোত্রের নামের স্থায়িত্ব ও প্রচলন কোন আবিষ্কারের ফলে সংকটময় হয়ে পড়ে, জাতিরূপ গণটি ভ্রান্ত সনাক্তকৃত প্রজাতিভিত্তিক অথবা অসতর্ক পদ বা পর্যায়ভিত্তিক ইত্যাদি পরিস্থিতিতে বিষয়টি কমিশনের গোচরে আনা বাঞ্ছনীয়।

IX. গণমণ্ডল এবং তাদের নাম

ধারা—42. গণ মণ্ডলের ট্যাক্সা ঃ

(a) **অন্তর্ভুক্ত পর্যায় ঃ** শ্রেণীবিভাগের স্তরে গণ ট্যাক্সার একদিকে গোত্র আর নীচের দিকে প্রজাতি।

(b) প্রত্যেক গণই জাতিরূপ প্রজাতি ভিত্তিক।

(c) **যৌথ বিভাগ ঃ** জীব বিজ্ঞানে কিছু কিছু ট্যাক্সা 'যৌথ বিভাগ' রূপে গণ্য হয়, এই নামগুলি গণের নাম বলেই মনে করা হয় এবং এদের জাতিরূপ প্রজাতি অপ্রয়োজনীয়।

উদাহরণ ঃ *Agamodistomum*, *Agamofilaria*, *Cysticercus*, *Diplostomulum*, *Glaucothoe*, *Sparganum*।

(d) **গণের বিভাগ বা অংশ ঃ** কোন গণ অন্তর্বর্তী বিভাগ বা অংশের (Section or Division) নাম যাই দেওয়া হোক নামকরণের পদ্ধতিতে IV অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণ করলে উপ-গণের নাম পায়।

ধারা—43. সহযোগী বিভাগ ঃ (Categories Co-ordinate)

নামকরণ বিধি মত গণমণ্ডলের বিভাগগুলো সহযোগী পর্যায়ের অর্থাৎ একই নিয়ম ও সুপারিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই মণ্ডলের কোন একটি বিভাগের জন্য প্রবর্তিত কোন নাম জাতিরূপ প্রজাতি ভিত্তিক হলে একই জাতিরূপ প্রজাতি ভিত্তিক অন্যান্য পর্যায়ের ট্যাক্সার ক্ষেত্রেও নামটি আদি তারিখ ও গবেষকের নামসহ প্রাপ্তিযোগ্য হয়।

ধারা—44. অধস্তন ট্যাক্সা :

(a) **মনোনীত উপগণ :** বিভাজিত গণের যে উপগণে জাতিরূপ প্রজাতি বর্তমান সেই উপ-গণ গণের নামই পায় এবং একে মনোনীত উপ-গণ (Nominated subgenus) বলা হয়।

(b) **মনোনীত উপ-গণের পরিবর্তন :** বিভাজিত গণের কোন উপ-গণের বাতিল নাম অন্য কোন উপ-গণের নাম দ্বারা স্থানান্তরিত হলে পরবর্তী নামটিই মনোনীত উপগণ রূপে গণ্য হয়।

X. প্রজাতিমণ্ডলের ট্যাক্সা ও তাদের নাম

ধারা—45. প্রজাতিমণ্ডলের ট্যাক্সা :

(a) **অন্তর্ভুক্ত বিভাগ :** নামকরণ বিধির উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রজাতি-মণ্ডল বলতে প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি বিভাগগুলোকেই ধরা হয়।

(b) **ভিত্তি :** প্রজাতিমণ্ডলের প্রতিটি ট্যাক্সন (গোষ্ঠী) বাস্তবে জাতিরূপ প্রাণি উপাদানের ভিত্তিতেই সূত্রায়িত করা হয়।

(c) **উপ-প্রজাতি নিম্নতর স্তর :** উপ-প্রজাতি নিম্নতর প্রকার বা দলকে প্রজাতিমণ্ডলের বহির্ভূত মনে করা হয়।

(d) **উপ-প্রজাতি অথবা উপ-প্রজাতি নিম্নতর পর্যায় নিরূপণ :** প্রজাতি নিম্নতর ট্যাক্সার নামের আদি পর্যায় নির্ধারিত হবে—

(i) উপ-প্রজাতি হিসেবে যদি গবেষক আদি নামকরণে উপ-প্রজাতির পক্ষে নামটি নির্দিষ্ট করে থাকেন অথবা 1961 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সুস্পষ্টভাবে পর্যায় ঠিক না করা থাকে। এবং

(ii) উপ-প্রজাতি হিসেবে গণ্য হবে যদি গবেষক আদিতে নামকরণের সময় ট্যাক্সাটি কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অথবা জীবপ্রত্নতাত্ত্বিক স্তরের বৈশিষ্ট্যমূলক বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং একে সুস্পষ্ট কোন উপ-প্রজাতি নিম্নতর কোন বিভাগভুক্ত না করে থাকেন। কিন্তু

(iii) উপ-প্রজাতি নিম্নতর দলভুক্ত হবে যদি আদি নামকরণের সময় গোষ্ঠী বা দলটিকে সুস্পষ্টভাবে কোন উপ-প্রজাতি নিম্নতর পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন অথবা 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে থাকেন যে এটি উপ-প্রজাতিভুক্ত।

(e) **রকম বা প্রকারের (Variety or Form) ব্যাখ্যা ঃ**

(i) 1961 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের রকম বা প্রকার কোনটিকেই উপ-প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি নিম্নতর পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

(ii) 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরের কোন নতুন নাম রকম বা প্রকার হিসেবে প্রকাশিত হলে তা উপ-প্রজাতি নিম্নতর পর্যায়রূপে গণ্য হবে।

ধারা—48. দ্বিপদ নাম ঃ

(a) **গণের পরিবর্তন ঃ** আদি স্থাপনার পরে কোন প্রজাতি অন্য কোন গণে স্থানান্তরিত হলে প্রজাতির নাম অন্য দ্বিপদ নামের অংশে পরিণত হয়।

(b) **শর্তসাপেক্ষে গণের নাম ঃ** যদি কোন প্রাণিবিজ্ঞানী পূর্বে স্থাপিত কোন গণের সঙ্গে প্রাপ্তিযোগ্য একটি প্রজাতির নাম সংযুক্তভাবে প্রকাশ করেন কিন্তু একই সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে একটি নতুন গণের নাম প্রজাতির সঙ্গে উপস্থাপিত করেন সেক্ষেত্রে তিনি দুটি দ্বিপদ নামের স্থাপনা করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং প্রথমটি অগ্রগণ্য হবে।

উদাহরণ ঃ Lowe 1843 খ্রীষ্টাব্দে *Seriola* curier, 1816 গণে *Gracilis* নামে একটি নতুন প্রজাতি প্রকাশ করেন। কিন্তু একই সময়ে শর্তসাপেক্ষে প্রজাতিটির জন্য *Cubiceps* গণের প্রস্তাবনা করেন। ধরে নেওয়া হয় তিনিই প্রথম দ্বিপদ নাম স্থাপনা করেন *Seriola gracilis* এবং দ্বিতীয় দ্বিপদ নাম স্থাপনা করেন *Cubiceps gracilis*।

ধারা 49. ভ্রান্ত সনাক্তকরণের ভিত্তিতে ব্যবহৃত প্রজাতির ভ্রান্ত নাম রক্ষিত হয় না, এমনকি উল্লিখিত প্রজাতি দুটি ভিন্ন গণভুক্ত হলেও।

XI. প্রাধিকারিত্ব

ধারা—50. নামের প্রাধিকার ঃ কোন বৈজ্ঞানিক নামের প্রাধিকারী তাঁকে (তাঁদের) বলা হবে, যিনি (যারা) প্রাপ্তিযোগ্যতার শর্ত পূরণ করে প্রথম নামটি প্রকাশ করেন। অবশ্য যতক্ষণ না প্রকাশনের

বিষয়বস্তু থেকে এটি পরিস্ফুট হয় যে যুগ্ম গবেষকদের মধ্যে একজন বা অন্য কোন ব্যক্তি নামটি প্রাপ্তিযোগ্য হবার শর্তের জন্য দায়ী।

(a) **সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত নামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম :** কোন ট্যাক্সার নাম কোন সভার কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হলে যে গবেষক নামটির জন্য দায়ী তিনিই প্রাধিকারী হবেন। সভার সম্পাদক বা কোন সাংবাদিক প্রাধিকারী হবেন না।

(b) **পর্যায়ের পরিবর্তন :** কোন ট্যাক্সনের গোত্র, গণ বা প্রজাতি-মণ্ডলের মধ্যে পর্যায়ের পবিবর্তনে নামিক ট্যাক্সনের প্রাধিকারিত্ব প্রভাবিত করে না।

(c) **যুক্তিযুক্ত সংশোধনেও** নামের আদি প্রাধিকারীকেই উল্লেখ করা হয়।

(d) অযৌক্তিক সংশোধনেও যিনি প্রকাশ করেছেন তাঁরই কৃতিত্ব মেনে নেওয়া হয়।

ধারা—51. **প্রাধিকারীর নামোল্লেখ :**

(a) **ঐচ্ছিক ব্যবহার :** প্রাধিকারীর (গবেষকের) নাম ট্যাক্সার নামের অংশ হিসেবে গণ্য হয় না এবং প্রাধিকারীর উল্লেখ ঐচ্ছিক।

(b) **উল্লেখের রকম :** আদি গবেষকের নাম উল্লিখিত হলে বৈজ্ঞানিক নামের পরেই কোন যদি চিহ্ন ছাড়া থাকবে। ব্যতিরেক শুধু সুপারিশ 51A এবং 51 (d)।

(i) বৈজ্ঞানিক নামটির সঙ্গে পরবর্তী গবেষকদের উল্লেখ করতে হলে (,) ছাড়া অন্য সুস্পষ্ট উপায়ে পৃথক করা দরকার।

উদাহরণ : *Cancer pagurus* Linneus নামটি Latreille-র ব্যবহার এ ধরনের—

Cancer pagurus Linnaeus sensus Latreille অথবা
Cancer pagurus : Latreille

সুপারিশ 51A. **বেনামী প্রাধিকারী :** কোন ট্যাক্সার নাম বেনামীতে প্রকাশ হলে এবং পরে আদি প্রাধিকারীর নাম জানা গেলে তাঁর নাম তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে থাকবে।

(c) **প্রবন্ধদাতাদের উল্লেখ :** কোন বৈজ্ঞানিক নাম ও তার বৈধতার দায়িত্ব যদি প্রকাশনে উক্ত প্রবন্ধকার(দের) না হয়ে তার

(তাদের) কোন একজন বা অন্য কোন প্রাণি বিজ্ঞানী হন সেক্ষেত্রে প্রাধিকারীর উল্লেখ 'A'তে 'B' বা 'A ও B'তে 'B' ইত্যাদি উপযুক্তভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(d) **নতুন সম্মেলনে বন্ধনীর ব্যবহার ঃ** যদি কোন প্রজাতি-মণ্ডলের ট্যাক্সা কোন একটি গণভুক্ত হিসেবে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং পরে সেই প্রজাতি অন্য গণভুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে প্রজাতির আদি প্রাধিকারীর উল্লেখ বন্ধনীর মধ্যে হয়।

উদাহরণ ঃ *Epeira bifida* Doleschall, 1859 *Cyclosa* গণভুক্ত হওয়ায় *Cyclosa bifida* (Doleschall), 1859 হয়।

সুপারিশ 51B. **নতুন সম্মেলনে প্রাধিকারীর নামোল্লেখ।** আদি প্রাধিকারী ও সংশোধক উভয়ের নামের উল্লেখ করতে হলে বন্ধনী অন্তর্ভুক্ত প্রাধিকারীর নামের পরেই সংশোধকের উল্লেখ করতে হয়।

উদাহরণ ঃ *Epeira insulana* Costa থেকে Gravely-র সংশোধন-মত *Cyclosa insulana* (Costa) Gravely।

XII. সমনামীতা (Homonymy)

ধারা—52. সমনামীতা ঃ নামকরণ সংহিতার অর্থে সমনাম সমোচ্চারিত ও একই বানানযুক্ত একই গোত্র বা গণভুক্ত ভিন্ন প্রজাতির নাম বোঝায়।

ধারা—53. সমনামীতার আইন ঃ কোন নাম প্রাপ্তিযোগ্য নামের অনুজ সমনামিক হলে সেটি বাতিল ও স্থানান্তরিত হবে।

ধারা—54. সমনামীতায় প্রবেশের অযোগ্য নাম ঃ নিচে উল্লিখিত নামগুলো সমনামীতায় প্রবেশযোগ্য নয়।

(i) 20 এবং 56 (b) ধারায় উল্লেখ ব্যতিরেকে যে সব নাম নামকরণ সংহিতার অর্থে প্রাপ্তিযোগ্য নয়।

(ii) যে সব নাম প্রাণিজগতের কোন ট্যাক্সার জন্য ব্যবহৃত হয়নি।

(iii) যে নামগুলো প্রাণি নামকরণ থেকে বাদ দেওয়া আছে, এবং

(iv) গোড়ায় বা পরে ব্যবহৃত ভ্রান্ত বানানযুক্ত নাম।

ধারা—55. গোত্র মণ্ডলের নাম ঃ যে সব গোত্রের নাম বিভিন্ন জাতিরূপ গণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং নামগুলো অনুরূপ (identical)

অথবা কেবলমাত্র শেষাংশে (suffix) পৃথক তাদের সমনাম বলা হয়।

(a) **একই রকম গণের নাম থেকে সমনামীতা :** জাতিরূপ গণের নামের মিলের (কিন্তু অনুরূপ নয়) ফলে গোত্রমগুলের নামের সমনামীতা দেখা দিলে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিধেয়।

উদাহরণ : *Merope* (পতঙ্গ) ও Merops (পাখি) এই গণ দুটির নাম থেকে MEROPIDAE গোত্র নামের উদ্ভব হয়েছে। সমনামীতা এড়াবার উদ্দেশ্যে কমিশন বিধি দিলেন যে *Merope* থেকে গোত্র হবে MEROPEIDAE (মতামত 140)।

(b) **অশুদ্ধ বানান জনিত সমনামীতা :** পূর্ববর্তী নামের বানান অশুদ্ধ থাকার ফলে সমনামীতা দেখা দিলে তাকে গোত্রের অনুজ সমনাম হিসেবে বাতিল করা ঠিক হবে না।

উদাহরণ : *Psilopa* Fallen ভিত্তিক PSILOPINAE Cresson, 1925 *Psilopus* Meigen ভিত্তিক PSILOPINAE Schiner, 1868 এর অনুজ সমনাম হিসেবে বাতিল করা হয়নি। একে PSILOPODINAE লেখা উচিত।

ধারা—56. **গণমগুলের নাম :** সমনামীতার নিয়ম সমষ্টিবাচক বিভাগসহ সব গণমগুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(a) **এক বর্ণের পার্থক্য :** দুটি গণের নামের মধ্যে যদি একটিমাত্র বর্ণের পার্থক্যও থাকে সেই নাম দুটিকে সমনাম গণ্য করা হয় না।

উদাহরণ : *Microchaetina* Van-der Wulp, 1891 এবং *Microchaetona* Townsend, 1919 মাছি জাতীয় গণ দুটিকে সমনামিক ধরা হয় না।

(b) **জীবাশ্মে ব্যবহৃত *-ites, -ytes,* বা *-ithes* শেষাংশে যুক্ত নাম :** কেবলমাত্র জীবাশ্মে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আদি গণের নামের শেষাংশে -ites, -ytes বা -ithes দ্বারা স্থানান্তরিত গণের নাম সমনামের পর্যায়ে পড়ে।

(c) **উপ-গণের উপর গণের পূর্বিতা :** একই তারিখে দুটি সমনামী গণমগুলের নামের একটি গণ ও অন্যটি উপগণের জন্য নির্ধারিত হলে গণের নামটি পূর্বিতা লাভ করে।

ধারা—57. **প্রজাতিমগুলের নাম :** প্রজাতিমগুলের নাম আদি

প্রকাশে বা পরে একই গণ বা সমষ্টিবাচক বিভাগভুক্ত হলে সমনামের নিয়মভুক্ত হয়। ব্যতিরেক 59 (c) ধারা।

উদাহরণ : intermedius ট্যাক্সার নতুন নামের নিচের প্রস্তাবগুলো একে অপরের প্রাথমিক সমনাম।

A-us *intermedius* Pavlov

A-us *intermedius* Dupont

A-us *albus intermedius* Black.

A-us *concolar intermedius* Schimidt.

(a) **উপ-গণের নাম :** একই গণ অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিমগুলের নামের সমনামীতা উপ-গণের উপস্থিতিতে প্রভাবিত হয় না।

উদাহরণ : A-us (B-us) *intermedius* Pavlov এবং
A-us (C-us) *intermedius* Dupont প্রাথমিক সমনামী কিন্তু A-us (B-us) intermedius Pavlov B-us *intermedius* Black-এর প্রাথমিক সমনামী নয়।

(b) **বানানের পার্থক্য :** কোন নামধেয় গণের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিমগুলের সমনামীতা গণের নামের কোন সংশোধন বা অশুদ্ধ বানানের ফলে স্পষ্ট হয় না।

(i) অন্তের পার্থক্য পুরোপুরিভাবে লিঙ্গের সঙ্গে জড়িত থাকায় বিশেষণ বাচক প্রজাতিমগুলের নাম সমনামিক।

(c) **সমনামী গণে অনুরূপ নাম :** দুটি অনুরূপ প্রজাতিমগুলের নাম আদিতে বা পরে সমনামী ভিন্ন ভিন্ন গণে অন্তর্ভুক্ত হলে সমনামীতা থাকে না।

উদাহরণ : *Noctua* (পতঙ্গ) ও Noctua (পক্ষী) সমনামী কিন্তু *Noctua variegata* Jung (পতঙ্গ) ও *Noctua* variegata Quoyand Gaimard (পক্ষী) সমনামী নয়।

(d) 58 ধারায় উল্লিখিত শর্ত ব্যতীত **একটিমাত্র বর্ণের পার্থক্য** সমনামীতা এড়াবার পক্ষে যথেষ্ট।

(e) **উপ-প্রজাতির উপর প্রজাতির পূর্বিতা :** একই তারিখে প্রকাশিত দুটি সমনামী প্রজাতিমগুলের নামের প্রজাতির পক্ষে প্রস্তাবিত নামটি উপ-প্রজাতির উপর পূর্বিতা লাভ করে।

ধারা—58. পরিবর্তনীয় বানান ঃ দুই বা তার বেশী প্রজাতিমণ্ডলের নাম একই উৎস ও অর্থযুক্ত এবং একই নামিক গণে অথবা সম্মিলিত বিভাগে উল্লিখিত হলে তাদের বানানে নিচে উল্লিখিত যে কোনটির তফাৎ মাত্র থাকলে সমনামী বলে ধরা হয়।

(i) ae, oe বা e-এর ব্যবহার।
(*Caeruleus, Coeruleus, Ceruleus*)

(2) ei, i বা y-এর ব্যবহার (*cheiropus, chiropus, chyropus*)।

(3) c বা k-এর ব্যবহার (*microdon, mikrodon*)।

(4) Consonant-এর শ্বাসধ্বনি ও শ্বাসহীন ধ্বনি (*oxyrhynchus, oxyryncus*)

(5) t-এর আগে c-এর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি (*auctumnalis, autumnalis*)।

(6) Consonant-এর এক বা দ্বিত্ব ব্যবহার (*litoralis, littoralis*)।

(7) f বা ph-এর ব্যবহার (*sulfureus*, sulphureus)।

(8) যৌগিক শব্দে বিভিন্ন সংযোগকারী vowel এর ব্যবহার (*nigricinetus, nigrocinetus*)।

(9) Semi-vowel i-কে y, ei, ej বা ij-এর মত প্রতিস্থাপন করা।

(10) পৃষ্ঠপোষক পদবাচ্য শব্দের শেষে i বা ii (*smithi*, smithii)।

(11) ভৌগোলিক নামের শেষে *ensis* বা iensis (chinensis, *khasiensis*)।

(12) বিশেষ নাম হিসেবে তিনজোড়া নাম (saghaliensis & sakhalinensis ; *sibericus* & *sibiricus* ; *tianschanicus* & *tianshanicus*)।

ধারা—59. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সমনাম ঃ

(a) **প্রাথমিক সমনাম ঃ** কোন প্রজাতিমণ্ডলের নাম অনুজ প্রাথমিক সমনাম হলে স্থায়ীভাবে বর্জিত হবে।

(b) **মাধ্যমিক সমনাম ঃ** কোন প্রজাতি মণ্ডলের নাম অনুজ মাধ্যমিক সমনাম হলে এবং প্রাণিবিজ্ঞানীর মতে তারা একই গণভুক্ত হলে বর্জিত হবে।

(c) **মাধ্যমিক সমনামের পুনরুজ্জীবন ঃ** অন্য কোন কারণে

বাতিল না হয়ে থাকলে 1960 খ্রীষ্টাব্দের পরে মাধ্যমিক সমনাম হিসেবে বর্জিত কোন নাম পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, যদি প্রাণিবিজ্ঞানী মনে করেন যে আলোচ্য প্রজাতি দুটি একই গণভুক্ত নয়।

(i) এক্ষেত্রে মাধ্যমিক সমনামের পরিবর্তে প্রস্তাবিত নামটি পরবর্তীটির অনুজ বাস্তব বহুনাম হয়ে উঠে।

উদাহরণ : A-us *niger* Smith, 1960 & B-us niger Dupont, 1950 একই গণভুক্ত ভাবা হয় এবং যখন B-us এ স্থানান্তরিত করা হয় তখন অনুজ সমনাম হয়ে উঠে এবং নতুন করে B-us *ater* Jones, 1970 নাম পায়। পরবর্তী সময়ে যদি মনে করা হয় A-us *niger* Smith, 1960 B-us *niger* Dupont, 1950 একই গণভুক্ত নয় সেক্ষেত্রে পূর্বের প্রজাতি নামই আবার ব্যবহৃত হবে। পরিবর্তিত নাম B-us ater Jones, 1970 A-us niger Smith, 1960-এর বাস্তব প্রতিনাম হয়ে উঠে।

ধারা–60. বর্জিত সমনামের পুনঃস্থাপন : কোন বর্জিত সমনামকে পুনঃস্থাপিত করতে হয় অবশ্যই একটি প্রাপ্তিযোগ্য বর্তমান নাম অথবা অভাবে নতুন নাম দ্বারা।

(a) **বহুনামীতাসহ অনুজ সমনাম :** যদি কোন বর্জিত সমনামের এক বা একাধিক প্রতিনামীতা থাকে সেক্ষেত্রে প্রাচীনতম নামটি তার প্রাধিকারী ও তারিখসহ গৃহীত হবে।

(i) ভাবগত প্রতিনামটি ততদিনই স্থানান্তরিত নাম হিসেবে যোগ্য থাকবে যতদিন একে বর্জিত নামের বহুনামী হিসেবে গণ্য করা হবে।

(b) **প্রতিনামীতা ব্যতিরেকে অন্তজ সমনাম :** বর্জিত সমনামের কোন প্রাপ্তিযোগ্য জানা প্রতিনামীতা না থাকলে একটি নতুন নাম দ্বারা স্থানান্তরিত হবে সেটি পরে স্বীকৃত যে কোন বহুনামীকের সঙ্গে পূর্বিতায় জয়ী হবে।

XIII. জাতিরূপ প্রত্যয়

ধারা—61. জাতিরূপের সঙ্গে ট্যাক্সার সম্পর্ক : 'জাতিরূপ' বৈজ্ঞানিক নামকরণের প্রামাণ্য তথ্যের উল্লেখে সক্ষম, ট্যাক্সনের প্রাণকেন্দ্র এবং নামকরণের বুনিয়াদ। ট্যাক্সার পরিসীমা কিছুটা পরিবর্তনশীল। কিন্তু জাতিরূপ প্রাণিউপাদানটি (Type specimen) অপরিবর্তনীয় বাস্তব

বিষয়। একটি নামিক প্রজাতির জাতিরূপ একটি প্রাণিউপাদান। একটি নামিক গণের জাতিরূপ একটি নামিক প্রজাতি। একটি নামিক গোত্রের জাতিরূপ একটি নামিক গণ। প্রত্যেক ট্যাক্সনেরই বাস্তব বা অনুশাসনিক জাতিরূপ থাকে। কোন ট্যাক্সনের জাতিরূপ নামকরণ সংহিতা অনুযায়ী একবার নির্দিষ্ট হলে কমিশনের বর্ধিত (Plenary) ক্ষমতা (ধারা 79) ছাড়া পরিবর্তনযোগ্য নয় অথবা ব্যতিরেকে 75 ধারা অনুযায়ী প্রজাতি-মণ্ডলে পরিবর্তন ঘটতে পারে।

(a) **অধস্তন মনোনীত ট্যাক্সার জাতিরূপঃ** কোন ট্যাক্সনের জাতিরূপ সেই ট্যাক্সনের অধস্তন মনোনীত গোষ্ঠীরও জাতিরূপ হিসেবে গ্রাহ্য। ফলে একটির পদাধিকার নির্ধারণ অন্যটিরও নির্ধারিত হয়ে যায়।

(i) কোন নামিক ট্যাক্সনের এবং তার অধস্তন মনোনীত ট্যাক্সনের জাতিরূপ একই সময়ে নির্ধারিত হলে পূর্বেরটি অগ্রাধিকার পায়।

(b) **জাতিরূপ ও প্রতিনামীতাঃ** দুটি ট্যাক্সা একই জাতিরূপ ভিত্তিক হলে তারা বস্তুত প্রতিনামিক। ভিন্ন জাতিরূপ ভিত্তিক দুটি ট্যাক্সাকে ধারণাগতভাবে একটি শ্রেণীবিন্যাস এককে যুক্ত করলে নাম দুটি ধারণাগত প্রতিনামিক।

XIV. গোত্রমণ্ডলের জাতিরূপ

ধারা—63. **গোত্রমণ্ডল ট্যাক্সার জাতিরূপঃ** যে নামিক গণের উপর ভিত্তি করে গোত্র ট্যাক্সনের নাম গড়ে উঠেছে তাকেই গোত্রের জাতি-রূপ বলা হয়।

সুপারিশঃ 64A. নতুন গোত্র স্থাপন করলে তার নাম ঠিক করার স্বাধীনতা থাকলেও প্রাণিবিজ্ঞানীর পক্ষে অতিপরিচিত এবং গোত্রের প্রতি-নিধিত্বমূলক গণকে বেছে নেওয়া উচিত।

XV. গণমণ্ডলের জাতিরূপ

ধারা—67. **সাধারণ প্রয়োগঃ**

(a) **গণমণ্ডলের জাতিরূপঃ** প্রতিটি নামিক গণের জাতিরূপ একটি নামিক প্রজাতি যাকে 'জাতিরূপ প্রজাতি' (Type species) বলে।

ধারা—68. **আদি প্রকাশনে নির্দেশিত জাতিরূপঃ** এই ধারার

অসুবিধাগুলি নিচে দেওয়া পূর্ববর্তিতার ক্রম হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

(a) **আদি উপাধি** (Designation) : কোন নতুন গণ স্থাপনের সময় যদি কোন নামিক প্রজাতিকে জাতিরূপ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে গণ্য করে থাকেন, অন্য যে কোন বিচার্য বিষয় থাকলেও সেই প্রজাতিটিই জাতিরূপ প্রজাতি।

(1) "gen. n, sp. n," বা তার তুল্য পদ্ধতিতে 1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নামিক কোন প্রজাতিকে নতুন গণে অন্তর্ভু'ক্ত করলে একে আদি উপাধি ধরে নেওয়া হয়। যদি অবশ্য অন্য কোন জাতিরূপ প্রজাতি না থাকে।

ধারা—69. আদি প্রকাশনে জাতিরূপ প্রজাতি নির্ধারিত না থাকা :

1931 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপিত নামিক গণের জাতিরূপ প্রজাতি নির্ধারিত না থাকা ক্ষেত্রে এই ধারার অনুবিধি নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হবে।

(a) **পরবর্তী পদ লাভ** (Subsequent designation) : কোন নামিক গণ জাতিরূপ প্রজাতি ছাড়া স্থাপিত হলে পরবর্তী শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী আদিতে অন্তর্ভু'ক্ত নামিক প্রজাতির যে কোনটিকে অথবা নামিক প্রজাতি না থাকলে পরে প্রথম যে প্রজাতিটির উল্লেখ করা হয়েছে সেইটিকেই জাতিরূপ প্রজাতি হিসেবে গণ্য করবেন (Type by subsequent designation)।

ধারা—70. জাতিরূপ প্রজাতি সনাক্তকরণ : এটা ধরে নেওয়া হয় যে প্রাধিকারী কোন নামিক প্রজাতিকে (1) নতুন স্থাপিত কোন গণে উল্লেখ করা অথবা (2) নতুন কিংবা স্থাপিত গণে উল্লেখ করার সময় সঠিকভাবে সনাক্তকরণ করেন।

(a) **ভ্রান্ত সনাক্ত করা জাতিরূপ প্রজাতি :** যদি কোন প্রাণিবিজ্ঞানী মনে করেন যে জাতিরূপ প্রজাতি সনাক্তকরণে ভ্রান্তি ছিল সেক্ষেত্রে তাকে কমিশনের নজরে আনতে হবে এবং কমিশন বর্ধিত ক্ষমতায় নামকরণের স্থায়িত্ব ও সমতা রক্ষার স্বার্থে বিচারমত সঠিক জাতিরূপ প্রজাতি নির্ধারণ করবেন।

(b) **ভ্রান্ত সনাক্তের ইচ্ছাকৃত ব্যবহার :** যদি কোন নামিক নতুন গণের জাতিরূপ প্রজাতি হিসেবে পূর্বে স্থাপিত কোন প্রজাতিকে উল্লেখ করা হয় এবং উল্লেখকারী যদি পূর্ববর্তী গবেষকের ভ্রান্ত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতি

রেখেই প্রজাতির নাম ব্যবহার করেন তবে, পূর্ব-ব্যবহৃত নামটিই জাতিরূপ প্রজাতি পদ লাভ করে, পরের সঠিকভাবে উল্লেখ করাটি নয়।

(1) এসব ক্ষেত্রে নতুন নামিক গণের প্রাধিকারীকে একই নামে নতুন নামিক প্রজাতির প্রতিষ্ঠাতা ধরা হবে।

XVI. প্রজাতিমণ্ডলের জাতিরূপ

ধারা—71. ব্যবহার ঃ এই অনুচ্ছেদের সব অনুবিধি সমানভাবে প্রজাতি মণ্ডল পর্যায়ে ব্যবহার্য।

ধারা—72. সাধারণ অনুবিধি ঃ

(a) **প্রজাতিমণ্ডল ট্যাক্সার জাতিরূপ ঃ** প্রজাতিমণ্ডলের প্রতিটি ট্যাক্সনের জাতিরূপ একটি প্রাণিউপাদান (Specimen), হয় আদি প্রাণি-উপাদান নয়তো জাতিরূপ প্রাণিমালার (Type series) পদবী প্রদত্ত একটি Holotype, lectotype বা একটি নব জাতিরূপ (Neotype)।

(b) **জাতিরূপ প্রাণিমালা ঃ** প্রাধিকারী যেসব প্রাণিউপাদানের ভিত্তিতে প্রজাতি নির্ধারণ করেছেন তাদের মধ্যে প্রভেদযুক্ত বা সন্দেহজনক-ভাবে যুক্তদের বাদে সব প্রাণিউপাদান জাতিরূপ প্রাণিমালা হিসেবে ধরা হয়।

(c) **প্রাণিউপাদান ইতিমধ্যেই জাতিরূপ হিসেবে গণ্য ঃ** কোন প্রাণিউপাদানের ইতিমধ্যেই কোন নামিক প্রজাতির জাতিরূপ গণ্য হওয়াতে অন্য কোন প্রজাতির জাতিরূপ হিসেবে গণ্য হতে বাধা নেই।

(d) **পদান্তরিত** (replacement) **নামিক প্রজাতির জাতিরূপ ঃ** কোন গবেষক যদি পূর্বের নামের পরিবর্তে একান্তভাবে কোন প্রজাতির নাম উপস্থাপনা করেন এবং এটি একই সঙ্গে কোন সুনির্দিষ্ট প্রাণিউপাদানের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে পদান্তরিত নামিক প্রজাতির জাতিরূপ পূর্বের নামিক প্রজাতিটিরই হবে, বিপরীত কোন জাতিরূপের পদবী দেওয়া বা স্থানান্তরিত নামের বিভিন্ন ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও।

(e) মনোনীত উপ-প্রজাতির জাতিরূপ 61 (a) ধারানুসারী।

(f) **জাতিরূপের মূল্য ঃ** Holotype, Syntype, Lectotype ও Neotype কে শ্রেণীবিজ্ঞানের সম্পদ হিসেবে যথাযথ মূল্য দিতে হয়।

ধারা—73. Holotype (**জাতিরূপ প্রাণী**) ও Syntype (**জাতি-**

রূপ পর্যায়ের প্রাণী ঃ

(a) **একটি প্রাণিউপাদান ঃ** একটি নামিক প্রজাতি একটিমাত্র প্রাণি-উপাদান ভিত্তিক হলে তাকে Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী বলে।

(b) **সুনির্দিষ্ট জাতিরূপ ঃ** যদি গবেষক নতুন কোন নামিক প্রজাতির বিবরণে একটিমাত্র প্রাণিউপাদানই জাতিরূপ হিসেবে বা সমতুল্য কোন অভিব্যক্তির উল্লেখ করেন সেক্ষেত্রে ঐ প্রাণিউপাদানটিই Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী।

(c) Syntypes (**জাতিরূপ পর্যায়ের প্রাণী**) ঃ যদি কোন নতুন নামিক প্রজাতির (a) ও (b)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী না থাকে সেক্ষেত্রে জাতিরূপ প্রাণিমালার সব প্রাণি-উপাদানগুলোই নামকরণের বিধিতে সমান মূল্যের Syntypes বা জাতিরূপ পর্যায়ের প্রাণী।

(1) Cotype বা অন্য কোন নামে কিংবা কোন সনাক্তকরণের নাম না থাকা বা গবেষকের না দেখা কিন্তু পূর্বের বিবরণ বা ছবি ভিত্তিক নিরূপিত ট্যাক্সার উপাদানও syntype হতে পারে।

সুপারিশ 73C. Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী সংক্রান্ত তথ্য ঃ

নতুন কোন প্রজাতি স্থাপনে প্রাণিবিজ্ঞানীকে Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী সম্পর্কে অন্তত নিচের প্রয়োজনীয় ও জানা তথ্যগুলো থাকা দরকার ঃ—

(1) আকার।

(2) Holotype বা জাতিরূপ প্রাণীর স্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উল্লেখ, তারিখ এবং অন্যান্য তথ্য Holotype-এর সঙ্গে জড়িত চিরকুটে থাকা উচিত।

(3) লিঙ্গ পৃথক হলে লিঙ্গের উল্লেখ।

(4) বৃদ্ধিজনিত দশা, একাধিক বর্ণের (Caste) বা রূপের হলে বর্ণের উল্লেখ।

(5) পোষক প্রাণী থাকলে উল্লেখ।

(6) সংগ্রাহকের নাম।

(7) সংগ্রহটি কোথায় আছে বা থাকবে এবং রেজিষ্ট্রেশন নম্বর থাকলে তার উল্লেখ।

(8) স্থলচর প্রাণী হলে প্রয়োজনে সংগৃহীত স্থানের উচ্চতা।

(9) জীবিত সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে সমুদ্রতলের কত নিচ থেকে সংগৃহীত তার উল্লেখ।

(10) জীবাশ্ম প্রজাতির প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ ও স্থানের উল্লেখ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট স্তরের কত নিচে বা উপরে তার উল্লেখ।

সুপারিশ 73D. Paratype (**জাতিরূপ সহযোগী প্রাণী**) :

Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী নির্দিষ্ট হবার পরে বাকী প্রাণি-উপাদানকে (থাকলে) Papatype বা জাতিরূপ সহযোগী প্রাণী হিসেবে অঙ্কিত করা বিধেয়।

সুপারিশ 73 E. : ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার উদ্দেশ্যেই Cotype নামটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

ধারা—74. Lectotype **বা জাতিরূপসম প্রাণী** :

(a) **প্রাণিউপাদানের পদ** : কোন নামিক প্রজাতির Holotype বা জাতিরূপ প্রাণী নির্দিষ্ট না থাকলে জাতিরূপ পর্যায়ের প্রাণীদের (Syntype) যে কোনটিকে Lectotype বা জাতিরূপসম প্রাণী আখ্যা দেওয়া যায়।

(i) কোন Lectotype বা জাতিরূপসম প্রাণীর প্রথম প্রকাশিত পদই প্রাণিউপাদানের পদমর্যাদা নির্ধারণ করে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে পদপ্রাপ্ত প্রাণিউপাদানটি Syntype বা জাতিরূপ পর্যায়ের প্রাণী নয় সে ক্ষেত্রে পদটি বাতিল হয়ে যায়।

(b) **চিত্রের সাহায্যে পদ নির্ধারণ** : কোন চিত্রকে Lectotype বা জাতিরূপসম প্রাণী পদবাচ্য করার অর্থ যে প্রাণিউপাদানটি চিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তাকেই পদবাচ্য করা। প্রাণিউপাদানটি যদি একটি জাতিরূপ পর্যায়ের প্রাণী হয় নামকরণের দৃষ্টিতে Lectotype বা জাতিরূপসম প্রাণী পদবাচ্য করা বৈধ।

(c) **পদবাচ্য হয় ব্যক্তিগতভাবে**। একটি সাধারণ বক্তব্যের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে Lectotype পদবাচ্য করা ঠিক নয়; প্রত্যেকটি পদ সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিগত নামিক প্রজাতির জন্য দেওয়া হয় এবং এরই মধ্যে প্রজাতির সংজ্ঞা দেবার উদ্দেশ্য থাকে।

সুপারিশ 74C. Lectotype **বা জাতিরূপসম প্রাণীর তথ্য** : Lectotype পদবাচ্য করতে 73C সুপারিশে যে সব তথ্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও কিভাবে চেনা যাবে তার ব্যক্তিগত চরিত্রের উল্লেখ থাকা

বাঞ্ছনীয়।

সুপারিশ 74E. *Paralectotype* : কোন প্রাণিবিজ্ঞানী জাতিরূপ পর্যায়ের (Syntype) প্রাণিউপাদানের একটিকে Lectotype বা জাতিরূপ-সম প্রাণী পদ দিলে বাকি উপাদানকে Paralectotype পদবাচ্য করাই বাঞ্ছনীয়।

ধারা—75. Neotype বা নব জাতিরূপ প্রাণী। যদি কোন প্রজাতির Holotype, lectotype বা Syntype হারিয়ে যাওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে না থাকে সেক্ষেত্রে নিচের উল্লেখ্য সীমাবদ্ধতা ও সর্তসাপেক্ষে অন্য একটি প্রাণিউপাদানকে Neotype বা নবজাতিরূপ প্রাণী পদবাচ্য করা যায়।

(a) **গ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি :** Neotype বা নবজাতিরূপ প্রাণী পদমর্যাদা দেওয়া যাবে কেবলমাত্র সংশোধন বা পুনরালোচনার ক্ষেত্রে এবং তাও বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি দেখা যায় নামকরণের স্থায়িত্বের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন।

(1) বিশেষ পরিস্থিতি বোঝাতে জটিল প্রাণিবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে যেমন খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একাধিক প্রজাতি যাদের Holotype, Lectotype বা Syntype অবর্তমান সেক্ষেত্রে Neotype স্থাপন একান্ত প্রয়োজনীয়।

(b) **বাতিলযোগ্য :** প্রজাতির নিজ প্রয়োজনে বা সংরক্ষণের নিয়মমাফিক কাজে অথবা কোন প্রজাতির নাম বাতিল বা প্রতিনাম হিসেবে সাধারণ ব্যবহারে অপ্রচলিত হলেই প্রজাতির Neotype পদমর্যাদা দেওয়া যাবে না।

(c) **যোগ্যতার শর্তাবলী :** একটি Neotype বা নবজাতিরূপ পদমর্যাদা বৈধ বলে গণ্য হবে যখন নিচের তথ্যসহ প্রকাশিত হবে :—

(1) প্রাধিকারী ট্যাক্সনকে পৃথক করার মত চরিত্রের বিবরণ দিয়ে যদি Neotype পদবাচ্য করেন কিংবা এই ধরনের বিবরণের গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখ করেন।

(2) যে প্রাণি উপাদানকে পদবাচ্য করেন তার পরিচিতির যথেষ্ট তথ্য ও বিবরণ উল্লেখ করেন।

(3) গবেষকের আদি জাতিরূপ প্রাণী হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে

যাবার বিশ্বাসযোগ্য কারণ এবং খুঁজে পাবার কি কি প্রচেষ্টা হয়েছে তার উল্লেখ করেন।

(4) আদি জাতিরূপ প্রাণী সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তার সঙ্গে Neotype বা নবজাতিরূপ প্রাণীর সঙ্গতির সাক্ষ্য ; অবশ্য নামিক প্রজাতি যদি একটি লিঙ্গ বা অপরিণত দশার ভিত্তিতে হয়ে থাকে যাতে ভাল নির্দেশক চরিত্রের অভাব থাকতে পারে সেক্ষেত্রে Neotype-এর আদি উপাদানের সঙ্গে পার্থক্য হতে পারে।

(5) Neotype যে আদি জাতিরূপ প্রাণীর আদি স্থানের খুব কাছাকাছি স্থান থেকে বা একই প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর থেকে বা একই পোষক প্রজাতি থেকে পাওয়া তার সাক্ষ্য।

(6) Neotype কোন স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সংস্থার সম্পদ যেখানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং গবেষণার কাজে প্রাপ্তিযোগ্য প্রকাশনে এ বক্তব্যের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(d) **পূর্বিতা :** এই ধারা অনুযায়ী প্রথম Neotype পদমর্যাদাযুক্ত প্রকাশনই বৈধ। পরবর্তী কোন Neotype পদমর্যাদা দেওয়া গ্রাহ্য নয় যতক্ষণ না প্রথম Neotype হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

XVII. প্রাণী নামকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশন

ধারা—76. মর্যাদা : প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন একটি স্থায়ী সংস্থা যা আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞান কংগ্রেসের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করে।

ধারা—77. কর্তব্য : কমিশন নিম্নোক্ত কর্তব্যে দায়বদ্ধ—

(1) কমিশন কংগ্রেসের অন্তত এক বৎসর আগে (কমিশন রাজী হলে কম সময়) সংহিতার কোন পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা তা বিবেচনা করা।

(2) কংগ্রেসের কাছে সংহিতা বিষয়ক পরিবর্তন বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ করা।

(3) উপর্যুপরি দুটি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সময়ের (সংহিতার সাময়িক পরিবর্তন) সুপারিশ ঘোষণা করা।

(4) সংহিতার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না এমন সব নামকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত ও নির্দেশ দেওয়া।

(5) প্রাণিবিজ্ঞানের স্বীকৃত তালিকা ও কাজের সংযোজন ও সংশোধন করা।

(6) কংগ্রেসে এর কাজের তালিকা পেশ করা ও

(7) কংগ্রেসের নির্দেশমত অন্যান্য কাজ করা।

ধারা—78. ক্ষমতার ব্যবহার ঃ কোন প্রাণিবিজ্ঞানী সংহিতার কোন ধারার ব্যাখ্যা চেয়ে আবেদন করলে কমিশন নামকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম।

(a) **ঘোষণা ঃ** নামকরণ সংহিতার ধারায় সম্পূর্ণ বা যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি এমন কোন বিষয় কমিশনের সামনে উপস্থিত হলে কমিশনকে একটি ঘোষণা দিতে হবে। (সাময়িক পরিবর্তন) এবং পরবর্তী কংগ্রেসে 87 ধারা মতে পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব রাখতে হবে।

(1) কমিশনের ঘোষণা আদি অথবা পরিবর্তিত আকারে পরবর্তী কংগ্রেসে গৃহীত অথবা বর্জিত হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। এর পর ঘোষণাটি ঐতিহাসিক দিক ছাড়া অন্য দিক থেকে স্থানান্তরিত ধরা হয়

(b) **মতামত ঃ** আলোচ্য বিষয়টি কোন একটি নাম, ধারা বা প্রকাশনে সংহিতার বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের প্রশ্ন জড়িত থাকে সে পরিস্থিতিতে কমিশনের সিদ্ধান্তকে ঘোষণা বলা হয় এবং

(1) নামকরণ সংহিতা কিভাবে প্রয়োগ বা ব্যাখ্যা করা হবে সে সম্পর্কে বক্তব্য ; অথবা—

(2) স্থায়িত্ব এবং বিশ্বজনীনতার স্বার্থে কমিশনের বর্ধিত ক্ষমতা বলে (79 ধারা) বিশেষ ঘটনাটি নামকরণ সংহিতা থেকে ছাড় দেওয়া বা পরবর্তী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া।

(c) **মতামতের কার্যকরী তারিখ ঃ** কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার পর মুহূর্ত থেকেই মতামত কার্যকরী হয় এবং পরবর্তী কংগ্রেসকে জানাতে হয়।

(d) **নির্দেশ ঃ** পূর্ববর্তী বিধানকে সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত এবং সংহিতার স্বাভাবিক অনুবিধি মতে প্রয়োজনীয় নিয়ম মাফিক উপাদানকেই নির্দেশ বলা হয়।

ধারা—79. বর্ধিত ক্ষমতা (Plenary power) ঃ সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে কমিশন XVII ও XVIII অনুচ্ছেদের ধারাগুলো ব্যতিরেকে যথাযোগ্য

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংহিতার যে কোন ধারার প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারেন যদি কমিশন মনে করেন বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কোন ধারা প্রয়োগের ফলে নামকরণের স্থায়িত্ব বা বিশ্বজনীনতা বিঘ্নিত হতে পারে অথবা কোন অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে। এ ধরনের বিশৃঙ্খলা রোধের উদ্দেশ্যে কমিশন তার বর্ধিত ক্ষমতা বলে যে কোন নামকে জাতিরূপ পদমর্যাদা বা নামকরণ বিষয়ক কাজ বা প্রকাশনকে গ্রহণ, বর্জন, পুনঃস্থাপন করতে পারেন।

(a) **পরিচালনা নীতি (Guiding principles) :** কমিশনের বর্ধিত ক্ষমতা প্রয়োগে পরিচালিত হতে হয় :

(i) পূর্বে প্রকাশিত কোন নাম ভিন্ন অর্থে পরে প্রকাশিত নামকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে চেপে দেওয়া থাকলে পূর্বিতা ও সমনামীতার আইনের (Law of priority and Homonymy) স্বার্থে পরেরটি চেপে দিতে হয়।

(ii) একই ট্যাক্সনকে দেওয়া পরবর্তী নামটিকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে পূর্বের নামটিকে চেপে দেওয়া হলে পূর্বিতা আইনের স্বার্থে পরের নামটিকে চেপে দিতে হয়, এটা কিন্তু সমনামীতার আইনে নয়।

(iii) ক্ষেত্রবিশেষে কমিশন তার বর্ধিত ক্ষমতা প্রয়োগে অস্বীকৃত হলে কোন্ নাম ব্যবহৃত হবে সে বিষয় সুনির্দিষ্ট মতামত দেবেন এবং সে বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা নেবার থাকলে তা সুনির্দিষ্ট করবেন।

ধারা—81. ছাড় : কমিশনের নামকরণ সংহিতা লঙ্ঘন খুঁজে বার করা বা কমিশনের কাছে পাঠানো আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের প্রতিপাদন করা বা পূর্ণাঙ্গ করা বা এর ক্ষমতার মধ্যে কোন বিষয়ে আগ্রহ নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

ব্যাখ্যামূলক বিষয়োল্লেখ

একপদী, দ্বিপদ ও ত্রিপদ নামকরণ (Uni-, Bi- and Tri nominal nomenclature) : প্রজাতি উচ্চতর ট্যাক্সার নাম এক পদযুক্ত হয়। একে একপদী নামকরণ বলে। প্রজাতির নাম দুটি পদযুক্ত হয়। প্রথমটি গণের নাম এবং দ্বিতীয় নামটি প্রজাতির নাম বোঝায়। তবে উপগণের উল্লেখ থাকলে তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে গণ ও প্রজাতির মাঝে থাকে। একেও দ্বিপদ নামকরণ বলে। উপপ্রজাতির নাম তিনটি পদযুক্ত হয়, তৃতীয় নামটি উপপ্রজাতির নাম বোঝায়। একে ত্রিপদ নামকরণ বলে (ধারা 4, 5, 6)।

নামের শেষে প্রাধিকারীর নাম ও তারিখ থাকতে পারে তবে একান্ত আবশ্যিক নয়।

উদাহরণ: *Tetragnatha fletchiri* Gravely, 1921 (দ্বিপদ)

Tetragnatha mandibutata bidentata Gravely, 1921 (ত্রিপদ)

Dacus (*Afrodacus*) *aberrans nigritus* Hardy, 1955 (ত্রিপদ)

গণের (উপগণ উল্লেখ থাকলে), নামের শুরু হয় Capital letter দিয়ে এবং প্রজাতির ও উপপ্রজাতির নামের সুরু হয় small letter দিয়ে। নামটি উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যেই Italics বা Block Capital ব্যবহার করা হয়। লেখায় ইঙ্গিত হিসেবে নিম্নরেখা (underline) দেওয়া হয়। নামের ভাষা ল্যাটিন বা ল্যাটিনভব বা ল্যাটিনসম গণ্য হবে (ধারা 11b)।

প্রাধিকারীর নাম: প্রাধিকারীর নাম প্রাণিনামের আবশ্যিক অংশ না হলেও প্রজাতি বা উপপ্রজাতি নামের শেষে কোন ছেদ চিহ্ন ছাড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকাশের তারিখ অর্থাৎ বর্ণও উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু কোন প্রাধিকারীর নাম প্রথম বন্ধনী অন্তর্ভুক্ত হলে একে নতুন সমাবন্ধ (New Combination) বলা হয় [ধারা 51 (d)]। উদাহরণ *Epeira insulana* Costa, পরে Epeira গণ থেকে *Cyclosa* গণভুক্ত হওয়াতে নামটি দাড়ায় *Cyclosa insulana* (costa); আদি প্রকাশ বেনামী হলে এবং পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে প্রাধিকারীর নাম তৃতীয় বন্ধনী অন্তর্ভুক্ত হয় (সুপারিশ 51A)।

পূর্বিতার আইন (ধারা 23):

এই আইনটি সম্পর্কে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নামকরণের স্থায়িত্বের স্বার্থে এই আইনটি প্রচলিত আছে। এই আইনের বলে কোন ট্যাক্সনের একাধিক নাম আবিষ্কৃত হলে যে নামটির প্রকাশের তারিখ পূর্ববর্তী সেই নামটিই ট্যাক্সনের বৈধ নাম হিসেবে গণ্য হবে। তবে কিছু ব্যতিরেক আছে। যেমন কমিশন যদি কোন নামকে সংরক্ষিত করেন বা সুস্পষ্টভাবে বৈধ ঘোষণা করেন। অথবা কোন নাম যদি গত 50 বছর ধরে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে। কোন ট্যাক্সনের পর্যায়ের উন্নতি বা অবনতি নামের পূর্বিতার অন্তরায় হয়ে দাড়ায় না।

এই আইন নামের স্থায়িত্ব রক্ষায় সহায়ক হলেও একটি ঘাটতির দিক হচ্ছে আদি নাম যতই অসম্পূর্ণতা বা দারিদ্র্যের সঙ্গে বিবৃত হোক যেহেতু আদি সেই কারণেই বৈধ গণ্য হবে। অন্য সব বিজ্ঞানে অসম্পূর্ণ বা দরিদ্র বর্ণনাকে অস্বীকারই করা হয়।

নামের প্রারম্ভিক তারিখ ঃ

প্রাণী নামকরণের শুরু ধরা হয় 1758 সালের 1 জানুয়ারীকেই, যে দিন লিনিয়াসের 'সিষ্টেমা নেচুরী'র দশম সংস্করণের প্রকাশ ঘটে। ঐ সময়ের পূর্বে প্রকাশিত কোন কাজকে 1758 সালের 1 জানুয়ারীর পরে প্রকাশিত ধরে নেওয়া হয়।

নামের প্রকার ঃ

নামকরণ সংহিতার 8—10 ধারার শর্ত পূরণ করে যে নাম প্রকাশিত হয় তাকে প্রাপ্তিযোগ্য বা ন্যায়সঙ্গত বা বৈধ নাম বলা হয়। কোন বিবরণ না থেকে নামের কেবলমাত্র উল্লেখ বা প্রাণীর লেবেল বা চিরকুট থাকলে Nomen nudum (নগ্ন নাম) বলে।

50 বছর কাল অব্যবহৃত কোন নামকে Nomen oblitum (ভুলে যাওয়া নাম) বলা হয়।

আদি জাতিরূপ প্রাণী প্রাপ্তিযোগ্য না হলে বা যথেষ্ট তথ্য না জানা গেলে অথবা জাতিরূপ প্রাণীকে কোন টাক্সন ভুক্ত করা হবে তা নির্ধারণ সম্ভব না হলে এই নামকে Nomen dubium (সন্দেহজনক নাম) বলা হয়।

পূর্বে ব্যবহৃত কোন নাম অনুজ সমনাম ইত্যাদি কারণে ব্যবহারযোগ্য না থাকলে সেই নামের পরিবর্তে নতুন কোন নাম প্রস্তাবিত ও প্রকাশিত হলে তাকে Nomen novum বা replacement name (নতুন নাম বা স্থানান্তরিত নাম) বলা হয়।

যে সব নাম সরকারীভাবে বাতিল বলে গণ্য হয় তাদের পাকাপাকি-ভাবে বাতিল করা হয়। এদের Nomen rejicundum (বাতিল নাম) বলা হয়।

কোন নামের ব্যবহারে নামকরণ সংহিতার এক বা একাধিক ধারার প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সরকারীভাবে নামটির সংরক্ষণের অনুমোদন দিলে নামটিকে Nomen conservadum (সংরক্ষিত নাম) বলা হয়।

প্রজাতি নাম বোঝাবার উদ্দেশ্যে লিনিয়াস ও অন্যান্য অনেকে Nomen

triviale এই ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সঙ্কর প্রাণী প্রাণিপ্রজনকে বোঝায় না বোঝায় ব্যক্তিগত প্রাণীকে। এর নামকরণ সংহিতায় কোন স্থান না থাকলেও Nomen hybridum [সঙ্কর (প্রাণী) নাম] পদটি ব্যবহার করা হয়েছে।

নামকরণ সংহিতায় অনুমোদিত ভাষা ব্যতিরেকে ব্যবহৃত ভাষার নামকে Vernacular name (মাতৃভাষায় নাম) বলা হয়।

কোন নাম অনুজ সমনাম হলে অর্থাৎ নামটি পৃথক জাতিরূপ প্রাণীসহ অন্য ট্যাক্সনের পক্ষে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হলে নামটিকে Preoccupied name (পূর্বে অধিকৃত নাম) বলা হয়।

1758 সালের 1 জানুয়ারীর পূর্বে প্রকাশিত নামের নামকরণ সংহিতায় কোন স্থান নেই এবং এদের Pre-Linnean name (প্রাক-লিনিয়াস নাম) বলা হয়।

কোন ট্যাক্সনের শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত স্থান অনিশ্চিত হলে তাকে Incertae cedis (অনিশ্চিত স্তর) বলা হয়।

কোন প্রজাতির সনাক্তকরণ সন্দেহজনক এবং আরো অনুসন্ধান সাপেক্ষ হলে তাকে species inquirenda (অনুসন্ধান সাপেক্ষ প্রজাতি) বলে।

প্রতিনামিতা (Synonymy): কোন একটি ট্যাক্সনের দুই বা ততোধিক নাম থাকলে তাদের প্রতিনাম বলা হয়। পূর্বিতার নিয়মানুসারে প্রথম প্রকাশিত নামটিই প্রকৃত নাম হিসেবে গণ্য হয়। এটিকে অগ্রজ প্রতিনাম এবং অন্য নামগুলোকে অনুজ প্রতিনাম বলা হয়।

প্রতিনাম সৃষ্টির কারণ পূর্ববর্তী পুঁথিপত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব-জনিত হলেও এর মাধ্যমে বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। প্রতি-নামকে দুটি পর্যায়ভুক্ত করা হয়—

ধারণাগত (Subjective) ও বস্তুগত (Objective)। ধারণাগত (Subjective) প্রতিনামকে শ্রেণীবিন্যাসগত (Taxonomic) বা অসম জাতি-রূপী (Heterotypic) প্রতিনামও বলা হয়। এই প্রতিনামগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপ ভিত্তিক এবং যতক্ষণ না জাতিরূপ একই ট্যাক্সনভুক্ত বিবেচিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনাম থাকে এবং সমান (=) চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করা হয়।

বস্তুগত (Objective) প্রতিনামকে নামকরণগত (Nomenclatural)

বা বাধ্যতামূলক (Obligate) বা সমজাতিরূপী (Homotypic) প্রতিনামও বলা হয়। এ সব নাম একই জাতিরূপ প্রাণী ভিত্তিক এবং বিশুদ্ধ। এ ধরনের প্রতিনামকে সর্বসম (≡) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

সমনামীতা (Homonymy) ঃ অব্যবহিত উচ্চতর একই ট্যাক্সনভুক্ত একাধিক জাতিরূপ ভিত্তিক অনুরূপ বানানযুক্ত বা প্রায় একই বানানযুক্ত একই নামকে সমনাম বলা হয়। পূর্বিতার নিয়মে পূর্বতম জাতিরূপের নামটিই বৈধ এবং অগ্রজ সমনাম ; বাকিরা অনুজ সমনাম এবং বাতিল-যোগ্য। পৃথক উচ্চতর ট্যাক্সাভুক্ত একই নাম সমনাম হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন ভিন্ন গণভুক্ত প্রজাতির একই নাম—*Noctua variegata* (পতঙ্গ) ও *Noctua variegata* (পক্ষী)।

জাতিরূপের শ্রেণীবিভাগ ঃ শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান জাতিরূপের উল্লেখ নামকরণ সংহিতায় থাকলেও কিছু কিছু শব্দের নতুন ব্যবহার, বিশেষত Black Welder (1967)-এর অনুসৃত জাতিরূপের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ্য। তিনি জাতিরূপের নামকে প্রধানত 7টি ভাগে ভাগ করেন ঃ

(i) **প্রাথমিক জাতিরূপ** (Primary types) অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাসের একটি জাতিরূপ যেমন Holotype, Lectotype, Neotype।

(ii) **মাধ্যমিক জাতিরূপ** (Secondary types) অর্থাৎ যে সব প্রাণি-উপাদান থেকে নিশ্চয়ই প্রাথমিক জাতিরূপ বাছাই করতে হবে। যেমন Syntype, Paralectotype।

(iii) **প্রশাখা জাতিরূপ** (Tertiary types) অর্থাৎ আদিতে যে সব প্রাণিউপাদানকে প্রাথমিক জাতিরূপের সহযোগী হিসেবে গণ্য করার উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখা হয়। যেমন Paratype, Allotype।

(iv) বিশেষ উৎপত্তির প্রাণিউপাদান হিসেবে সনাক্ত যেমন—Topotypes।

(v) সময় বা ব্যক্তিভিত্তিক সনাক্ত প্রাণিউপাদান যেমন—Metatype, Homotype বা Homoeotype ইত্যাদি।

(vi) বিশেষ ব্যবস্থায় বা ব্যবহারে সনাক্ত প্রাণিউপাদান যেমন—Plesiotype, Hypotype ইত্যাদি।

(vii) জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের প্রতিমূর্তি যেমন—Plastotype।

এ সব পদ ও অন্যান্য ব্যবহৃত পদের উল্লেখ বর্ণানুক্রমিকভাবে নিম্নরূপ করা যায়।

(1) *Allotype*—জাতি প্রাণীটির বিপরীত লিঙ্গের প্রাণিউপাদান।

(2) *Apotype*—জাতিরূপ প্রাণী ব্যতিরেকে অন্য যে প্রাণিউপাদানকে ভিত্তি করে পরবর্তী বা পরিপূরক বিবরণ বা চিত্র করা হয় (Hypotype, Plesiotype)।

(3) *Autotype*—কোন প্রাণিউপাদান বিবরণদাতার প্রজাতির প্রতিনিধি হিসেবে সনাক্ত হলে এবং জাতিরূপ প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হলে ঐ প্রাণিউপাদানকে Autotype বলে। এই পর্যায়ের উপাদানকে Heautype-ও বলা হয়।

(4) *Chirotype*—যে জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের উপর পাণ্ডুলিপির নাম ভিত্তি করা হয়।

(5) *Cotype*—বিবরণের সময় বিবরণদাতার সামনে জাতিরূপ প্রাণী ও এলোটাইপ বাদে যে সব প্রাণিউপাদান উপস্থিত থাকে তার যে কোন একটি। অর্থাৎ Syntype, Paratype, Isotype। বর্তমানে অবশ্য ব্যবহৃত হয় না।

(6) *Genoholotype*—বিবরণের পরে একটি বা অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে যে প্রজাতিটিকে জাতিরূপ হিসেবে ভিত্তি করে গণটি স্থাপিত হয়েছে। এটিও বর্তমানে অব্যবহৃত।

(7) *Genolectotype*—বিবরণের পরে এক বা একাধিক প্রজাতির মধ্যে যে প্রজাতিটিকে আদি প্রকাশের পরে গণের জাতিরূপ প্রজাতি রূপে বিবৃত করেন। এটির ব্যবহারও আজকাল অপ্রচলিত।

(8) *Genosyntype*—জাতিরূপ হিসেবে কোন প্রজাতির উল্লেখ না থাকা প্রজাতিমালার ভিত্তিতে স্থাপিত গণের অন্তর্ভুক্ত একটি। এটিও বর্তমানে অব্যবহৃত।

(9) *Generitype*—গণের নামসূচক জাতিরূপ (Genero-typa)।

(10) *Genotype*—গণের জাতিরূপ হিসেবে নির্দিষ্ট প্রজাতি। কিন্তু বংশগতি বিজ্ঞানে এই শব্দটি বহুল ব্যবহারের কারণে 1961 সালের 67A সুপারিশ অনুযায়ী এই শব্দটি গণের জাতিরূপ অর্থে ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। Black Welder অবশ্য এই সুপারিশের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন প্রধানত

দুটি কারণে। প্রথমত শ্রেণীবিজ্ঞানে এই শব্দটি একশ বছরেরও বেশী আগে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত Genotype-এর পরিবর্তে Type species, Type of the genus, Generitype, Genustype ইত্যাদি শব্দগুলো থাকলেও গণের জাতিরূপের দ্যোতক হয় না।

(11) *Geotype*—জাতিরূপ স্থানের একটি প্রাণিউপাদান।

(12) *Haplotype*—একটি মাত্র উল্লেখে একটি গণের জাতিরূপ (কেবলমাত্র প্রজাতি)।

(13) *Holotype*—একটি প্রজাতির বিবরণে গবেষক যে প্রাণিউপাদানকে প্রজাতির জাতিরূপ হিসেবে নির্বাচন করেন। বিবরণের সময় একটিমাত্র প্রাণিউপাদানও হতে পারে। একেই আসল জাতিরূপ মনে করা হয়।

(14) *Homeotype* বা *Homoeotype* বা *Homotype*—আদি বিবরণদাতা বাদে অন্য কোন ব্যক্তি জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের সঙ্গে তুলনা করে যে প্রাণিউপাদানকে একই প্রজাতি বলে নির্ধারণ করেন। আদি জাতিরূপ প্রাণিউপাদান নষ্ট হয়ে গেলে এটি মূল্যবান হয়ে দাড়ায়।

(15) *Hypodigm*—শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে গ্রহণযোগ্য না হলেও Simpson (1961) কোন নতুন প্রজাতির বিবরণ দানের সময় শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগতভাবে জানা সব প্রাণিউপাদানকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

(16) *Icotype*—বহুদৃষ্ট একটি প্রাণিউপাদান যা সনাক্তকরণে সহায়ক কিন্তু পুঁথিপত্রে ব্যবহার করা হয় না।

(17) *Ideotype*—জাতিরূপ স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান থেকে সংগৃহীত এবং জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের সঙ্গে তুলনা করে গবেষকের নাম দেওয়া প্রাণিউপাদান।

(18) *Isosyntype*—নামের আদি বিবরণে উল্লেখ না থাকা কোন Syntype-এর প্রতিরূপ।

(19) *Isotype*—জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের প্রতিরূপ।

(20) *Lectotype*—আদি প্রকাশনের পরে Syntype মালার যে প্রাণিউপাদানটি নির্বাচণ, নির্ধারন ও প্রকাশনার মাধ্যমে জাতিরূপ প্রাণিউপাদান হিসেবে কার্যকরী হয়।

(21) *Logotype*—পরবর্তীকালে পদবীপ্রাপ্ত জাতিরূপ।

(22) *Metatype*—Homoeotype এর সমতুল্য।

(23) *Monotype*—একটি প্রাণিউপাদান ভিত্তিক Holotype ; সঠিক নির্ধারণ হলে সমার্থক।

(24) *Morphotype*—ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী প্রকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। প্রাণীদের নামকরণ সংহিতায় এর ব্যবহার অপ্রচলিত।

(25) *Neoallotype*—আদি বিবরণ প্রকাশের পরে বিবৃত কোন Allotype।

(26) *Neotype*—আদি জাতিরূপ প্রাণিউপাদান নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বা সেই রকম বিশ্বাস করার পরে নির্বাচিত ও নির্ধারিত নতুন জাতিরূপ প্রাণিউপাদান।

(27) *Neoparatype*—আদি বিবরণ প্রকাশের পরে বিবৃত কোন paratype। এটি সাধারণত ঘটে একটিমাত্র প্রাণিউপাদান ভিত্তিক প্রজাতি নামকরণ হলে।

(28) *Onomatophore*—যে প্রাণিউপাদানের ভিত্তিতে প্রজাতির আদি নাম স্থাপিত। এটি Holotype-এর সমার্থক এবং শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানে অচল।

(29) *Orthotype*—গণের আদি নির্ধারণের জাতিরূপ প্রজাতি। এ শব্দটিও বর্তমানে অপ্রচলিত।

(30) *Paratype*—আদি বিবরণে Holotype বাদে একই লিঙ্গের অন্য সব প্রাণিউপাদান।

(31) *Plastotype*—সাধারণত প্রত্ন প্রাণিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের প্লাসটার ছাপ।

(32) *Plesiotype*—যে প্রাণিউপাদানের ভিত্তিতে পরবর্তী বা অতিরিক্ত বর্ণনা বা ছবি করা হয়। আদি বিবরণের পরে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা বর্ণনা বা নাম দেওয়া যে কোন প্রাণিউপাদান এই প্রর্যায়ের।

(33) *Pseudotype*—ভ্রান্ত পদবী দেওয়া গণের জাতিরূপ প্রজাতি।

(34) *Topotype*—ঠিক জাতিরূপ স্থান থেকে সংগৃহীত প্রাণি-উপাদান। Homoeotype হলে এবং আদি জাতিরূপ প্রাণিউপাদান

খোয়া গেলে এটি খুব মূল্যবান হয়ে দাড়ায়।

(35) *Typotype*—যদি কোন জাতিরূপ প্রাণিউপাদানের আদি বর্ণনা বা চিত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং পরবর্তী কোন গবেষক না দেখে বর্ণনা বা চিত্র ও নাম দেন, সে ক্ষেত্রে প্রাণিউপাদানটি পরবর্তী গবেষকের Typotype। এক কথায় একে জাতিরূপের জাতিরূপ বলা যায়।

(36) *Voucher Specimen*—Darlington (1971) জাতিরূপের পরিবর্তে এই নামটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তবে এটি শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞান সম্মত নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থ

অধিকারী সীমানন্দ, প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস ও পরিবেশ বিজ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, 1976।

Benazzi, M. *Cytotaxonomy and evolution* : General remarks. Vertebrate evolution. Ed. A. B. Chiarelli and Capanna, Academic Press, London & New York. 1973.

Black Welder, R. E. *Animal taxonomy and new systematics.* In Survey of Biological progress ed., B. Glass, 1962.

— Taxonomy. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1967.

Cain, A. J. *Animal Species and their evolution.* Hutshinson Univ. Press, London, 1963.

— *The assessment of new types of characters in taxonomy.* ed, Hawkins, 1968.

Chamberlin, W. J. *Entomological nomenclatnre and literature.* 3rd. ed. Dubuvue 10wd, William C Brown Co, 1952.

Crowson, R. A. *Darwin and classification,* SA Barnet ed., Harvard University Press, Cambridge, Massachusett, 1958.

— Classification and biology, New York, Atherton, 1970.

Darwin, *The Origin of species by means of natural selection,* or the preservation of the favoured races in the struggle for life, John Murray, London, 1859.

Dobzhansky, T. *Genetics and Origin of Species,* Columbia Univ. Press, 1937.

Ferguson, A. *Biochemical systematics and evolution,* Blackie

& Sons Ltd. Glassgo, U. K., 1979.

Florkin, M. and Jeuniaux, C. *Physiology of Insects* (M. Rockofein ed.), 1964.

— and Mason, HS ; *Comparative biochemistry*. A comprehensive treaties. 7 vols, Academic press, New York, 1960-65.

Hennig, W. *Phylogenetic Systematics*, Illinois Univ. Press, Urbana, Illinois, 1966.

Heslop-Harrison, J. W. *Species Concept*. Academic press, New York, 1963.

Huxley, J. S. *The new systematics*, Clarendon press. Oxford, 1940.

Jeffrey, C *Biological nomenclature*. Oxford & IBH Publ. Co., New Delhi, 1977.

Kapoor, V. C. *Theory and practice of animal taxonomy*, Oxford & IBH Publ. Co., New Delhi, 1983.

Linnaeus, C. *Systema naturae* per regnatria naturae, securndum classes, ordines, genera, species cum characterisbus, differentis, synonymis, locis, Editio decima, reformata, Tomy Laurentii salvii, Holmiae, 1758.

Mayr, E. *Animal Species and evolution*, Belknap press, Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusett, 1963.

— *Principles of systematic zoology*. Mc-Graw-Hill Publ. New York, 1969.

— *Populations, species and evolution*. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1970.

— Linsley, E. G. and Usinger, R. L., *Methods and principles of systematic zoology*. Mc-Graw-Hill Publ., New York, 1953.

Patterson, J. T. and H. S. Stone, W. S. *Evolution in the genus Drosophila.* . Macmillan, New York, 1952.

Reusch, B. *Evolution above the species level.* Columbia Univ. Press, New York 1960.

Ross, H. H. *Biological systematics.* Addision, Wesley publ. House, 1974.

Seal, H. L. ? *Multivariate systematical anaiysis for biologists.* Methuen & Co., London, 1964.

Simpson, G. G. *Principles of animal taxonomy.* Columbia Univ. Press, New York, 1961.

Sokal, R. R. *Principles of numerical taxonomy.* W. H. Freeman & Co., London, 1963.

— *Introduction to Biostatistics*, W. H. Freeman & Co., San-Francisco, 1975.

Stephen, W. P. *Biochemical and immunological taxonomy of animals.* (ed. C. A. Wright), 1974.

Uvarov, B. P. *Locusts and Grasshoppers.* Imperial Bureau of Entomology, London, 1928.

Wright, C. A. *Biochemical Immunological Taxonomy of animals.* Academic press, London, N. Y., 1974.

পত্রিকা

Alexander, R. D. The role of behavioral study in Cricket classification. *Syst , Zool.* 11 : 53-72, 1962.

Amadon, D. The Super species concept. *Syst. Zool* ; 15 : 245-249, 1967.

— Treatment of sub-species approaching species status, *Syst. Zool.*, 25(2) : 161-167, 1976.

Andarsons, S. Some suggested concepts for improving taxonomic dialogue. *Syst. Zool.*, 23(1) : 58-70, 1974.

Ashlock, P. D. Monophyly again. *Syst. Zool.*, 21 : 430-438, 1972.

Barber, H. S. North American fireflies of the genus *Pheturis smithson Misc. Coll.*, 117 : 1-58.

Basu Choudhury, R. C. and J. B. Chatterjee. Ascorbic acid synthesis in birds. A phylogenetic trend. *Science*, 164 : 435-436, 1969.

Bates, M. The nomenclature and taxonomic status of the mosquitoes of the *Anopheles maculipenis* complex. *Ann. Ent. Soc. Amer.*, 33 : 343-356, 1940.

Beandry, J. R. The species concept : its evolution and present status. *Rev-Canada Biol.*, 19 : 219-240, 1960.

Bonde, N. Origin of higher groups ; View points of early phylogenetic systematics. *Coll. Int. CNRS*, 218 : 293-324, 1975.

Brogmeir, T. Basic questions of systematics. *Syst. Zool.*, 6 : 53-69, 1957.

Butler, J. E. Determination of immunological correspondence for taxonomic studies by sensitometric scanning of antigen-antibody precipitates in agargel. *J. Comp. Bio Chem. Physiol.*, 25 : 417-426. 1966.

Buzzati-Traverso, A. A. and A. B. Rechnitzen. Paper partition Chromotography in taxonomic studies. *Science*, 117 : 58-59, 1953.

Cain, A. J. The genus in evolutionery taxonomy. *Syst. Zool.*, 5 : 97-109, 1956.

Camp, W. H. and Gilly, C. L., The Structure and origin of

species *Brithonia*, 4 : 323, 1943.

Dartington, P. J. Jr., Modern taxonomy, reality and usefulness. *Syst. Zool.*, 20 : 341-365, 1971.

Dobzhansky, T. Taxonomy, molecularbiology and the peck power, *Evolution*, 15 : 263-264, 1964.

Edwards, J. G. A new approach to infraspecific categories *Syst. Zool.*, 3 : 1-20, 1955.

Ehrlich, P. R. Some axioms of taxonomy, *Syst. Zool.*, 11 : 22-31, 1964.

Emerson, A. E. Taxonomy and ecology, *Ecology*, 22 : 213, 1941.

Fisher, R. A. The Statistical use of multiple measurements in taxonomic problems. *Ann. Eugenics*, 8 : 376-386, 1938.

Gilmore, J. S. L. The development of taxonomic theory since 1851, *Nature*, 168 : 400-402, 1951.

Grant, W. F. The Categories of classical and experimental taxonomy and the specics concept. *Rev. Canad. Biol.* 19 : 241-262, 1960.

Harlow, R. D. Lumb, R. H. and Wood, R., Insect lipids : Carbon number distribution of triglycerides in five species. *Comp. Biochem. Physiol.*, 30 : 761-769, 1969,

Hull, D. L. Consistency and monophyly. *Syst. Zool.*, 25(2) : 174-191.

— The effects of essentialism on taxonomy. *Brit. J. Phil. Sci.*, 15 : 314-326, 1965.

Huxley, J. S. Evolutionary process and taxonomy with special reference to grades. *Uppsala Univ. Arss Kr.*, 6 : 21-39, 1958.

Igner, R. K. Comments on the defination of ganeral *Evolution*, 12 : 370-384, 1958.

Kennedy, J. Insect polymorphism. *Svmp. Roy Entomol. Soc* ! 1 : 1-115, 1961.

Kiauta, B. Distribution of the Chromosome number in trichoptera in the light of phylogenetic evidence. *Genan. en. phaemen*, 12 : 110-113, 1968.

Kinsey, A. C. The Origin of higher categories in cynips. *Indiana Univ. Publ. Sc. Ser.*, 4 : 1-334, 1936.

Levi, H. W. The care of alcoholic collections of small invertebrates. *Syst. Zool.*, 15 : 183-188, 1966.

Love, A. The biological species concept and its evolutionary structure. *Taxon*, 13 : 33-45, 1964.

Mary, E. Is species a class or individual ? *Syst. Zool,*, 25 ; 192, 1976.

— Origin and history of some terms in systematics and evolutionary biology. *Syst. Zool.*, 27 : 112-118. 1978.

Mc. Cafferty, W. P. and Chandler, L. Denotation of some comparative systematic terminology. *Syst. Zool.*, 23 : 139-140, 1974.

Maglitsch, P. A. On the nature of species. *Syst. Zool.*, 3 : 49-65, 1954.

Menon, M. G. R. Systematics on Indian insects, in Entomology In India. *Ent. Soc. India* : 70-87, 1965.

Metcalf, Z. P. The construction of Keys. *Syst. Zool.*, 3 : 38-45, 1972.

Michener, C. D. and Sokal, R. R. Aquantitative approach to a problem in classification. *Evolution*, 11 : 130-162, 1957.

Norberto, J. and Pallenoni, J. The taxonomy of Bacteria. *Biol. Edn.*, 1(1) : 8-21, 1984.

Rivas, L. R. A reinterpretation of the Concepts 'Sympatric' and 'allopatric' with 'Synotopic' and "allotopic". *Syst. Zool.*, 13 : 42-43, 1964.

Schelee, S. D. Review of numerical taxonomy. The principles and practices of numerical classification (by P. H. A Sneath and R. R. Sokal). *Syst, Zool.*, 24 : 266-268, 1975a.

— The analysis of numerical phenetics, Entomon. Seann, 6 : 1-9, 1975b.

Sokal, R. R. Statistical methods of Systematics. Biol. Rev. ; 40 : 337-391, 1965.

— And Camin, J. H. The two taxonomies. *Syst. Zool.*, 14 : 176-195, 1975.

Steyskal, G. C. The meaning of the term sibling species. *Syst. Zool.*, 21 : 446, 1972.

Strickland, H. E. Rules of zoological nomenclature. Report of the 12th meeting of British Association held at Manchester in 1842. *Brit. Assoc. Adv. Sci. Rept* : 7-18, 1842.

Throckmorton, L. H. The problem of phylogeny in the genus *Drosophila*. In *studiesm Genetics. Univ. Taxas publ.* No 620 S : 207-343, 1962.

Tikader, B. K. Revision of Indian crab spiders (Araneas : Thomisidac). *Mem. Zool. Sur. India.* 15(3) : 1-90, 1971.

Truper, H. G. and Kramer, J. Principles of Characterisztion and identification of Prokaryoles. *The Prokaryates.* 1 : 176-193, 1981

Wiley, E. O. The evolutionary species concept reconsidered. *Syst. Zool.*, 27 : 17-26, 1978.

Womble, W. H. Differential systematics, Science, 114 : 315-322, 1951.